ISNN-2249 5207

আকাদেমি পত্রিকা

২০১১-২০১২

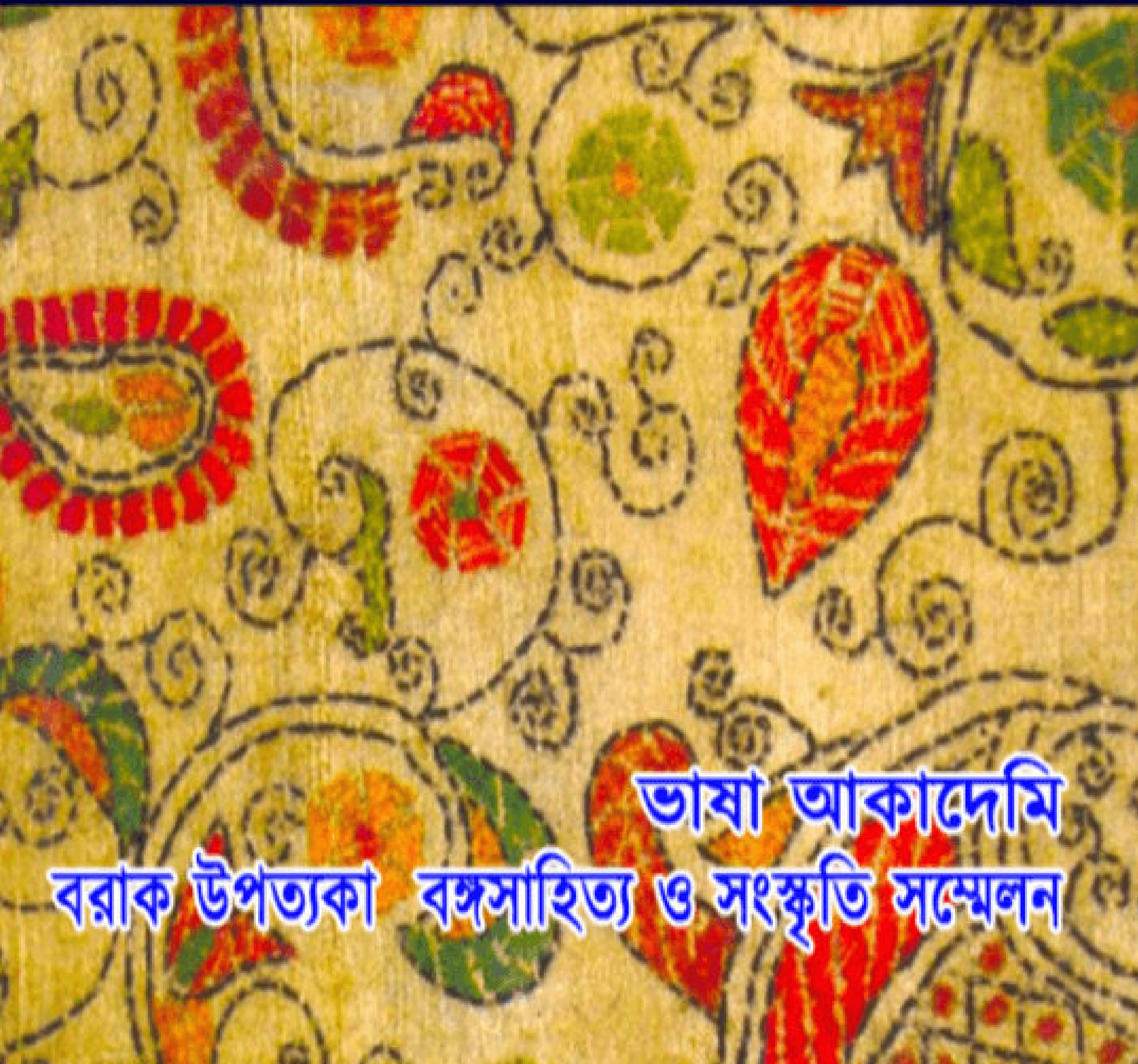

ভাষা আকাদেমি

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

আকাদেমি পত্রিকা

২০১১-২০১২

সম্পাদক

তুষারকান্তি নাথ

ভাষা আকাদেমি

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

কেন্দ্রীয় সমিতি, শিলচর, আসাম

আকাদেমি পত্রিকা

AKADEMI PATRIKA

A Research Joumal of the Bhasha Akademi (in Bengali)
under the aegis of Barak Upatyaka Banga Sahitya-O-Sanskriti Sammelan, Silchar, Assam
published by Tarun Das, General Secretary, edited by Tusarkanti Nath, Convenor, Editorial Board,
Vol. V, No. 5

© Barak Upatyaka Banga Sahitya-O-Sanskriti Sammelan, Silchar, Assam

Price : 100/-

ISSN 2249-5207

সম্পাদনা সমিতি

আবুল হোসেন মজুমদার, জন্মজিৎ রায়, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, সঞ্জীব দেবলস্কর, সুব্রত পুরকায়স্থ, তুষারকান্তি নাথ (আহ্বায়ক)

প্রকাশ : ২০১৩ জানুয়ারি # ১৪১৯ মাঘ

© **বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, কেন্দ্রীয় সমিতি।**

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী # **অক্ষর বিন্যাস :** সর্বাণী ভট্টাচার্য

মুদ্রণ : শিলচর সানগ্রাফিক্স, উল্লাসকর দত্ত সরণি, শিলচর ৭৮৮০০১

প্রকাশক : বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন পরিচালিত 'ভাষা আকাদেমি'র পক্ষে কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ দাস কর্তৃক প্রকাশিত, আকাদেমি পত্রিকার আহ্বায়ক তুষারকান্তি নাথ কর্তৃক সম্পাদিত এবং শিলচর সানগ্রাফিক্স, প্রেমতলা, শিলচর-৭৮৮০০১ এর পক্ষে পুণ্যপ্রিয় চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ১০০ টাকা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকের। প্রকাশক, সম্পাদক কিংবা সম্পাদকমণ্ডলী জন্য দায়ী নন। অনুমতি ব্যতিরেকে এই পত্রিকার কোন লেখা বা রচনার কোন অংশবিশেষ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

বিষয়সূচি

- মুখবন্ধ ৫
- প্রাক্-কথন ৭
- সম্পাদকীয় ৯
- লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতি : সংঘাত, সমন্বয় ও উত্তরণ ।। *জন্মজিৎ রায়* ১১
- বরাক উপত্যকার লোকসংগীতে অধ্যাত্মবাদ
- সম্প্রীতি চেতনার প্রেক্ষাপট ।। *আবুল হোসেন মজুমদার* ২৩
- অথ বাঘ-মানব প্রসঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের লোককথা ।। *সুবীর কর* ৩০
- গাজিনৃত্য: বরাক উপত্যকার এক অনুপম লোকশিল্পকলা ।। *কামালুদ্দীন আহমেদ* ৪৮
- বৌ নাচ বা বধূবরণ নৃত্য ।। *মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য* ৫৫
- বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি বলয়ে ওঝানাচ ।। *শিবতপন বসু* ৬০
- ‘গুরমার গান’ বা ‘ওঝানাচ’ লিঙ্গাতিযায়ী লোককলা ।। *দীপেন্দু দাস* ৬৩
- ভূমি চারণা (Landlore) : বরাক উপত্যকার মাটির ইতিবৃত্ত ।। *সঞ্জীব দেবলস্কর* ৬৬
- বরাক উপত্যকার তিনটি মেয়েলিব্রত : একটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ।। *প্রিয়ব্রত নাথ* ৭২
- বরাক উপত্যকার লোকছড়ায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র ।। *প্রভাসচন্দ্র নাথ* ৭৮
- বরাক উপত্যকার প্রবাদে সমাজমনস্কতা ।। *সর্বজিৎ দাস* ৮৫
- বরাক উপত্যকার লোকজীবনের লুপ্তপ্রায় কিছু লোক-উপাদান ।। *আশিসরঞ্জন নাথ* ৯৩
- বিবাহের লোকাচার ও লোকগান শিল্পীর নকশিকাঁথায় নিপুণ গাথা ।। *অনামিকা চক্রবর্তী* ১০৫
- বরাক উপত্যকার বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিয়ের গান ।। *মহবুবুল বারী* ১১৫
- মণিপুরি লোকসংস্কৃতি ।। *মণিধন সিংহ* ১২১
- ডিমাছাদের পূজা-পার্বণ ঐতিহ্যের মূল্যায়ন ।। *সুদীপ্তা খেরসা* ১২৮
- বরাক উপত্যকার দুর্গাপূজায় ‘নৌকাটানা’ অনুষ্ঠান ।। *তুষারকান্তি নাথ* ১৩৪
- **পরিশিষ্ট**
  - ❖ **লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় রাজমোহন নাথ** ।। *অমলেন্দু ভট্টাচার্য* ১৩৯
  - ❖ **লোকসংস্কৃতি এবং ইতিহাস : প্রসঙ্গ সুজিৎ চৌধুরী** ।। *সঞ্জীব দেবলস্কর* ১৪২
  - ❖ **লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও পাণ্ডুলিপিবিদ্যা — বিনিময়** ।। *অর্জুনদেব সেনশর্মা* ১৪৭
- **প্রতিবেদন**

১. অরুণ চন্দ স্মৃতি সম্মান নিয়ে অভিভূত প্রবাদপ্রতিম রাজনীতিক ১৪৯

২. বরাকবঙ্গের ধামাইল উৎসব ও কর্মশালা ১৫০

- **আকাদেমি পত্রিকা — গত চারটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি** ১৫১
- **আলোকচিত্র সংগ্রহ** ।। সূর্যতপ নাথ ১৫৩

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় সমিতি

দূরভাষ ৯১-৯৪৩৫৩৭৮৬৫৭
Email: bsahitya2010@Gmail.com

মুখবন্ধ

বরাক উপত্যকার হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় লোককথা, লোকজীবনের সুর ও লয় তথা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা-উপধারা নীরবে প্রবহমান। কেচ্ছা, গল্প, উপাখ্যান, পাঁচালি-প্রবাদ, গানপ্রভৃতি স্থানীয় কথা ও শব্দ সংযোগে রচিত হয়ে শুধু মুখে-মুখেই প্রচারিত হয়নি, পরবর্তীকালে বেশকিছু মুদ্রিত আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে জারি, সারি, গাজি, মনসামঙ্গল, ওঝার গান, কবিগান, বৌনাচ, ধামাইল, ঝুমুরনাচ প্রভৃতির রূপ-রস ও বৈচিত্র্য নান্দনিক অনুভূতির সহায়ক। আধুনিকতার পরিচর্যা তথা পরিশীলনের খুব বেশি চেষ্টা হয়নি বলেই এই অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতি এখনো নিজস্বতা হারায়নি, বরং মাটির গন্ধে ভরপুর রয়েছে।

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন জন্মলগ্ন থেকেই লোকসংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে, তাই প্রতিটি অধিবেশনে লোকসংস্কৃতির জন্য পৃথক মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সম্মেলন-এর ‘ভাষা আকাদেমি পত্রিকা’র এই সংখ্যার বিভিন্ন লেখায় উঠে এসেছে বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ। লোকজীবনের এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দায় সকলের। বিশ্বায়নের প্রবল প্রতাপে নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়টুকু হারিয়ে গেলে ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে যোগসূত্রও নষ্ট হয়ে যাবে। সম্মেলন লোকসংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের আন্দোলনে সদর্থক ভূমিকা পালনে দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা আবশ্যক।

আশাকরি ‘আকাদেমি পত্রিকা’র এই সংখ্যা পাঠকসমাজে আদৃত হবে এবং লোকসংস্কৃতি রক্ষার প্রচেষ্টায় আগ্রহ সঞ্চারিত হবে।

বিনীত

১১ জানুয়ারি, ২০১৩

(নীতিশ ভট্টাচার্য)
সভাপতি

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
কেন্দ্রীয় সমিতি

দূরভাষ ৯১-৯৪৩৫৩৭৮৬৫৭
Email: bsahitya2010@Gmail.com

প্রাক্‌-কথন

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের গবেষণা পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর ১৪০২ বঙ্গাব্দে গবেষণা পর্ষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা যথাক্রমে ১৪১১ ও ১৪১৫ বঙ্গাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির উদ্যোগে ভাষা আকাদেমি গঠিত হয় এবং গবেষণা পর্ষদ পত্রিকার স্থলে 'আকাদেমি পত্রিকা'-র প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড় শো বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংখ্যা হিসেবে ২০১১ সালের আগস্ট মাসে (শ্রাবণ ১৪১৮) প্রকাশিত হয়। আকাদেমি পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে গবেষণা পর্ষদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বরাক উপত্যকার সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি ও শিক্ষা বিষয়ে এই অঞ্চলের চিন্তা, চর্চা, অধ্যয়ন ও গবেষণাকে প্রকাশের আলোয় নিয়ে এসে পাঠকসমাজের দরবারে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট। তরুণ প্রজন্ম ও গবেষকবর্গ যদি এর দ্বারা উপকৃত ও উৎসাহিত হয়ে উদ্যমশীল হয়ে ওঠেন, তবে ভাষা আকাদেমির এ-জাতীয় উদ্যোগ সার্থক হবে। বর্তমানে রাজ্য সরকার আমাদের সংস্থাকে যে এককালীন বার্ষিক অনুদান দিয়ে থাকেন, তাতে আমাদের প্রকাশনার কাজ অনেকটা সহজ ও নিষ্কন্টক হতে পেরেছে। আকাদেমি পত্রিকার প্রকাশনার পেছনে ভাষা আকাদেমির কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যবর্গের নিরলস শ্রম ও পরামর্শ প্রেরণা দিয়েছে। তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। উক্ত সমিতির আহ্বায়ক তথা বর্তমান সংখ্যার সম্পাদককেও ধন্যবাদ জানাই তাঁর উৎসাহ ও সৎপ্রয়াসের জন্য। মুদ্রণকার্যের সঙ্গে জড়িত সকলকেও জানাই। পাঠকবর্গ সহৃদয়তার সঙ্গে আকাদেমি পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাকে গ্রহণ করবেন বলে আশা রাখি।

বিনীত

(তরুণ দাস)
সাধারণ সম্পাদক

১২ জানুয়ারি, ২০১৩

সম্পাদকীয়

বরাক উপত্যকা একটি প্রাচীন জনপদ। বড়াইল-ভুবন-লুসাই পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত এই উপত্যকা সমভূমির অন্তর্গত। পাহাড় থেকে নেমে আসা নদ-নদীবাহিত পলি সঞ্চয়ে গঠিত এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। এই অঞ্চলভূমি যে সুপ্রাচীনকালেই সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোক স্পর্শে আসে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নব্যপ্রস্তরযুগের অমূল্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এখানে। এই সূত্রে অনুমান করা যায় যে, সুজলা-সুফলা এই উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের উপস্থিতি ছিল। সুপ্রাচীনকাল থেকে এখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাতে এ অঞ্চলের আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি, বারিচরিত্র, অরণ্যপ্রকৃতি মানুষের জীবনচর্যা ও তার বিকাশকে প্রভাবিত করেছিল। স্থায়ী বসতি স্থাপনের প্রবণতা নব্যপ্রস্তরযুগেই বিশেষভাবে প্রকটিত হয় আর এই যুগেই মানুষ পশুপালন ও কৃষির উপযোগী স্থানে বসবাস করতো বলে পণ্ডিতেরা সহমত পোষণ করেন। প্রাচীন বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও প্রতিবেদনে দেখা গেছে, খ্রিস্টপূর্ব যুগেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের কয়েকটি পথ-উপপথ এই উপত্যকা স্পর্শ করেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর অবাধ বিচরণ তথা বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের একটি পরিবেশ এখানে তৈরি হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল এক অসাধারণ সভ্যতা-সংস্কৃতি।

বৈচিত্র্যপূর্ণ এক মনোরম প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ বিরাজ করছে বরাক অববাহিকার মধ্যে। বৈচিত্র্য রয়েছে এখানকার জনবসতির মধ্যেও। এখানে মিলিত হয়েছে সংস্কৃতির নানা ধারা-উপধারা, গড়ে উঠেছে এক সমন্বয়ী সমাজ ও জীবন-দর্শন। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রয়েছে এই উপত্যকায়। এখানকার জনবিন্যাসের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ এই উপত্যকাকে আখ্যায়িত করেছেন 'নৃতত্ত্বের উদ্যান'। বর্ণময় এই উপত্যকার লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে আমাদের গর্ব করার মতো অনেক কিছুই আছে। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উষালগ্নে রচিত চর্যাপদে ব্যবহৃত বহু শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, বাগ্ধারা এখানে এখনও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় মৌখিকভাবে প্রচলিত। একথা তো মানতেই হবে যে, প্রান্তীয় এলাকায় সমাজ-ভাষা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সব থেকে বেশি সক্রিয় ও সংরক্ষিত। বঙ্গীয় সমাজ-সংস্কৃতির পূর্বতম প্রান্তের বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির বৈভব দেখে কেউ কেউ এই উপত্যকাকে 'লোকসংস্কৃতির খনি' রূপেও অভিহিত করেছেন।

বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনা হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের গবেষণা সূত্রে। বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস দেখতে দেখতে প্রায় দেড় শতাব্দীকাল ছুঁই-ছুই করার সম্মুখীন। 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ' থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ রাজকর্মচারী গেবর্ন হেনরি ডামন্ট ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে চাকরি সূত্রে কাছাড়ে আসেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দ্য ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' এবং 'ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল'-কে মাধ্যম করে তিনি বাংলা লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হন। বঙ্গদেশের লোকজীবনের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রেখে ডামন্ট সাহেব বাংলার লোককথা সংগ্রহের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁর সংগৃহীত লোককথা 'দ্য ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে

প্রকাশিত হতে থাকে। এই ধারাবাহিক প্রকাশ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। লোককথা ছাড়াও বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গে নিবন্ধও 'দ্য ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি'-তে লিখেছেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'Sword-worship in Kachar' নিবন্ধটি 'দ্য ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়ারি' (ভল্যুম-4)-তে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এই বিদ্বান রাজকর্মচারীর হাত দিয়েই কাছাড় তথা বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে দেখি স্যার জর্জ ও উইলিয়াম ক্রুক-এর লোকসংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদ্মনাথ ভট্টাচার্য (১৮৬৮-১৯৩৮) নিজ অঞ্চলভূমির ইতিহাস, লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির যে পরিচয় পেয়েছিলেন, এ নিয়ে আজীবন কাজকর্ম করেছেন। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য লোকসংস্কৃতি চর্চার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন 'কমলা', 'শ্রীভূমি', 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', 'Man in India' ইত্যাদি পত্রিকায়। গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১) এবং রাজমোহন নাথ (১৮৯৯-১৯৬৫) এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি চর্চার কিংবদন্তি পুরুষ। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিলচর নর্মাল স্কুল স্মরণীয়তার বৈশিষ্ট্যে অবিসংবাদিত। এই বিদ্যানিকেতনকে কেন্দ্র করে শুরু হয় যৌথ উদ্যোগে আঞ্চলিক ঐতিহ্যচর্চা। বৃহৎবঙ্গের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে এই অঞ্চলভূমির সমাজ-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এই প্রতিষ্ঠান পৌঁছে দিয়েছিল স্বাধীনতা পূর্বযুগে। দীর্ঘ সতেরো বছরব্যাপী প্রকাশিত 'শিলচর শিক্ষা পরিষদ'-এর মুখপত্র 'শিক্ষাসেবক' (১৯২৫-১৯৪১)-এ শৈক্ষিক বিষয়ের পাশাপাশি লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনাও স্থান পেয়েছে। 'শিক্ষাসেবক'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিলচর নর্মাল স্কুলের গুণী শিক্ষকবৃন্দ ও বরাক-সুরমা উপত্যকার তৎকালীন লেখক-বুদ্ধিজীবীমহল। মোহাম্মদ আব্দুল বারী, তারিণীচরণ দাস, জগন্নাথ দেব, ব্রজদয়াল ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব-এর লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনা 'শিক্ষাসেবক'-এ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে শিলচর থেকে মহিলাসমাজের মুখপত্র 'বিজয়িনী' জ্যোৎস্না চন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির নামকরণ করেছিলেন। 'বিজয়িনী'তে প্রবাদ সংগ্রহ, মেয়েলিব্রত, লোকাচার ইত্যাদি বিষয়ে বেশকিছু মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতি চর্চার এই ধারা বরাক উপত্যকায় এখনও বহমান। বরাক উপত্যকার জন্য শ্লাঘার বিষয় যে, এই উপত্যকার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস' (১৯৮৬) গ্রন্থে 'কাছাড়ে লোকসাহিত্য চর্চা' (পরবর্তী সংস্করণগুলোতে 'বরাক উপত্যকায় লোকসাহিত্য চর্চা') শীর্ষক একটি পৃথক অধ্যায় যুক্ত হয়েছে।

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের ভাষা আকাদেমির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'আকাদেমি পত্রিকা'র বর্তমান সংখ্যাটি বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির নানান বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রত্যেক লেখকই তাঁদের মূল্যবান রচনা পাঠিয়ে 'আকাদেমি পত্রিকা'কে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁদের লোকসংস্কৃতি নিয়ে চিন্তাচর্চা ও লোকসংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা অকৃত্রিম, তাঁদের সহযোগিতায় আমরা কৃতজ্ঞ। প্রকাশিত রচনাগুলো তাঁদের একনিষ্ঠ অধ্যয়ন, পরিশ্রম, মনন, চিন্তন ও গবেষণার ফসল। লোকসংস্কৃতির পরিধি বিশাল ও ব্যাপক। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। ইচ্ছা ও প্রয়াস সত্ত্বেও অনেক বিষয় বাদ গেছে, যেমন— বরাক উপত্যকার লৌকিক দেবদেবী, লৌকিক মেলা, উৎসব, ধাঁধা, মন্ত্র, লোকবাদ্যযন্ত্র, লোকওষুধ, লোকশিক্ষা, লোকবিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি। এই অপূর্ণতার জন্য কিছুটা খেদ রয়ে গেল।

তুষারকান্তি নাথ

লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতি : সংঘাত, সমন্বয় ও উত্তরণ

জন্মজিৎ রায়

১.

সংস্কৃতির ভুবনে লোকসংস্কৃতি এবং ধ্রুপদি তথা নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে কখনো একটি থিসিস (thesis) ও অপরটি অ্যান্টি-থিসিস (anti-thesis) রূপে কাজ করতে করতে একসময় নতুন একটি সিনথেসিস (synthesis) রূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বিষয়টির তাত্ত্বিক রূপের ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের পরিবর্তে ভারতবর্ষের এবং বাংলা তথা বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক ভুবনের বহুবিচিত্র পরিঘটনার (phenomenon) দৃষ্টান্তযোগে বিশ্লেষণই বক্ষ্যমাণ আলোচনায় মুখ্যত উপজীব্য।

বিশ্ববিদ্যা-চর্চার প্রাঙ্গণে মানব-সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য রচনার প্রয়াসের সূচনা হয় বিগত শতকের মধ্যপর্বে। সেইসঙ্গে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ব্যাকরণ ও তুলনামূলক সাহিত্যের মতো তুলনামূলক সভ্যতা বিষয়টিও গবেষক সুধীবর্গের তীক্ষ্ণ সমীক্ষা ও পরিশ্রমী অধ্যয়নের ক্ষেত্রভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে পুরোগামিতার দাবিদার অবশ্যই 'শিকাগো স্কুল অব অ্যানথ্রোপোলজি'। রবার্ট রেডফিল্ড, মিলটন সিঙ্গার, ম্যাককিম ম্যারিয়ট, বারনার্ড কন এবং তাঁদের ভারতীয় সহগামী-অনুগামী গবেষকবৃন্দ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ঔপজাতিক বা কৌমতান্ত্রিক, গ্রামীণ ও নাগরিক রূপের ওপর নতুন আলোকসম্পাত করেন।

ভারতবর্ষ গ্রামভিত্তিক দেশ। গ্রামীণ ভারতের নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ অধ্যয়ন শুরু হয় বিগত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। প্রকাশিত হয় Village India by Mckim Marriott (Chicago University Press, 1955), Structure and Change in Indian Society by Milton Singer and B. S. Cohn (ed., Chicago University Press, 1968), Traditional India: Structure and Change by Milton Singer (ed., Jaipur, 1975).

রবার্ট রেডফিল্ড ১৯৫৫ সালে সভ্যতার স্বরূপ অধ্যয়নের সূত্রে তাঁর বিখ্যাত 'বৃহৎ' ও 'ক্ষুদ্র' ঐতিহ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ধারণা উপস্থাপিত করেন এবং এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সভ্যতা হচ্ছে 'a complex structure of great and little traditions।[১] রেডফিল্ডের অভিমত অনুসারে, মানুষের মননচর্যাগত বা বৌদ্ধিক যে প্রভাব গ্রামাঞ্চলের বাইরে থেকে আসে, তাকেই Great Tradition বলা যায়। অন্যদিকে গ্রামীণ জীবন ও সমাজ থেকে উৎসারিত স্থানিক প্রভাবকেই Little Tradition নামে আখ্যাত করা যায়।[২] আমরা এখানে মানুষের জীবনচর্যার বহিঃপ্রকাশ-ঘটিত সাজসজ্জা, প্রসাধন, কেশচর্যা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গার্হস্থ্য আসবাবপত্র, আচারপ্রথা, খাদ্যাখাদ্য, সামাজিক বিশ্বাস, রীতিনীতি ইত্যাদিকেও এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ভুবনেও Great Tradition Little Tradition-কে সুচিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিলটন সিঙ্গার উভয় প্রকার

ঐতিহ্যের সংযোগ-রক্ষক cultural specialist-এর কথা বলেছেন। রেডফিল্ডও উভয়প্রকার সংস্কৃতির সংযোগ-রক্ষণের বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। শিকাগো স্কুলের নৃতাত্ত্বিকদের ভারতীয় অনুগামী বলেছেন, 'Redfield further introduced Milton Singer's concept of 'cultural media', such as song, dance, recitation ete, through which cultural specialists communicate to the masses and thus establish continuity between the two traditions.'[৩]

রেডফিল্ড ১৯৫৬ সালে ভারতের পরম্পরাগত সংস্কৃতির ওপর নগরায়ণের প্রভাব সমীক্ষা করতে গিয়ে একটা নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেন। তিনি এটাকে বলেছেন 'Rural-urban continuum'। গ্রামীণ-নাগরিক সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

২.

সংস্কৃতির দুটি দিক হচ্ছে বাস্তব সংস্কৃতি (material culture) এবং মানসিক সংস্কৃতি (ethos)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্তমান গ্রামীণ বা লোকসংস্কৃতির বাস্তব রূপরীতির মধ্যে বিভিন্ন যুগের আর্থ-সামাজিক, বৃত্তিগত, বর্ণ-ধর্মগত প্রভাব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বহিরাগত জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে গ্রামে ও শহরে প্রচলিত তাসখেলার জনপ্রিয়তা এদেশে ইউরোপীয়দের আগমনের পরেই হয়েছে। আবার গ্রামের পুরুষ ও বিধবা মহিলার গলায় তুলসীর মালা ষোড়শ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের পরবর্তীকালেই সম্ভব। গ্রামে গ্রামে চায়ের দোকান ও সেখানে নব্য যুবকদের আড্ডার সূচনা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে এদেশে চা-শিল্প গড়ে ওঠার পর। তামাকু সেবনের বদলে বিড়ি ও সিগারেটের প্রচলনও আধুনিক যুগেরই প্রভাব। একশো বা দেড়শো বছর আগে যে গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে অতিথি পদার্পণ করলে এক গ্লাস জল ও তৎসঙ্গে একবাটি মুড়ি বা খই এবং দুটি বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করা হত, এখন সেই বাড়িতেই চা-বিস্কুট দিয়ে অতিথি-আপ্যায়ন করা হয়। এর কারণ গ্রামের বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তন ও আর্থনীতিক উন্নয়ন। গ্রামের মোদকের দোকানের পাশেই এখন বসেছে বেকারির দোকান। চায়ের প্রচলনও হয়েছে ঘরে ঘরে। কিন্তু বাতাসা আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেও চায়ের কাপে দু-তিন চামচ চিনির মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অবশ্য চায়ের কাপে চিনির পরিমাণের তারতম্য দিয়ে গ্রামীণ ও নাগরিক সংস্কৃতিকে আলাদা করা যাবে না। এটাকে বরং rural-urban continuum-এর দৃষ্টান্তরূপে এবং সেইসঙ্গে চায়ের কাপে চিনিরূপে বাতাসার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার মধ্যে সংস্কৃতির গ্রাম-নগর-নিরপেক্ষ অবিচ্ছিন্নতার বাস্তব দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাস্তব সংস্কৃতির বাহ্যিক উপাদানের তারতম্য লোকসংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতিতে হয়ে থাকলে তার মূল কারণ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং শিল্পায়ন তথা প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি। বিশ শতকের মধ্যপর্বে তৎকালীন কাছাড় জেলায় বা বর্তমান বরাক উপত্যকায় গ্রামে ও শহরে ভদ্র গৃহস্থবাড়িতে কাঠের পাদুকা বা খড়ম ব্যবহারের রীতি ছিল। এটা অবশ্যই লোকসংস্কৃতির বাহ্যিক উপাদানরূপে বিবেচ্য। কিন্তু প্রযুক্তিগত প্রভাবে পাদুকাশিল্পের উৎপাদনবাহুল্যের ফলে কাঠের পাদুকা বা খড়ম এখন গ্রামেও বিরলদৃশ্য। তার স্থান দখল করেছে স্বল্পমূল্যের প্লাস্টিক-জাত বা নাইলন-জাত পাদুকা, যা ঘরে-বাইরে জলে-কাদায় ব্যবহার্য ও বেশি টেকসই। সড়ক-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্পের কল্যাণে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব ও পার্থক্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ফলে লোকসংস্কৃতির বাহ্যিক উপাদানের ক্ষেত্র হয়েছে সংকুচিত ও ক্ষয়িষ্ণু।

তুরকি-আক্রমণোত্তর সুলতানি-পাঠানি আমলের বাংলায় একদিকে মঙ্গলদেবদেবীর পূজা-প্রচলন ও মঙ্গলসাহিত্য-রচনা এবং অন্যদিকে কীর্তন গানের প্রসার গ্রামীণ সমাজ-জীবনে এনেছিল বৈচিত্র্য। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের অনুসরণে একাধিক গ্রামীণ কবি কথকতার আসরে পরিবেশনের উপযোগী করে রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে 'মহীরাবণের যুদ্ধ'-জাতীয় লৌকিক আখ্যানকবিতা রচনা করেছেন।[৪] সেখানে গ্রামের

আসরে এগুলি যেমন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হত, তেমনি পরিবেশিত হত পালা-কীর্তন বা পদ-কীর্তন। গ্রামের কবিরা বাজারের জনসমাবেশে স্বরচিত আখ্যানমূলক কবিগান পরিবেশন করতেন। লোকসাহিত্য গ্রামীণ সমাজে লোকসংস্কৃতির পরিমণ্ডল রচনার ধারাবাহিক ঐতিহ্য বজায় রাখত। রথযাত্রা, মকরসংক্রান্তি অথবা অন্যান্য পর্ব উপলক্ষে গ্রামে বসত মেলা। সেখানে মৃৎশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন, কাঠের পুতুল, হাতি-ঘোড়া-পাখি এবং হরেক রকম কারু ও চারু শিল্পবস্তুর বেচাকেনা চলত। সার্কাস, জাদু প্রদর্শনী, নাগরদোলা, টোটকাঔষধপত্র, মাদুলি, পুঁতির মালা, চুড়ি ইত্যাদিও ছিল এ-রকম মেলার আকর্ষণ। বড় শহরের মঞ্চে জাদুকর হাতি বা মোটরগাড়ি মুহূর্তে অদৃশ্য করে দেন। আর মেলার জাদুকর মঞ্চে হাঁস বা পাখি অদৃশ্য করে দেখান। উন্নততর প্রযুক্তি ও পরিশীলনের তারতম্য লোকসংস্কৃতিকে নাগরিক বা ধ্রুপদি সংস্কৃতি থেকে আলাদা করে দেয়। যেমন, মেলায় পরিবেশিত বাউল-ভাটিয়ালি বা রামপ্রসাদি গানের সঙ্গে বড় শহরের গানের জলসায় পরিবেশিত খেয়াল বা ধ্রুপদের পার্থক্যটা মূলত ভগবদ্দত্ত অশিক্ষিতপটুত্ব আর দীর্ঘ সঙ্গীতশিক্ষার অনুশীলন-জাত উৎকর্ষের। বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যাত্রাপালার সঙ্গে কলকাতার প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ 'অঙ্গার', 'তিন পয়সার পালা' বা 'রক্তকরবী'-র পার্থক্য যেমন শিল্পপ্রকরণগত ও সাহিত্যমানগত, তেমনি অভিনয়ের গুণগত মানেরও। লোকসংস্কৃতির মধ্যে কেবল রয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব ও কলাকৌশলের অভাব, এ-রকম ধারণা ঠিক নয়। গ্রামের আসরে একাধিক কীর্তনিয়ার পালাকীর্তনে, পুতুলনাচের প্রয়োগকৌশলে কিংবা মনসা-পূজার আসরের ওঝার গানে কথকতায় দীর্ঘ নিষ্ঠা, শ্রম ও পরিশীলনের পরিচয় অলভ্য নয়। মূল পার্থক্যটা আসলে পরিশীলন আর ব্যাকরণগত। মালকোষ রাগে গান গাইতে হলে গানের ব্যাকরণ জানতে হয়; বাউল বা কীর্তন গানের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে ধামাইল বা বউনাচের জন্য নৃত্যের ব্যাকরণ জানা অনাবশ্যক; কিন্তু কথক নৃত্যের জন্য সেটা অত্যাবশ্যক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা-শাসিত নাগরিক সংস্কৃতি আজকের যুগে আগ্রাসনধর্মী ও বিস্তার্যমাণ। গ্রামীণ জীবন ও সমাজে নাগরিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এখন অপ্রতিরোধ্য। স্বাস্থ্য পরিষেবা, জল ও বিদ্যুৎ যাতে গ্রামীণ জীবনে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তার জন্য সরকারি প্রয়াস বিজ্ঞাপিত হয় খবরের কাগজে। বৃহৎ শিল্পের নিত্য ব্যবহার্য উৎপাদন গ্রামের দোকানে এখন সুলভ। বেতার, দূরদর্শন, খবরের কাগজ আর মোবাইল ফোন রয়েছে গ্রামে। গাড়ি, অটোরিকশা, মোটরবাইক রয়েছে। রয়েছে এল-পি-জি গ্যাস সিলিন্ডার, প্রেসার কুকার এবং নানারকম আধুনিক জীবনযাত্রার নিত্যব্যবহার্য সরঞ্জাম। তবে উন্নত গ্রামের পাশে অনুন্নত গ্রামও আছে। সেই সব অনুন্নত ও শহর থেকে বহু দূরবর্তী গ্রামগুলিতে নাগরিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু এইসব গ্রামও নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাবে দ্রুত প্রভাবিত হচ্ছে এবং এ-রকম গ্রামগুলিতে লোকসংস্কৃতি-প্রভাবিত জীবনযাত্রা ক্রমশ অপসৃয়মাণ। আর সেখানকার লোকসংস্কৃতির বাহ্যিক উপাদানও লুপ্তিপ্রবণ। উন্নততর প্রযুক্তি বাঁশ-বেতের তৈরি গার্হস্থ্য জীবনের ও রন্ধনকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক সরঞ্জাম বাজার থেকে হঠিয়ে দিচ্ছে। এ-সবের জায়গায় এসেছে প্লাস্টিকের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী। মাটির ভাঁড়ের স্থলে এসেছে প্লাস্টিকের কাপ। বহুজাতিক সংস্থা বড় বড় শহরের বিগবাজার ও শপিং মলকে নিয়ন্ত্রণ করার ফলে কুটিরশিল্প ও ছোট দোকানদার ক্রমশ বিপন্ন ও কোণঠাসা।

৩.

এক জাতি অন্য জাতিতে পরিণত হওয়ার কারণস্বরূপ প্রকৃতির আপূরণতত্ত্বের কথা বলেছেন মহর্ষি পতঞ্জলি।[৫] প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে তরুমূল কয়লায় এবং কয়লা হীরকে পরিণত হয়ে থাকে।[৬] প্রাচীন ভারতের আর্যসমাজে ক্ষত্রিয়নন্দনের ব্রাহ্মণে পরিণতিলাভ এবং চণ্ডালত্ব-লাভের ঘটনা সংস্কৃত পুরাণে ও মহাকাব্যে বর্ণিত আছে। যেমন, ক্ষত্রিয়কুমার বিশ্বামিত্র তপস্যা করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন বলে মহাকাব্যে বর্ণিত আছে।[৭] আবার ক্ষত্রিয় হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অভিশাপে কাশীধামের শ্মশানে চণ্ডালরূপে কালযাপন করেন।[৮] মধ্যযুগে বাংলায় কর্ণাটক থেকে আগত সেনরাজারা ছিলেন জাতিগতভাবে ব্রাহ্মণ। তাঁরা রাজ্যশাসন করে ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করায়

তাঁদের ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা হয়েছে।[৯] প্রাকৃতিক জগতের 'জাত্যন্তর-পরিণাম' সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয় । যেমন, বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তুরকি আক্রমণে বিধ্বস্ত গেলে দেশব্যাপী গুরুগৃহে টোল বা চতুষ্পাঠী ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা-ব্যবস্থা বিলুপ্ত না হয়ে রূপান্তরিত হয়। Great Tradition এমনি করে Little Tradition-এর মধ্যে করে আত্মসংরক্ষণ। বৃক্ষ বীজাকারে থাকে, আবার অনুকূল পরিমণ্ডলে বৃক্ষরূপ লাভ করে। নাগরিক কিংবা ধ্রুপদি সংস্কৃতিও লোকসংস্কৃতিতে পর্যবসিত হতে পারে এবং লোকসংস্কৃতি কালক্রমে ধ্রুপদি কিংবা নাগরিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে।

প্রাচীন ভারতে কুমারীদের মধ্যে চতুঃষষ্টি বা চৌষট্টি প্রকার অঙ্গবিদ্যা বা কলা-শিক্ষার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র অনুসরণ করে নৃপেন্দ্র গোস্বামী এই সকল কলার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন।[১০] সেটা হচ্ছে এ-রকম:

ক. গীত, বাদ্য, নৃত্য
খ. আলেখ্য- চিত্রবিদ্যা
গ. দশন-বসন-অঙ্গরাগ, অর্থাৎ দন্ত-বস্ত্র-অঙ্গরঞ্জন
ঘ. মণিভূমিকা কর্ম, অর্থাৎ মণিরত্ন দ্বারা মেঝে অলংকরণ
ঙ. শয়ন-রচন, অর্থাৎ শয্যারচনা
চ. মাল্যগ্রন্থন
ছ. গন্ধযুক্তি- গন্ধদ্রব্য উৎপাদন
জ. সূচীবয়ন কর্ম, অর্থাৎ সূচীবিদ্যা
ঝ. সূত্রক্রীড়া- সূত্র দ্বারা চিত্রনির্মাণ
ঞ. বেত্রবয়ন, অর্থাৎ বেতের শিল্প
ট. তক্ষণ কাঠের কাজ
ঠ. বাস্তুবিদ্যা- গৃহনির্মাণ
ড. ধাতুবাদ- ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি।

উল্লিখিত চৌষট্টি অঙ্গবিদ্যা প্রসঙ্গে কিছু টীকাটিপ্পনি যোগ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ-সকল অঙ্গবিদ্যা, বলাবাহুল্য, প্রাচীন ভারতের লোকসংস্কৃতি তথা লোকশিল্পের পরিচয় বহন করে।

ক. গীত, বাদ্য ও নৃত্যের কলাবিদ্যার মধ্যে লৌকিক ও ধ্রুপদি, এই দ্বিবিধ রূপরীতি সেকালে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। সেকালে বাউলের একতারা, অর্থাৎ এক তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র লোকগীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল কি না, সেটা নিশ্চিতরূপে জানা না গেলেও তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধ্রুপদি বাদ্যযন্ত্রও কালক্রমে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন, প্রাচীন ভারতের সপ্ততারযুক্ত বীণাযন্ত্র থেকে এসেছে মোগল আমলের 'সেতার'। তবে সেতারও ধ্রুপদি বাদ্যযন্ত্ররূপে নাগরিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। 'শঙ্খ' ও 'শিঙা' মূলত লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত হলেও শঙ্খ নাগরিক ও ধ্রুপদি রূপ লাভ করেছে। কিন্তু বিশেষ শৈবধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিঙার ব্যবহার সীমাবদ্ধ। শঙ্খের ক্ষেত্রে ধ্রুপদি পর্যায়ে উত্তরণের মধ্যে Little Tradition-এর Great Tradition-এ রূপান্তর লক্ষিত হয়।

গ. অঙ্গ-রঞ্জন সেকালে কীরূপে প্রচলিত ছিল, জানা যায় না। তবে বিয়ের কনের মুখমণ্ডলের প্রসাধন প্রচলিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। 'উল্কি' বা 'tattoo' মূলত লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত হলেও বর্তমানে মার্কিন মুলুকে শিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে এবং সেইসূত্রে আমাদের দেশেও এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। প্রসঙ্গত মেহেন্দির কথা বলা যায়। আজকাল বাঙালি সমাজেও বিয়ের কনের করতলে, করপৃষ্ঠে ও বাহুর নিম্নভাগে মেহেন্দি-অলংকরণের রীতি চালু হয়েছে।

ঘ. মণিভূমিকা যদি মেঝে অলংকরণের দেশীয় রূপ হয়ে থাকে, তবে এর বর্তমান নাগরিক রূপ হচ্ছে মেঝেতে mosaic ব্যবহার করা অথবা গালিচা (carpet) বা প্লাস্টিকের আস্তরণ (cover) দ্বারা মেঝে আবৃত করা। লোকসংস্কৃতিতে বিভিন্ন রঙের আলপনা দ্বারা মেঝে ও মাটির দেয়াল চিত্রিত করার রীতি বাংলার গ্রামাঞ্চলে ও বহির্বাংলায় দেখতে পাওয়া যায়।

ঙ. শয্যা-রচনা সম্পর্কে এটা বলা যায় যে, বর্তমান কালেও বরবধূর বিবাহোত্তর ফুলসজ্জার রজনীতে ফুলের মালা ও খইয়ের মালা গেঁথে পালঙ্ক সজ্জিত করার রীতি গ্রামে ও শহরে প্রচলিত আছে।

জ. সূচীবিদ্যার উল্লেখ থেকে মনে হয়, প্রাচীন ভারতে মেয়েদের সেলাই জানাটা একালের মতোই অপরিহার্য ছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ঋগ্বেদের যুগেও সীবনবিদ্যা বা সেলাই করার বিদ্যা প্রচলিত ছিল। 'সূচী' (needle) শব্দটি ঋগ্বেদে (২.৩২.৪), যজুর্বেদে (বাজসনেয়ি সংহিতা, ২৩.৩৩), অথর্ববেদে (১১.১০.৩) এবং ব্রাহ্মণসাহিত্যে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে (২.৩.৬) ব্যবহৃত 'পেশঃ' শব্দটির অর্থ ম্যাকডোনেল ও কিথ করেছেন embroidered garment।

দেখা যাচ্ছে, বাৎস্যায়নও সূত্রক্রীড়া বা সূত্র দ্বারা চিত্রনির্মাণের কথা বলেছেন। বেদের যুগে আর্যদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অতিসরলীকৃত ধারণা থাকার ফলে শ্যাম বেনেগালের 'ভারত এক খোজ' নামক চলচ্চিত্রে দেখতে পাওয়া যায়, মহাভারতে বর্ণিত আর্য রাজপুরুষ ও রাজন্যবর্গ অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে উত্তরীয় পরে রয়েছেন। অথচ ঋগ্বেদে (১.৯৫.৭; ২.৩৫.১৪; ১.২৫.১৩; ১.১১৬.১০) অসংখ্যবার 'অৎক' (mantle) এবং 'দ্রাপি' (cloak) প্রভৃতি জামা বা কামিজ-নির্দেশক পোশাকের উল্লেখ রয়েছে।[১১] সুলতানি-পাঠানি আমলের পূর্বে বাংলায় গ্রাম ও শহরের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তার কারণ আসলে আর্থ-সামাজিক।

ঞ, ট. বেতের তৈরি বাস্কেট ও বিভিন্ন গৃহকর্মে ব্যবহার্য সরঞ্জাম বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও ক্রমশ বিরলদৃশ্য হয়ে পড়ছে। প্লাস্টিকের তৈরি সরঞ্জাম তার স্থান দখল করেছে। বেতের তৈরি মোড়া, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদিকে হঠিয়ে দিচ্ছে স্টিল ফার্নিচার। কাঠের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় কাঠের বিকল্পরূপে স্টিলের তৈরি আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ ঝুড়িবোনা-শিল্প (basketry) নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এই শিল্পের অন্তর্গত হচ্ছে মাদুর, চাটাই এবং নকশা-কাটা সতরঞ্চি। বুনুনি আর সেলাই, দুটি শিল্পকর্মই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বিনয় ঘোষ লিখেছেন :

> বাংলাদেশের সমস্ত রকমের ঝুড়িকুলোডালা, এমনকি মাদুর এবং হাতপাখাও তৈরি হয় বাঁশ, শর, বেত, ঘাস, তালপাতা, খেজুরগাছ এবং নারকেলপাতা দিয়ে। নানাবিধ আকার এবং ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের ঝুড়ি, মাদুর এবং পাখা মধ্যে মধ্যে ফুটকি দিয়ে অলংকৃত করা হয়, আবার কখনও তাদের উপর থাকে নানারকমের বর্ণাঢ্য নকশা। কারুকার্যশোভিত ছোটবড় পাতার পাখা একসময় সারা বাংলা দেশে তৈরি হত। এখন কেবল তালপাতা বা বাঁশের তৈরি হাতপাখার সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বে বনেদী অভিজাত পরিবারগুলিতে যেসব বিশাল আকারের কারুকার্যময় পাতার পাখা ব্যবহৃত হত, সেই সমস্ত বনেদী অভিজাত পরিবারগুলির অবলুপ্তি, এক নয়া-অভিজাত শ্রেণীর উত্থান এবং বৈদ্যুতিক পাখা, এয়ারকুলারের আধিপত্যে সেসব অদৃশ্য হয়ে গেছে।... মেদিনীপুরের একটি 'মসলন্দ' অথবা সিলেটের একটি 'শীতলপাটি', একশো বছর আগে একশো থেকে হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।[১২]

উক্ত নিবন্ধে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, সিলেটের উৎকৃষ্ট শীতলপাটিগুলি খুব মসৃণ হত এবং 'খুব সহজেই সেগুলিকে গুটিয়ে জামার মধ্যে পুরে নেওয়া যেত।[১৩] তিনি মহিষাদল, নাড়াজোল ও মেদিনীপুর জেলার অনেক রাজবাড়িতে একশো গজেরও বেশি লম্বা প্রকাণ্ড গোটানো মাদুর দেখেছেন, যেগুলিতে উৎসব-অনুষ্ঠানে দু-তিনশো লোক বসতে পারে।[১৪] ঢাকাই মসলিনের কথা এখন কেবল জনশ্রুতিতেই পর্যবসিত।

বাৎস্যায়ন তক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা চতুঃষষ্ঠি কলাবিদ্যার অন্তর্গত। কাঠখোদাই-শিল্পও একটা

অসাধারণ লোকশিল্পের নিদর্শন, যা লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। বাৎস্যায়ন মনে হয় এটাকেই 'তক্ষণ' নামে অভিহিত করেছেন। বিনয় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে কারুকার্য শোভিত কাঠের দরজা-জানালা, সিন্দুক, খাট-পালঙ্ক এবং পশ্চিমবঙ্গের খড়ছাওয়া বিশাল চন্ডীমণ্ডপগুলির অলংকৃত কাঠের থাম ও চূড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মণ্ডপগুলির কাঠের কাঠামো থাম কড়ি বরগা এবং খিলানগুলিতে দেবদেবীর প্রতিকৃতি, পৌরাণিক উপকথাসমূহ, জীবজন্তু পাখি ফুল ইত্যাদি অতুলনীয় যত্ন এবং কুশলতার সঙ্গে খোদিত হত।[১৫]

ঠ. ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল বলে এককালে আসামে তথা উত্তরপূর্বাঞ্চলে এবং সেসঙ্গে বরাক উপত্যকাতেও আসাম-টাইপের বাড়িঘর ব্যাপকভাবে তৈরি হত। তিন-চার ফুট ইটের দেয়াল তুলে তার ওপর কাঠের ফ্রেমে ইকড় বসিয়ে অথবা বাঁশের বেড়া দিয়ে তার ওপর চূণ-সুরকি বা সিমেন্টের পলেস্তারা করা হত। অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা কাঠের দোতলা বাড়ি তৈরি করতেন। বর্তমানে সেই ঐতিহ্যে ছেদ পড়েছে। আর-সি-সি গৃহনির্মাণে জোয়ার এসেছে। আর গৃহনির্মাণের জন্য ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়াটাও হয়েছে সহজতর। কিন্তু কয়েক দশক পূর্বেও বাংলার গ্রামাঞ্চলে তথা বরাক উপত্যকায় খড়ের বা টিনের চাল দিয়ে যে ধরনের বাড়ি তৈরি হত, তাতে চৌচালা বা আটচালা ব্যবহৃত হত। গ্রামের গৃহস্থ বাড়িতে গোয়ালঘর থাকত, আর থাকত ঈশাণকোণস্থ দেবালয় বা ঠাকুরঘর। গৃহস্থবাড়িতে দেবালয় কোথায় থাকবে, এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে।

পশ্চিমবাংলার লোকস্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকসংস্কৃতি-গবেষক বিনয় ঘোষের এই বিষয়ক বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন :

> ঐতিহ্যবাহী সমস্ত লোকশিল্পসমূহের মধ্যে আশ্রয় অথবা গৃহ-নির্মাণ— প্রথমত, আবাস বা মানুষের বাসস্থান এবং তারপর দেবালয় বা দেবদেবীর থাকবার গৃহনির্মাণ (মন্দির) সম্ভবত প্রাচীনতম শিল্প। অতি প্রাচীন কোনো রুক্ষ ধাঁচের অনুকরণে, পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত তিন ধরনের গৃহ তৈরি হয়েছে। এই ধরনগুলি হচ্ছে (১) উঁচু চালের চারকোণা খড়ের ঘর, যেগুলি দোচালা, চৌচালা বা আটচালা এবং এক/দুই/তিনতলা পর্যন্ত হয়। (২) বাঁকাচালের খড়ের ঘর, সাধারণত চৌচালা এবং এক অথবা দুই তলা পর্যন্ত হয়। (৩) 'গোলাঘর' বা শস্যাদি মজুত রাখবার জন্য মৌচাকের মতো গোলাকৃতি খড়ের ঘর। জলবায়ুগত কারণেই পশ্চিমবঙ্গে সমতলচালবিশিষ্ট ঘর দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে ঘরের চালা ঠেকনো দিয়ে উঁচু থেকে নিচু দিকে ঢালু করে রাখা হয় এবং এর ফলে বৃষ্টির জল অতিদ্রুত ঝরে যেতে পারে। এ কারণেই ঘরের চালাটি একটি টোপরের মতো একসারি আড়াতে ভর করে দেওয়ালের উপর অবস্থান করে এবং ক্রমে দেওয়াল ছাড়িয়ে নিম্নাভিমুখী হয়ে যায়। এই ঠেকনো-দেওয়া উঁচু চালযুক্ত খড়ো ঘরগুলিই হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অপরূপ স্থাপত্য শিল্পরীতিটি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যশিল্পী 'ঘরামি' এবং 'সূত্রধর'গণের পুরুষানুক্রমিক শিল্পকর্মের মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে এবং পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ দেবালয়গুলি গড়ে উঠেছে এই বাঁকা চালযুক্ত খড়ো ঘরের হুবহু অনুকরণে।[১৬]

বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন 'চণ্ডীমণ্ডপ'। বাংলার লৌকিক শক্তিদেবীর মধ্যে চণ্ডী মনে হয় প্রাচীনতম। উড়োনচণ্ডী, শুভচণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি নামে এই দেবী বাংলার গ্রামীণ সমাজে পূজিতা হয়ে থাকেন। বিনয় ঘোষ লিখেছেন :

> চণ্ডী যে আর্যপূর্ব লোকসমাজের দেবতা ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও কিছু পাওয়া যায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওঁরাওদের মধ্যে আজও 'চাণ্ডী' নামে এক দেবতার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই 'চাণ্ডী' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র রায় বলেছেন, 'This is the deity par excellence of unmarried young Oraons.' ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী, কিন্তু দৈহিক গঠনে আদি-অস্ত্রাল-সদৃশ। অবিবাহিত ওঁরাও যুবকদের প্রধান

উপাস্য দেবতাই হলেন 'চাণ্ডী'। চাণ্ডী স্ত্রীদেবতা এবং মূর্তি স্বাভাবিক একখণ্ড শিলামূর্তি। আদিম শিলাপূজার পরিষ্কার নিদর্শন। প্রধানত 'চাণ্ডী' হলেন বন্যপশুর দেবতা, শিকারের দেবতা।[১৭]

অনার্য দেবী 'চাণ্ডী' যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্মে 'চণ্ডী' দেবীতে পরিণত হয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্থান পেয়েছেন, তখন থেকেই মনে হয় গ্রামে গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত চণ্ডীমণ্ডপ কেবলমাত্র দুর্গোৎসবের উৎসবগৃহ নয়, এটা সর্বসাধারণের উৎসব-পার্বণের মিলনায়তন। আবার এটা গ্রামীণ মানুষের আলোচনা-পরামর্শের সভাগৃহ, অতিথিশালা, বিচারালয় কিংবা পাঠশালাও হতে পারে। গ্রামের এই চণ্ডীমণ্ডপেই ভাগবত পাঠ, চৈতন্যমঙ্গলের গান, চণ্ডীমঙ্গলের গাথা, মনসামঙ্গল গান, পদকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের কাঁঠালের খুঁটিতে খোদিত হত হাতির শুঁড়, বাঘের মুখ আর নানারকম ফুল-লতাপাতা। বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে লিখেছেন, নবদ্বীপে মুকুন্দসঞ্চয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইপণ্ডিত পড়ুয়াদের পড়াতেন। বিশাল সেই চণ্ডীমণ্ডপে চতুর্দিকে বিস্তর বিদ্যার্থীরা জড়ো হত। গৌরাঙ্গদেব তাদের পৃথক পৃথক দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে বিদ্যাদান করতেন:

মুকুন্দসঞ্চয় বড় মহাভাগ্যবান।
যাহার মন্দিরে বিদ্যাবিলাসের স্থান।।
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়।
তাহারাও প্রভু প্রতি ভক্তি সর্বথায়।।
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তায় ধরে।।
গোষ্ঠী করি তাহাঞি পড়ান দ্বিজরাজ।
সেইস্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ।।[১৮]

বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'চণ্ডীমণ্ডপ একটা 'ইনস্টিটিউশন' বিশেষ। বাঙ্গালীর লৌকিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিচিত্র উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে মিলিত হয়েছিল একদিন।[১৯]

বাৎস্যায়ন ধাতুবিদ্যার উল্লেখ করেছেন। তামা দ্বারা দস্তার মিশ্রণে পিতল তৈরি হয় এবং তামা আর টিনের মিশ্রণে তৈরি হয় কাঁসা। হিন্দু সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই দেবার্চনার কাজে তাম্রনির্মিত বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার্য থালা, ঘটি, বাটি, পানপাত্র ইত্যাদি কাঁসা-নির্মিত হয়ে থাকে। দেবার্চনার কাজে পাথরের তৈরি বাসনপত্রাদিও ব্যবহৃত হয়। অষ্টধাতু কিংবা পিতলের তৈরি দেবমূর্তি ধর্মকার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তামার মাদুলি এবং রৌপ্যনির্মিত কবচের ঠোল এখনো গ্রামে ও শহরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু গৃহস্থালির কাজকর্মে বর্তমানে স্টেনলেস স্টিল, এনামেল, অ্যালুমিনিয়াম, পোর্সেলিন, কাচ ও মেলামাইনের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পোড়া মাটির তৈরি পাতিল, কলস, কুজোর ব্যবহার বর্তমানে গ্রামীণ জীবনেও অনেক কমে গেছে।

8.

সংস্কৃতির ভুবনে ভাঙাগড়ার ফলে লোকসংস্কৃতির রূপান্তর হয়। এতে লোকসংস্কৃতি কালক্রমে ধ্রুপদি রূপ লাভ করতে পারে কিংবা নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাবে পরিশীলিত রূপ লাভ করতে পারে। আবার লোকসংস্কৃতির বিশ্বতোমুখী সম্প্রসারণও (universalisation) তাতে হয় সম্ভব। থিসিস আর অ্যান্টি থিসিস কালক্রমে সিন্থেসিসরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আমাদের উল্লিখিত বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য এখানে রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বেদগানের প্রাকৃতরূপ' গ্রন্থের মূল বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। রাজ্যেশ্বর মিত্রের অভিমত অনুসারে সামবেদের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয় গানগুলিই আসলে বৈদিক যুগের প্রাকৃত ভাষার লোকসঙ্গীত। বেদের ঋষিরা

এগুলিকে বৈদিক সংস্কৃতভাষায় রূপদান করেন। ঋগ্বেদের মধ্যে আবৃত্তিযোগ্য মন্ত্রগুলিতে 'ছন্দ' প্রধান স্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে প্রাকৃত ভাষায় রচিত সুরারোপিত গানগুলিকে 'সাম' বলে স্বীকৃতি দান করা হয়। দেবতা, গন্ধর্ব, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি আর্যসমাজ-ভুক্ত জাতির মধ্যে প্রাচীনকালে 'যজ্ঞ' ছিল একটি অনুষ্ঠান, যার অর্থ ছিল সাধারণ সম্মেলন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে সকলে একত্র হয়ে পানভোজনসহ নানা আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। রাজ্যেশ্বর মিত্রের অভিমত হচ্ছে, 'যজ্ঞ নামক অনুষ্ঠানটি অসুরদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এমন কথা কোনও কোনও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। তখন এটি কোন নামে এবং কোন রূপে পরিচিত ছিল সে সম্বন্ধে কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এটিকে একটি মঙ্গলকর অনুষ্ঠান বিবেচনা করে আর্যেরা (দেবতারা) এটিকে ব্যাপকভাবে চালু করে, তার নাম দিয়েছিলেন যজ্ঞ।''[২০]

যজ্ঞানুষ্ঠানে বৈদিক আর্যদের মুখের ভাষায় রচিত প্রাকৃত বৈদিক সঙ্গীত সামগানগুলি গীত হত, পরে যেগুলিকে দেবগোষ্ঠীর আর্যদের দ্বারা পরিশীলিত ছন্দোবদ্ধ রূপ দান করা হয় ঋমন্ত্রগুলির মধ্যে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়, নাটকে প্রযুক্ত প্রায় সকল সঙ্গীতই প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ঋঙ্মন্ত্রগুলির ভাষা আসলে বাংলা সাধুণাষার মতোই কৃত্রিম এবং বৈদিকযুগের সাধুভাষা। এই বৈদিক সাধুভাষা বা ঋমন্ত্রগুলির ভাষা আদিম বৈদিক প্রাকৃত সঙ্গীতের বা সেকালের আর্যভাষার লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করেছে।[২১] বৈদিক ঋক্-সংহিতার Great Tradition তাই সেকালের বৈদিক প্রাকৃত সঙ্গীতের Little Tradition আত্মসাৎ করার মাধ্যমে গড়ে-ওঠা ছন্দোবদ্ধ ধ্রুপদি কাব্যরূপ। সেকালের বৈদিক প্রাকৃত লোকসঙ্গীত যদি হয় থিসিস, আর বিভিন্ন বৈদিক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক উন্নত ও পরিশীলিত দেবগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি যদি হয় অ্যান্টি-থিসিস, তবে ঋক্-সংহিতার মধ্যে ধ্রুপদি কাব্যরূপান্বিত ঋমন্ত্রগুলি হচ্ছে সিন্থেসিস।

বৈদিক যুগ থেকে এবারে আমরা আধুনিক যুগে আসতে পারি এবং বৈদিক সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের (১৮৬১) একটি কবিতা আমরা এখানে আমাদের মূল বক্তব্য প্রতিপাদনসূত্রে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করতে পারি। কবিতাটি হচ্ছে এই:

নাচিছে কদম্বমূলে
বাজায়ে মুরলী রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি,
দেখি গে প্রাণের হরি,
গোকুল রতন!
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে,
স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন!
যৌবন মধুর কাল,
আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।[২২]

সামবেদের গানগুলির সঙ্গে ঋগ্বেদের ঋন্ত্রগুলির যে পার্থক্য, গেয় বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে পাঠ্য 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের সেই পার্থক্য। বৈষ্ণব পদাবলী গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার অধীন, আর মধুসূদনের কাব্য বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা অবলম্বন করে রচিত হলেও কলকাতার নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। মধুসুদনের কাব্যভাষাও পরিশীলিত ও প্রসাধিত। এখানে 'শ্রীমধুসূদন' শব্দটি কৃষ্ণ ও কবি মধুসূদন, উভয় অর্থে প্রযুক্ত 'শ্লেষ' অলংকারের দৃষ্টান্ত। অনুরূপভাবে 'কাল' শব্দটি ঋতু, মহাকাল বা মৃত্যু ও যথাসময় অর্থে প্রযুক্ত 'যমক' অলংকারের

উদাহরণ। বৈষ্ণব পদাবলীর ভক্তিধর্মের পরিমণ্ডল ও আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে মধুসুদনের কবিতায় রয়েছে রোমান্টিক মন ও মেজাজ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৩) কাব্যে বিদ্যাপতির কাব্যরীতি ও ব্রজবুলি ভাষা আশ্রয় করেছেন। তা সত্ত্বেও রচনারীতিতে রাবীন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য এতটা সুপ্রকট যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেছেন, 'তাই ভানুসিংহের সঙ্গে বৈষ্ণবচিত্তের অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা নেই।' [২৩] একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন,

গহন-কুসুমকুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো।। [২৪]

বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথের হাতে যথার্থ অভিনব ও আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে যে-ধরনের কবিতায়, সেখানে বিষয়বস্তুর বিচারে পদাবলীর গোত্রধর্ম বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথের গান ভাষায় ও সুরে একান্তই রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠেছে এবং এমনি করে পদাবলী সাহিত্যের Little Tradition নবরূপায়িত হয়েছে নাগরিক সংস্কৃতির Great Tradition-এর মধ্যে। যেমন,

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি —
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।।
শুনেছি মুরতি কালো তারে না দেখা ভালো।
সখী, বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।।
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়নকোণে হেসেছিল সে।
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কাননপথে যে খুশি সে যায়, কদমতলে যে খুশি সে চায়-
সখী, বলো আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি।। [২৫]

ভাবে বা বিষয়বস্তুতে বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয় হলেও উদ্ধৃত রচনাটি ভাষা, সুর ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে অবশ্যই এক অভিনব সৃষ্টি, যাকে আমরা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বলে থাকি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি Great Tradition হলেও তার গভীরে বাংলার লোকসংস্কৃতি বা Little Tradition-এর অন্তর্লীন প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে বাংলার বাউল গানের প্রভাব রবীন্দ্র-মানসকে আপ্লুত করেছিল। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের নগরজীবন-কেন্দ্রিক ধ্রুপদি উপন্যাস। কিন্তু তার মধ্যে গুঞ্জরিত হয়েছে বাউল গানের কলি :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।[২৬]

রবীন্দ্রনাথের গানে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রসংগীতে বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব যে কত গভীর তা সংগীতজ্ঞের শিক্ষিত কান ছাড়াও সাধারণের অশিক্ষিত কানেও ধরা পড়ে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'ও আমার দেশের মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি গানে বাউল সুরের প্রভাব প্রত্যক্ষ। তিনি নিজেই একথা স্বীকার করেছেন।'[২৭] রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন মিলটন-সিঙ্গার-কথিত সেই cultural specialist, যাঁর গানের কথা ও সুরের সংযোগসেতুর দ্বারা রেডফিল্ড-কথিত rural-urban continuum বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক ভুবনে বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে।

লোকস্থাপত্যশিল্পের রূপান্তর-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকীকরণ বা Great Tradition এ পরিণতিলাভ বিষয়ে এবারে আসা যেতে পারে। ইংরাজি ভাষায় 'bungalow' শব্দটি প্রবেশ করেছে বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। Bungalow শব্দটির উৎস হচ্ছে বাংলায় প্রচলিত লোকস্থাপত্যরীতির বিশেষ প্রকার খড়ের বা ছনবাঁশের চালের বাসভবন, যা গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক ও উষ্ণতাপ্রতিরোধক। চা-বাগানের ম্যানেজার,

জেলা সদরের পুলিশ আধিকারিক, মহকুমা শাসক বা উপায়ুক্ত ইংরেজ আমলে এ-ধরনের সরকারি বাসভবনে থাকতে শুরু করেন। বাংলার নিজস্ব রীতিতে নির্মিত বলে লৌকিক প্রয়োগে একে বলা হয় 'বাংলো'। ডি-সি সাহেবের বাংলো, ইনস্পেকশন বাংলো, টুরিস্ট বাংলো ইত্যাদি প্রয়োগের সঙ্গে কমবেশি সবাই পরিচিত। শব্দটির সম্ভাব্য উৎস 'বঙ্গালয়' (বঙ্গ+ আলয়), অর্থাৎ বঙ্গদেশে প্রচলিত রীতির দেশজ আলয় বা বাসভবন। এই রীতির বাসভবন বাংলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় ইংরেজ আমলে। কলকাতা যখন হয় ভারতের রাজধানী, তখন বহির্বাংলাতেও 'বাংলো'-র স্থাপত্যরীতি ছড়িয়ে পড়ে।

এবারে লোকায়ত ধর্মীয় সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। গৌতম বুদ্ধ সেকালের ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সারস্বত পীঠস্থান ও মহাজনপদ কাশীধামের অনতিদূরে সারনাথে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন এবং তাকে একটি সর্বাধুনিক ও সার্বভৌম (universal) রূপদান করেন। কিন্তু কালক্রমে এদেশের লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি-সংস্কার বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে এবং বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি শাখা-উপশাখার সৃষ্টি করে। এভাবেই বিভিন্ন লৌকিক বৌদ্ধ মত ও পথের জন্ম হয়। অনুরূপ ঘটনা ঘটে চৈতন্যদেবের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বাংলায়। কালক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রেও মূল ধ্রুপদি রূপরীতির পাশাপাশি বিভিন্ন লৌকিক রূপরীতির আবির্ভাব ঘটে। নিত্যানন্দ প্রভু এবং তাঁর পুত্র বীরভদ্র যখন সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন, তখন কালক্রমে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, বিভিন্ন লোকবিশ্বাস ও লৌকিক রীতিনীতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মচর্যার রূপরীতির আবির্ভাব ঘটে। বিশ শতকের সূচনায় শ্রীহট্ট জেলায় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার তিনশো উনআশি। একথা ১৯০১ সালের লোকগণনার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক বৈষ্ণবদের অধিকাংশই কিশোরীভজা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের সাধনভজনের সঙ্গে চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মীয় রীতিনীতির বৈপরীত্য সুপ্রকট। জগন্মোহন গোস্বামী (১৫২৮ - ১৫৬০) শ্রীহট্টে জগন্মোহনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু রামকৃষ্ণ গোস্বামী (১৫৭৬ - ১৬৫২) জাতিগত পরিচয়ে ছিলেন কৈবর্ত। তিনি শ্রীহট্ট জেলায় বিথঙ্গলে (বর্তমানে শ্রীমঙ্গল বলে পরিচিত) আখড়া স্থাপন করেন ও বিশাল সম্প্রদায় গড়ে তোলেন।[২৮] এই প্রসঙ্গে রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন :

> Kisoribhajana sect very probably originated in Sylhet in the second half of the eighteenth century. It was founded by a Brahmana named Raghunatha Bhattacharya and his Kayastha friend Syamakisora Ghose of village Ita. … Raghunatha's 'spiritual wife' was a young non-Brahmana widow. [২৯]

শ্রীহট্টে বৈষ্ণবধর্মের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ যে লোকধর্ম তথা লোকবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত ভিন্নপথানুসারী সম্প্রদায়, একথা রমাকান্ত চক্রবর্তী উল্লেখ করে লিখেছেন, 'The strength of the Vaisnavism in Sylhet was attributed to the great popularity of the deviant Vaisnava orders.'[৩০]

আসামের ইন্দো-মোঙ্গোলীয় (Indo-Mongoloid) গোষ্ঠীর লোকধর্ম ও বিশ্বাস কীভাবে হিন্দুধর্মের মাতৃকা-উপাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লৌকিক পর্যায় থেকে ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দুধর্মের ধ্রুপদি রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে, তার দৃষ্টান্তরূপে শিলচরের নিকটবর্তী উধারবন্দের কাঁচাকান্তি দেবীর উল্লেখ করা যেতে পারে। মূলত 'কেচাইখাতি' নামে পরিচিত একটি উপজাতির এই দেবী বর্তমানে বাঙালি ভক্তদের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকেন। এককালে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল বলেই হয়তো কাছাড়ি উপজাতির আরাধ্যা দেবীর 'কেচাইখাতি' নামের উৎপত্তি।[৩১]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের পরই ওড়িশার অন্তর্গত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত 'রথযাত্রা' উৎসবের বহির্মুখী বিস্তার লাভ হয়েছে। বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত 'রথযাত্রা' উৎসবটি মূলত লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত

হলেও বর্তমানে বিশ্বতোমুখী সম্প্রসারণের ফলে এর একটা ধ্রুপদি রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

নারীর অঙ্গরাগ বা প্রসাধন ও সাজসজ্জা বিষয়ে কিছু কথা আগে বলা হয়েছে। নারীর ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাস পাশ্চাত্য রীতি ও নাগরিক সংস্কৃতির পরিচয়বাহী হলেও গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির একান্ত অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। স্নো-পাউডার-নেল পালিশ-পারফিউম-হেয়ার ক্লিপ এখন গ্রামের কিশোরী-যুবতীর কাছেও অপরিহার্য। এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি যেমন নাগরিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তেমনি আবার শহরের গৃহবধূর কপালে সিঁদুরের টিপ ও চোখে কাজলরেখা মধ্যযুগের গ্রামীণ রমণীর সাজসজ্জার কথা মনে করিয়ে দেয়। সংস্কৃতির ভুবনে এ-জাতীয় আদান-প্রদান ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরুষের মন ভোলানোর জন্য সিঁদুর ও কাজল মন্ত্রপূত করে প্রয়োগ করা হত বলে জানা যায়। কাশীরাম দাসের মহাভারতে দেখা যায়, কামপ্রিয়া রতি সুভদ্রাকে মন্ত্র পড়ে সিঁদুর ও কাজল দিয়ে সাজিয়ে দেন :

এত বলি সিন্দুর পড়িয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়ন কজ্জলে।।[৩২]

বিবাহের সঙ্গে জড়িত এবং অন্তঃসত্ত্বা রমণীর বিভিন্ন লোকাচার বা স্ত্রী-আচার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে ও অন্যত্র এসবের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, বিবাহের পূর্বে কন্যার গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে-হলুদ :

হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার ৩৩

মনসামঙ্গলে অন্তঃসত্ত্বা সনকার সাধভক্ষণের বর্ণনাও রয়েছে :

পঞ্চমাস গর্ভ　　　লোকে বলে সর্ব
শুন ঝেউয়া বলি তোরে।
কতেক দিবস　　　মনের মানস
সাধ খাওয়াইবে মোরে।। [৩৪]

লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত বিভিন্ন লোকাচার ও লোকবিশ্বাস হিন্দুধর্ম ও সমাজে গৃহীত হয়ে যে একটা ধ্রুপদি রূপ লাভ করেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। লোকশিল্পরীতি পটের ছবির ক্ষেত্রেও এটা ঘটেছে। প্রসঙ্গত যামিনী রায়ের চিত্রশিল্পের কথা বলা যেতে পারে। যামিনী রায় (১৮৮৭ - ১৯৭২) তাঁর ছবিতে পটচিত্রের অঙ্কনরীতির সঙ্গে প্রতীচীর ম্যুরাল (mural) অঙ্কনরীতির সমন্বয় ঘটিয়ে একটা নিজস্ব আধুনিক শৈলী গড়ে তোলেন। বাংলার পটশিল্প তাঁর হাতে আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসর হয়। বাংলার লোকশিল্প এভাবেই ধ্রুপদি ও নাগরিক স্তরে উন্নীত হয় যামিনী রায়ের চিত্রকলায়।

লৌকিক ধর্মচর্যা যে অনেকক্ষেত্রেই বিবর্তনের পথে যাত্রা না করে আদিম ও অপরিশীলিত রূপেই থেকে গেছে, তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'চড়ক' উৎসব বা শিবের গাজন। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যাতে শৈবধর্মের রক্তাম্বরধারী সন্ন্যাসীরা যোগ দেয়। মাটিতে পোঁতা বিশ/ত্রিশ ফুট দীর্ঘ একটা বাঁশ বা দারুস্তম্ভের মাথায় তরাজুর দাঁড়ির আকারে বাঁধা দণ্ডে এক বা একাধিক সন্ন্যাসী পিঠে বিদ্ধ বঁড়শির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। তারপর এ-রকম পিঠের বঁড়শিতে বাঁধা দড়িতে ঝুলে সন্ন্যাসীরা শূন্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। 'চড়ক' শব্দটি 'চক্র' শব্দ থেকে এসেছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা। [৩৫]

পৃথিবী ও মানুষের জীবনের মতোই ভুবনও গতিশীল ও ঘূর্ণায়মাণ। এই গতিশীলতা ও ঘূর্ণায়মাণতার ফলে সংস্কৃতির ভুবনে নানা প্রকার ভাঙাগড়া, সংকোচন-প্রসারণ ঘটে থাকে। এরই ফলে থিসিস যেমন অ্যান্টি-থিসিসের মাধ্যমে সিন্থেসিসে পরিণতি লাভ করে, তেমনি Little Tradition উত্তীর্ণ হয় Great Tradition-এ।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. Makhan Jha, Civilizational Regions of Mithila and Mahakoshal, Delhi, 1982, p. 10.
২. Ibid., p. 10.
৩. Ibid.
৪. Janmajit Roy, 'Mahiravaner Juddha: A Ramayanic Episode in Folk Tradition in the Barak Valley: in S. Ghosh (ed.), Ramayana in the North-East India, Delhi, 2002, pp. 125-130.
৫. পাতঞ্জল যোগসূত্র (৪.২) জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ।
৬. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' (বিশ্বভারতী, ফাল্গুন, ১৩৭১) গ্রন্থে রেডিয়ম কীভাবে নিজের মধ্য থেকে জ্যোতিষ্কণা বিকীর্ণ করতে করতে নিজেকে নানা মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করে অবশেষে সীসাতে পরিণত হয়, তার উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৩৪)।
৭. মহাভারত অনুসারে (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারত, ১ম খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৪, আদি পর্ব, ১৭৫তম অধ্যায়, পৃ. ১৮২) বিশ্বামিত্র তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন হয়ে তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করেন এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সোমরস পান করেন।
৮. ভাগবতপুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত, কলকাতা, ১৯৭৭, ৯ম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়, পৃ. ৪৭৭) অনুসারে, হরিশ্চন্দ্রের পিতা সত্যব্রত। ত্রিশঙ্কু পিতৃশাপে চণ্ডাল হয়েছিলেন।
৯. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪০৫।
১০. নৃপেন্দ্র গোস্বামী, বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ১১৫।
১১. জন্মজিৎ রায়, 'বৈদিক যুগের ভারতের সাজ-পোশাক', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২০৬-২১৩।
১২. বিনয় ঘোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৭৩।
১৩. তদেব, পৃ. ৭৩।
১৪. তদেব, পৃ. ৭৩-৭৪।
১৫. তদেব, পৃ. ৭০।
১৬. তদেব, পৃ. ৭৮-৭৯।
১৭. তদেব, পৃ. ১২৭।
১৮. বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত (সম্পা. সুকুমার সেন), সাহিত্য অকাদেমি সংস্করণ, ২০০৩, আদি, ৯. ৩৮-৪২।
১৯. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫।
২০. রাজ্যেশ্বর মিত্র, বেদগানের প্রাকৃত রূপ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৭।
২১. তদেব, পৃ. ১৩, ৩১-৩২।
২২. মধুসুদন, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বংশীধ্বনি, ৬।
২৩. রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, বিশ্বভারতী, ১৩৭৬, সূচনা, পৃ. ১০।
২৪. তদেব, পৃ. ৩১।
২৫. গীতবিতান, বিশ্বভারতী, ১৯৭০, পৃ. ৭৫৬।
২৬. রবীন্দ্রনাথ, গোরা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৭, পৃ. ৭।
২৭. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-৯।
২৮. Ramakanta Chakravarti, Vaisnavism in Bengal, Calcutta, 1985, p. 328.
২৯. Ibid., p. 325.
৩০. Ibid., p. 328.
৩১. Janmajit Roy, 'An Account of the Kachari Goddess Kancha Kanti': Sankar Sengupta ed. Folklore, Calcutta, February, 1981, pp. 42-48.
৩২. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কাশীদাসী মহাভারত, কাশীখণ্ড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২২২।
৩৩. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ৩৭।
৩৪. তদেব, পৃ. ১৫।
৩৫. অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, 'আমাদের চড়ক', দেশ সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ-সংকলন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩-৬।

বরাক উপত্যকার লোকসংগীতে অধ্যাত্মবাদ : সম্প্রীতি চেতনার প্রেক্ষাপট

আবুল হোসেন মজুমদার

১.

ধর্মবিশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত, নাস্তিকতা একটা কৃত্রিম অভ্যেস। চারদিকের প্রকৃতি, নিজের দেহমন-জীবন, জীবনের চাওয়া-পাওয়া-হারানো, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনা, রোগব্যাধি, মিলন-বিরহ, মৃত্যু ও প্রাণ — এসব নিয়ে বোধ-বুদ্ধির জাগরণের সময় থেকেই ভেবে আসছে মানুষ, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আসছে, উত্তর খুঁজছে সেসব প্রশ্নের। উত্তর গড়ে তুলছে, গড়ে তুলছে তত্ত্ব, গড়ে উঠছে বিশ্বাস, প্রত্যয়মালা আর সেসব বিশ্বাস ও প্রত্যয়মালাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠছে আচার-বিচার-আচরণ। এইসব থেকেই পুজো অর্চনা আর উপাস্য, দেবী-দেবতা, ভগবান ঈশ্বর লাভ করছেন অস্তিত্ব। সেই পুজো-অর্চনা দ্বারা ভক্তি যেভাবে নিবেদন করা হচ্ছে আরাধ্যের কাছে, সেভাবে তাঁর বা তাঁদের কাছেই নিবেদিত হচ্ছে আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-শোক, ব্যথাবেদনা, চাওয়া হচ্ছে প্রতিকার। কেবল তাই নয়, প্রকৃতিকে ভয় করছে মানুষ, আবার ভালবাসছে, পুজোও করছে। এসব কিছুর মধ্যেই এসব কিছুর ঊর্ধ্বে এক অসীম, মহান, চরম ও পরমের কাছে আত্মসমর্পণ করে মানুষ পেতে চেয়েছে অমৃতের স্বাদ; কবিগুরুও বলেছেন 'সেই পূর্ণতার পায় মন স্থান মাগে'। এই পরম, এই পূর্ণকে কতভাবে ডাকা হয়, যতভাবে ডাকা যায়, ততই তৃপ্তি পাওয়া যায়, ডাকতে ইচ্ছে করে। তবে পরমাত্মা বলে যেভাবে তাকে বোঝা যায়, সেভাবে হয়তো বা তাঁর সঙ্গে আপনত্ববোধের আর কোনো পন্থা নেই। এই পরমাত্মার সর্বব্যাপী উপস্থিতির ধারণা মিশে আছে ব্যাপকভাবে ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে। এই বোধ থেকেই জন্ম অধ্যাত্মবাদের।

এখানে এই ব্যাপারটাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, স্বাভাবিকভাবে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়া উপরিউক্ত প্রকার। এই প্রক্রিয়ায় বিকশিত ধর্ম যে সর্বত্র সবার মধ্যে একরকম হবে, তা মোটেই নয়, বাস্তবতাও তা প্রমাণ করে না। ধর্ম যখন প্রত্যাদিষ্ট, তখন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব নবি, রসুল, প্রফেট যে পরিচয়েই হোন প্রত্যাদিষ্ট ঐশীবাণী বা গ্রন্থের আলোকে মানুষের মধ্যে তিনি যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, যে দেশের অধিবাসী, প্রচার করেন তাঁর আনীত ব্যবস্থা সেই জাতি ও সে দেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম তারপর অন্যদেরও আহ্বান করেন সে ব্যবস্থার দিকে, ধর্মের দিকে। যেমন হয়েছে খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে। প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম হয় সাধারণত সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা,
- মানবজীবনের সকল বিভাগের সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য তা দেয় প্রত্যাদিষ্ট নির্দেশনা, যা আসে এমন একজন নিয়ন্তার কাছ থেকে যিনি মানুষের ও তার পারিপার্শ্বিকের একমাত্র স্রষ্টারূপে তার কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল। এ কারণেই তাঁর বিচার হয় নির্ভুল আর তাই অলঙ্ঘ্য। এই বিশ্বাস থেকেই প্রত্যাদিষ্ট ধর্মাধীন মানুষের সকল আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, মূল্যবোধ অস্তিত্ব লাভ করে আর নিয়ন্ত্রণ করে সেই সমাজকে। এ একটা সংগঠিত ব্যবস্থা যার রয়েছে বিশাল আইনভাণ্ডার, সমাজ ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা যুদ্ধ ও শান্তি, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি মানবজীবনে প্রয়োজনীয় সবকিছুর জন্য সুবিন্যস্ত নিয়মকানুন।

বিশেষত ইসলামধর্মের পরিচয় এভাবেই দেওয়া যায়। এই সবকিছুর মধ্যে ইহকাল-পরকাল তত্ত্ব এবং শেষ বিচারে বিশ্বাস জীবনের নিয়ন্ত্রণে পালন করে বিশেষ ভূমিকা।

প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ছাড়াও আছে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ তথা ব্রাহ্মধর্মের মত ধর্মও, যেসব ধর্মের উদ্ভবের পেছনে ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের ভূমিকা- বৌদ্ধ, জৈন, শিখধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্রাহ্মধর্মকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বলতে চাই আমি। এসব ধর্ম কোনও প্রত্যাদেশ বা হিন্দুধর্মের মত মুনিঋষি, গ্রন্থমূলীয়ও নয়। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদেরই রয়েছে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও প্রত্যয়মালা এবং আইনকানুন যা থেকে গড়ে ওঠে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। তবে সকল ধর্মের অবদান মানবসমাজ ও জীবনে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারতের এখানে উল্লেখকৃত ধর্মগুলোর মধ্যে অবশ্যই শিখধর্ম মূলত ভিত্তিশীল তার ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহিবের উপর, যা নাকি প্রায়ই আবার সংকলিত নানকের দ্বারা হিন্দু-ইসলাম আদি ধর্মের গ্রন্থাবলী থেকে। বৌদ্ধধর্ম — যা বিশ্বের প্রধান পাঁচটি ধর্মের একটি, ভিত্তিশীল বুদ্ধবাণী, ত্রিপিটক, দিঘা নিকায় আদি গ্রন্থের শিক্ষার উপর। তবে, মওলানা আবুল কালাম আজাদ যেমন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'-এর ভূমিকায় লিখেছেন যে ধর্ম হলেই ঈশ্বর বা উপাস্য থাকা জরুরি, দর্শনে এর প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধধর্ম আসলে একটা দর্শন, এ কারণেই এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো কথা নেই; কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যরা এই দর্শনকে ধর্মে রূপান্তরিত করতে চাইলেন, তাই বুদ্ধকেই ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। মওলানা সাহেবের (তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী) এই অভিমতের কোনো প্রতিবাদ হয়েছিল বলে আমার জানা নেই, তাই তাঁর সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশেও বাধা থাকার কথা নয়। তবে ধর্ম হোক আর দর্শনই হোক, তাতে ঈশ্বরের কোনো স্থান আর না থাক, একথা তো মেনে নিতেই হবে যে বৌদ্ধমত ধর্ম হিসেবেই গৃহীত সমগ্র বিশ্বেই আর এ ধর্ম মানবসভ্যতা আর সংস্কৃতিতে এক বড় অবদান জুগিয়েছে। অধ্যাত্মবাদের আলোচনায়ও বৌদ্ধ চিন্তার উপস্থিতি অনিবার্য। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার প্রথম সাহিত্য তো সৃষ্টি করেছেন বৌদ্ধরাই আর তাঁরা ছিলেন সিদ্ধাচার্য-অধ্যাত্মসাধক। তারা শুধু দোহাই রচনা করেননি, গানও রচনা করেছিলেন, যা আমরা পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে। আমার তো মনে হয়, যেহেতু এই দোহা ও গানের নির্মাতাদের কেউ কেউ আমাদের এ অঞ্চলের অধিবাসীও ছিলেন। আর আমাদের ইতিহাসের উন্মেষকালে এখানেও একটি ছোটখাটো বৌদ্ধ উপনিবেশও স্থাপিত হয়েছিল, তাই হয়তবা বরাকের প্রথম লোকসংগীতটিও এইসব 'পা' উপাধিধারীদের কেউ দিয়েছিলেন উপহার। এখানেই হয়তবা বরাকের সঙ্গে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের তুলনা করে গাওয়া হয়েছিল 'ভবনে গহন গম্ভীর বেগে বাহী'।

২ : ১

স্মরণাতীত কাল থেকে সভ্যতার মুকুট শিরে নিয়ে অস্তিত্বশীল মহাদেশসদৃশ দেশ ভারতবর্ষে প্রব্রজন ঘটেছে কত বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর। পশ্চিমদিক থেকেই সবচেয়ে বেশি ঘটেছে প্রব্রজন যাদের মধ্যে শকহুনদল, পাঠান, মোগল, ইরানি, তুরানি, সেমেটিক তো বটেই, যাদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি ঘটেছে ভারতের। যাদের উল্লেখ ছাড়া ভারতসভ্যতার কোনো আলোচনাই সম্ভব নয়, সেই আর্যরাই এদেশকে দিয়েছে বেদ-উপনিষদ ভিত্তিক ধর্ম, দর্শন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর সংস্কৃতের মত ভাষা। তারাই প্রচলন করেছে কৃষিসভ্যতার। তারা অঞ্চলের পর অঞ্চল জয় করেছে। অনার্যদের পরাস্ত করেছে আর পাশাপাশি তাদের আচার-অনুষ্ঠান আত্মস্থ করে মিশ্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধন করেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। তারা পঞ্জাব থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা হয়ে আরো পূর্বদিকে যেরকম ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে প্রভাব বিস্তার করেছে দক্ষিণেও।

আর্যরা ছাড়াও আফ্রিকার নিগ্রেবটু, দক্ষিণের দ্রাবিড়, উত্তরের মোঙ্গল, ককেশীয়, উত্তর পূর্বের ভোটচৈনিক, ভোটবর্মী, দক্ষিণপূর্বের অস্ট্রিক মনখমের — কত দেশের কত মানুষ এসে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিস্তার করেছে তাদের কর্মধারা, যা থেকে জন্ম নিয়েছে বিচিত্র সংস্কৃতি। এই মানবসমাজের মধ্যে বিস্তারলাভ করেছে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা, বৌদ্ধধর্ম আর প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার আচরণের সঙ্গে মিশ্রণ ও

সমন্বয় ঘটেছে সংস্কৃতভাষাবাহিত আর্যচিন্তা। এভাবেই গড়ে উঠেছে উত্তরপূর্ব ভারতের অঙ্গ আসামের সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা। সমুদ্রতল থেকে উত্থিত দক্ষিণপূর্ববঙ্গের সম্প্রসারিত স্থলভাগটিতেই আছে আমাদের বর্তমান বরাকভূমি, যার করিমগঞ্জ অংশ দেশভাগ হওয়া পর্যন্ত মোগলের বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত আর তার ভূমিব্যবস্থা থেকে শুরু করে ভাষা ও সংস্কৃতিও ছিল বর্তমানের কাছাড় হাইলাকান্দি জেলাদ্বয়ের ভূমিব্যবস্থা ও ভাষা সংস্কৃতি থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। বলাবাহুল্য যে এ অঞ্চলের প্রাচীন জনবসতির মুখ্য অংশ ছিল অস্ট্রিক মনখমের গোষ্ঠীর এবং মঙ্গোল কাচারি, ভোটব্রহ্মী গোত্রের। আর্যসভ্যতার প্রভাবের নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত শ্রীহট্টের রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা ছিল সংস্কৃত। (ড. কামালুদ্দীন আহমদ: সংস্কৃতির রঙরূপ।) তাছাড়াও কাছাড়ের ভুবনতীর্থ, কপিলমুনির আশ্রম আদির মঠ মন্দিরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সংস্কৃত ভাষায় এই মঠ মন্দির সম্পর্কিত কথাগুলো। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার গভীর প্রভাব লক্ষিত হয় বরাক উপত্যকার ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায়। এখানে এ কথার উল্লেখও অপরিহার্য যে, হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে কত যে বিচিত্র মত-পথ ও সামাজিক রীতিনীতি মিলেমিশে একে এমন একটি মিশ্র চরিত্র দান করেছে, যার দরুন এই ধর্মের পরিচয় চিহ্নগুলো সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে সমরূপতা (homogenity) সেরকম স্পষ্ট হয়ে থাকেনি। এজন্যই শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি প্রধান কয়েকটি ধারা ছাড়াও আরো অসংখ্য ধারা-উপধারায় প্রবাহিত হয়ে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম ও তার প্রভাবে ওঠা সংস্কৃতি গোটা ভারতকে প্লাবিত ভক্তি অঙ্গের সংগীতে। যেমন:

ভক্তিসুফি:

শিতালং শাহর পদ :

দূতী গো আমার
প্রেমরসে ভাবচিত্তে না হইল শৃঙ্গার

সুরুজ আলী :

বন্ধু রসরাজ কালিয়া
মম কুঞ্জে আওরে বন্ধু কলঙ্কী জানিয়া।

(ড. কামালুদ্দীন আহমদ-এর 'সংস্কৃতির রঙরূপ' থেকে গৃহীত)

সূফি-ভক্তি:

খোদ খোদা, আল্লা রাধা
মনোমোহন দুস্ত মোহাম্মদ—
অজ্জদে মওজুদ সাঁই, দমে কিয়ামত

একই গানে ভক্তিসূফি (গুরু-মুরশিদ) অনুষঙ্গ :

অধীন হক আলীর পদ:

গুরুর বচন কইলাম সাধন
ভুইলো নারে মন।
সাধন করিলে পাইবায়
রূপের দরশন রে।।
... ...
আর অধীন হক আলীয়ে বলইন
মুরশিদের ঠাঁই-
ভাব বিনে লাভ নাই
আল্লার দরশন রে।।

আরেকটি মিশ্র গান: অধীন এক্রাম আলী :

নয়ান ফিরাও রূপ দেখি — বা দয়াল বন্ধু
নয়ান ফিরাও রূপ দেখি।
অধীন এক্রামে বলে,
মমরাজা ওরে :
খেওয়া ঘাট চিনিয়া করিয়ো পার —
আমার ঠাকুর জগন্নাথ।।

এখানে উল্লেখ্য যে, সুফিবাদের সূত্রে ইসলাম বাইরে থেকে যা কিছু নিয়েছে, তার মধ্যে গুরুবাদ বিশেষ উল্লেখ্য। ইসলামে গুরুবাদ ছিল না, এটা ইরান ও ভারতের দান। ইরানে গুরুকে 'পির' বা 'পির-ই মগাঁ' বলা হয়। গুরু পির-ই মগাঁকে কীভাবে মানতে হবে, তার নিদান দিয়ে সুফি কবি হাফিজ বলেছেন : (ফারসি শায়ের এর বঙ্গানুবাদ নজরুলের)

জায়নামাজে (নামাজ পড়ার জায়গা) সারাব রঙীন করো গুরু বলেন যদি
পথ যে চলেন, তিনিই শুধু জানেন পথের অন্ত আদি।

এই পির-ই মগা বা গুরুকে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করে পাওয়া গেছে মুর্শিদ। এই মুর্শিদ বা মুরশিদকে ভাগ করে নিয়েছেন বাংলায়, অতএব বরাকের হিন্দু মুসলিম উভয়ে নিজেদের মধ্যে। হিন্দু গায়ক শিল্পী সাধকের গানে যেরকম অনায়াসে মুর্শিদের কথা আসে তেমনি মুসলমানের গানে আসে গুরুর বচনের কথা। আর একই ব্যক্তির উভয় ধর্মের স্মরণীয় ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি হাছন রাজার গানে, যেমন ড. শিবতপন বসু লিখেছেন, 'হাছন রাজার গানে বরাক উপত্যকার মানুষ পরম প্রার্থিতকে খুঁজে বেড়ান কখনো আল্লা, কখনো শ্রীহরি, কখনো মুর্শিদে :

ওবা মুর্শিদি আল্লাজি
আমারে বাসাইলাম বা আল্লা
ভবসিন্ধু নীরে।

তার এ প্রবণতা যেন সবাইকে গ্রাস করে নেওয়া, সবার সঙ্গে আপন হয়ে যাওয়া। ওই প্রাণতার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা আছে, তা-ও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আবার একথাও স্বীকার করতে হবে যে আচারনিষ্ঠ হিন্দুরা তাঁদের সমাজবন্ধনকে এমনভাবে টিকিয়ে রেখেছেন যে, রাষ্ট্র রাজনীতি উত্থান-পতনের হাজারো পরিবর্তনেও হিন্দুত্বকে ধরে রাখে তাই।

২ : ২

ইসলামকে ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন সংগঠিত (organised) ধর্ম- তার সবকিছু সুবিন্যস্ত, সুনির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? না, হিন্দুত্বের মত সর্বগ্রাসী ও সর্বগ্রাহী না হলেও আর তার ইবাদত বন্দেগি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও প্রত্যয় কোরআন ও সুন্নাতের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কালক্রমে এই ব্যবস্থা সেরকম টিকে থাকেনি, নানা মত, নানা পথ, ফের্কা, মসলগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইসলামকে দিয়েছে একধরনের বহুত্ববাদী চরিত্র; আবার আরব থেকে বেরিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, তথা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে এমন একটি সহনশীল চরিত্র অর্জন করে নিয়েছে যে আজকের পরিভাষায় তাকে পরমতসহনশীল বহুত্ববাদ (pluralism) বলতে পারি। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন, তবে এ পরিসরে তা সম্ভব নয়। এভাবেই ইসলাম তার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য কোরআন সুন্নাহ থেকে মৌলিকভাবে আহরণ করলেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মানুষের কাছ থেকেও কম গ্রহণ করেনি। গ্রহণ করতে করতে ইকবালের ভাষায় 'তমদ্দুন, তাসাউউক,

শরিয়ত, কালাম/বুতানে আজম কে পূজারী তামাম' অর্থাৎ সভ্যতা, আধ্যাত্মিকতা, সুফিবাদী, শাস্ত্র বা শরিয়ত, প্রত্যয় বিজ্ঞান- এসবই বিজাতীয় উপাস্যের পূজারী। বিষয়টি কত সত্য, তা ইসলামে পির প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করে ইসলামি তমদ্দুন বিষয়ক একটি উর্দুগ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে যে, পির সাহেবদের ক্ষমতা বাড়াতে বাড়াতে এতটুকু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লার জন্য যেন আর কিছুই রাখা হয় নি। এ প্রসঙ্গের উপসংহারে এটুকুই বলব যে, মুসলিম লোকসংস্কৃতির শুরু এখান থেকেই আর শেষও এখানেই।

৩.

রাজা বাদশাহরা যুদ্ধ করেছেন, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব, উত্তর থেকে দক্ষিণের অনেক অঞ্চলে। সংঘাত সংঘর্ষের ফলে শত্রুতার পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে হিন্দু-মুসলমানে, আবার সমন্বয়ের পথেও হেঁটেছেন অনেকেই। সে আরেক ইতিহাস। ধর্ম প্রচারে রাজা বাদশাহদের ভূমিকা তত উল্লেখযোগ্য নয়, উজ্জ্বলও নয়। এ কাজ করেছেন সুফি সন্তরা আর আলেম উলামারা। যে সুফিবাদ নিয়ে সংস্কারকরা নানা কঠোর মন্তব্য করেছেন, যেমন উপরে উল্লেখ করেছি, সেই সুফিবাদীরাই জয় করেছেন মানুষের মন। তাঁদের নির্মল চরিত্র, ইসলামের সাম্য ও মানবতাবাদী ব্যবহারের দ্বারা, তাদের প্রভাবেই ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করেছে ভারতের সর্বত্র। বরাক উপত্যকায়ও সিলেটবিজয়ী হজরত শাহজালাল মুজাররদের প্রভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ইসলাম। তাঁর আগমন গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূত্রে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি শুধু ধর্মান্তরিত মুসলমানদের শ্রদ্ধেয় হননি, হিন্দুরাও সমানভাবেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁর শিষ্যদের প্রতিও। আর এখনো তাঁর দরগাহ সর্বধর্মের মানুষের ভক্তির স্থল। এই সূত্রেই, শিবতপন বসু যেমন বলেছেন 'শ্রীভূমির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল' সিলেট-কাছাড়, পূর্বের সুরমা উপত্যকা, দক্ষিণবঙ্গের বাংলাভাষী হিন্দু-মুসলমানের বসতিস্থল দক্ষিণবঙ্গের এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ভক্তিসুফি ভাবধারা। ১৩০৩-এ শাহজালাল আসেন, তাঁর প্রায় দুশো বছর পরে (১৫০৯ খ্রিঃ) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদের বন্যাধারা আছড়ে পড়ে তাঁরই পিতৃপুরুষের এই অঞ্চলেও। গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায় সুফিবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্যে। সুফিবাদে এভাবেই আরো বিভিন্ন স্থানীয় ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে। সত্যিকথা বললে ভূমধ্যসাগরের পার থেকে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত অধ্যাত্মিক ভাবধারার উদ্ভব ঘটেছে, সেসবের কিছু না কিছু গ্রহণ করেছে সুফিবাদ ও আর অন্যরাও নিয়েছেন সুফিবাদ থেকে। মধ্যযুগের ভারতের ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রেরণাতে ছিল সুফিবাদই। এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণের প্রভাবে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছে, ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে, সংস্কৃতির ঐতিহ্যবিস্তার ঘটেছে। সিলেটে তো একটি নতুন ভাষাই গড়ে উঠেছিল- সিলেটি নাগরি, এই সমন্বয় সংমিশ্রণের সূত্রেই।

বরাক উপত্যকার লোকসংগীতে অধ্যাত্মবাদ ও তাতে সম্প্রীতি চেতনার প্রেক্ষাপট নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় আলোচিত এই পরিপ্রেক্ষিতে।

আমাদের আঞ্চলিক বাংলাকে বাহন করে, যে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে আরবি-ফারসির মিশ্রণে একটি নতুন রূপ ধারণ করে নেয়, যার মধ্যে সুফিবাদের পরিভাষা আর ভক্তিবাদী পরিভাষা সমন্বিত হয়ে হরিহর আত্মা হয়ে যায়। যত প্রমাণ মেলে সিলেট বরাকের সুফি গানে। এই গান থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহকে ও মুর্শিদ বলেছেন হাছন রাজা। আমরা কান পেতে বরাকের ভক্তিমূলক লোকসংগীত শুনলে বুঝতে পারব যে, মুর্শিদ গুরু যিনিই হোন সাধকের সাধন পথ প্রদর্শক, তিনি বহুরূপী, তিনি এমনকী সর্প হইয়া দংশেন, ওঝা হইয়া ঝাড়েন, আবার রমণীর রূপ লইয়া পুরুষের মন হরেন।

বরাকের লোকসংগীতে অধ্যাত্মবাদে সম্প্রীতি চেতনার প্রেক্ষাপটকে বিস্তারিত করতে গেলে সাধন ভজনে মানবদেহের স্থান, যা নিয়ে বিশেষভাবে বলতে হয় বাউল পন্থা ও বাউল বা বাউলা গানের কথা যার উপস্থিতি ব্যাপকভাবে আছে হিন্দু-মুসলমান সবার গানে ও সাধনায়। লালন ফকির এই ভাবধারার যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাঁর গানে, তাতে আবার সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে বলার পরেও হিন্দু-মুসলমান সকল জাতই

পেয়েছে সহাবস্থান। যেমন একটি গানে :

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখানা
ডুবলে পরে রতন পাবে ভাসলে পরে পাবে না।

অন্য গানে:

মন আমার কী ছার গৌরব করছ ভবে...
থাকতে হাওয়া হাওয়াখানা
মওলা বলে ডাক রসনা
মহাকাল বসেছে রানায়
কখন জানি কু ঘটাবে।

অন্য গানে :

জগৎ জোড়া মীন-অবতার
মন আছে ছন্দির উপর
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার
সন্নাসীকে চিনলে না।

আরেকটি গানে :

এমন দিন কি হবে রে আর
খোদা সেই কবে গেল রসুল রূপে অবতার।

এই গানটিতে ইসলামি ভাবধারা ফুটে উঠেছে অতি সুন্দরভাবে। তবে সমস্ত গানটি উদ্ধার করার সুযোগ নেই এখানে।

বরাক উপত্যকার বাউল গানের কিছু নমুনা —

১. চাইর চিজে পিঞ্জিরা বানাই মোরে করলায় বন্ধ।
রে বন্ধু নির্ধনীয়ার ধন
কেমনে পাইমুরে কালা, তোর দরশন
... ...
তুমি আমি আমি তুমি, জানিয়াছি মনে
বীচিতে জন্মিয়া গাছ বীচি ধরে কেনে।
এক হইতে দুই হইল প্রেমেরি ফলে
সে অবধি আশিকের দিলে করে উচাটন। — আরকুমশাহ

২. ... আর অপরূপ সে বাজারে —
সোনার মউরে পেখম ধরে গো
হস্তীবাঘে খেলা করে
শব্দ উড়ে আদমপুর।।
... ...
রূপের ঘরে আজব লীলা
চান্দের মাঝে বন্ধের খেলা গো
এগো, যে দেখিছে রাজা হইছে —
মৃত্যু নাই তার জগৎপুর। ... — শীতালংশাহ

লক্ষ্য করার বিষয় যে এই উদ্ধৃত অংশগুলোতে ব্যবহৃত নির্ভেজাল সান্ধ্যভাষা; আর সত্যি কথা বলতে

গেলে ভক্তিতত্ত্ব হোক, সুফিতত্ত্ব হোক, মারিফতি কিংবা মুর্শিদা অথবা বাউল-ভাটিয়ালিই হোক বরাকের অধ্যাত্মিকভাবের গানে ভাষার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। প্রকাশভঙ্গিও প্রায়ই একরকম। অধ্যাত্মচেতনা ও অধ্যাত্ম রহস্যজ্ঞানের জটিলতা প্রকাশের জন্য কিছু সাধারণ প্রতীক — যেমন অকুল-দরিয়া', 'ভবসিন্ধু', পাপের দরিয়া, গুরু ও মুর্শিদ আর প্রেমাস্পদ অথবা সাধনার বস্তুকে নানাভাবে সম্বোধন করা — যে সম্বোধন আরো অনেককিছুর ব্যঞ্জনাবহ। শুয়াপাখি, মনিয়া বা মুইনা আদি পাখি, যা বাউলেও ব্যবহার করেন, বৈষ্ণবেও যেমন শুকসারি, সুফিসাধকেও আবার দেখা যায় নাথপন্থীরাও করেন। বিশেষভাবে মুইনা বা মুনিয়া আমার মনে হয় ওদের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছে। আরো ভাল করে লক্ষ্য করলে মনে হবে যে, সিলেট-বরাকের লোকসংগীত, বিশেষত অধ্যাত্মভাবের গানগুলো যেন হিন্দু-মুসলমান, বাউল-বৈষ্ণব, সুফি-ভক্তিবাদী সবার একটা যৌথ ইচ্ছের প্রকাশে এবং যৌথ প্রয়াসের ফসল, যে প্রয়াস অত্যন্ত আন্তরিক, পবিত্র এবং সুফলদায়ী। এই ব্যাপারটা আবার যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে, আর তার পেছনেও আরেকটা কারণ আছে। সে কারণটি এই যে, (১) ভক্তি-সুফি আন্দোলন, হজরত শাহজালাল ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একজনের একটু আগে আর অন্যজনের একটু পরে আবির্ভাব (সশরীরে না হলেও প্রভাবের মাধ্যমে) ভারতের মূল ভূখণ্ডের ভক্তিবাদী আন্দোলনের জোয়ারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব এখানেও তার জ্যোতি বিক্ষেপ করেছিল, যা সুফিবাদী ও ভক্তিবাদী সন্ত-সাধুরা বয়ে এনে তাঁদের শিষ্যদের তাতে করেছিলেন দীক্ষিত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে; (২) সাধক কবি-শিল্পীদের প্রায় সবাই একই ধরনের অধ্যাত্মিক তত্ত্ব, সাধনপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গির অনুসরণ করেছেন। ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের আদান-প্রদানের কথা উপরে বলা হয়েছে। সুফি সাধনার জন্য মনের কালিমা দূর করা ও দেহের মধ্যে যে শক্তি ও আলোক কেন্দ্রগুলো আছে বলে তারা মনে করেন, যে কেন্দ্রগুলোকে জাগাতে পারলে আল্লাহকে পাওয়া যায়, তার নূর বা আলোকে আলোকিত হওয়া যায়, তার সঙ্গে আছে যোগশাস্ত্র, বিশেষত নাথ সম্প্রদায়ের হঠযোগ শাস্ত্রে যে বিভিন্ন দল-চক্রের অবস্থান ও সেগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারলে অমরত্ব লাভ হয় বলে বিশ্বাস, তার সঙ্গে গভীর সাযুজ্য আছে। সুফিরা বলেন লতিফা — দশলতিফা, নাথযোগীরা বলেন দ্বার, চক্র, দল ইত্যাদি, তাদের এইসব সুফিদের লতিফার থেকে কয়েকগুণ বেশি। (৩) প্রাকৃতিক পরিবেশ — পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা, বন্যা-খরা — এসবের প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচকভাবে সবাই গ্রহণ করেন সমভাবে, সুখদুঃখও সমভাবে ভাগ করে নেন। (৪) জীবন-জীবিকার অবস্থা ও সবার একই রকম, বিশেষভাবে একথাটা মনে রাখতে হবে যে নবদীক্ষিত মুসলমানরা সমাজের নিম্নশ্রেণি থেকে এসেছেন মুখ্যত, তাদের জীবনে আগেও সুখ ছিল না, ধর্মান্তরের পরেও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। হিন্দুরাও অর্থাৎ সাধারণ হিন্দু, যারা ওইসব গান রচনা করেছেন, তাদের অবস্থা তেমন আহামরি গোছের ছিল না। এসব নানা কারণেই আমরা পেয়েছি একটা যৌথ চেতনার প্রকাশমূলক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, যার জন্য আমরা গর্ব করতে পারি আর যাকে লালন করা আমাদের কর্তব্য।

এই নিবন্ধ রচনায় যেসব বইপত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১. A. H. Mazumder, Bhakti-Sufi Movement in Mediavel Barak Valley: A Seminar Paper presented at National Srihatta Sammilani, Delhi, 1992.

২. উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, অমলেন্দু ভট্টাচার্য ও সঞ্জীব দেবলস্কর কর্তৃক সম্পাদিত ও পারুল প্রকাশনী কর্তৃক (আগরতলা) পুনঃ প্রকাশিত, ২০০৬।

৩. ড. কামালুদ্দীন আহমদ, সংস্কৃতির রঙরূপ, সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ ইউ কে, সাউথ ইলফ্রেড, ২০০৪।

৪. গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক, শ্রীহট্টের লোকসংগীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।

৫. ড. শিবতপন বসু, বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি, ২০০১, বদরপুর।

৬. শ্রী নৃপেন্দ্র নাথচৌধুরী, হাড়মালা, লালা, ১৯৭১।

অথ বাঘ-মানব প্রসঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের লোককথা :

সুবীর কর

উত্তরপূর্ব ভারতের তিবৃত-বর্মী উপজাতি বা আদিবাসীরা মূলত ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উত্তরপুরুষ। খাসিরা জাতিগত পরিচয়ে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড হলেও ভাষিক পরিচয়ে মন্‌্খমর (অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক)। সার্বিকভাবেই এই ভূখন্ডের আদিবাসীদের লোকজীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি মিশ্র উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও তাদের মধ্যে অন্তর্লীন এক যোগসূত্র রয়েছে। উনিশ শতকে কোম্পানি আমলের শাসনকাল থেকে ক্রমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ফলে তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও কিছু কিছু জনগোষ্ঠী তাদের আদিম বিশ্বাস, লোকাচার ও সংস্কার নিয়ে আজও চলমান।

তাদের ধর্ম, অনুশাসন, রীতিনীতি ও বিশ্বাস এবং এ ক্ষেত্রে তাদের সামগ্রিক অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করে E.A.Gait জানান যে,

> The religious beliefs of the hill tribes of this frontier is the extraordinary uniformity of principle which underlies them all, and which they share in common not only each other and with the north Turanian tribes, but also with the Dravidians of Southern India. There can be greater mistake than to assume that each tribe has its own individual beliefs, differing widely from those of others and circumscribed by the narrow tribal limits. The facts are quite the reverse, and the religion of these tribes-- Shamanism, Animism, Nat worship, or whatever name may be applied to it --is everywhere practically the same. There are differences, it is true, but they are differences of practice or detail rather than of fundamental principles, and are far less important than those which divide the Saktas from the Vaishnavas, or Unitarians from the members of the Salvation Army.
>
> The Animist population of Assam is 969,765, or17.70 percent of the total number of inhabitants... The largest portion of NAT worshippers is in North Lushai and the Naga Hills, where it amounts to over 95 percent. of the total population. The Khasi Jaintia Hills (present Meghalaya) follow closely with with 93 percent. Next come North Cachar, where the conversion of Kacharies to Hinduism has brought the number of Animistics down to 56 percent. In the plains districts, the proportion is highest in Nowgong, also considerable in Darrang, Goalpara, and Kamrup. In the other districts the numbers are very small... the spread of education and the influence of Hinduism

> is yearly reducing the number of persons who still cling to the superstitions of their forefathers, and it seems prabable that in time demon worship as a form of religion will disappear from the province.[১]

উত্তরপূর্ব ভারতের এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যবাহী লোককথা কিংবা লোকধর্ম ও সংস্কৃতির বৈভব বৈচিত্র্যগুলি সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে বা প্রয়োজনে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়ে ক্রমে তা স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এগুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাধা যেমন দুস্তর, তার অবশেষ যেখানে ক্ষীণ আশ্রয়ে প্রিয়মান, সে অঞ্চলও দুরধিগম্য। ব্রিটিশ উপনিবেশিক আমলে গ্রিয়ার্সন, জি.এইচ, ডামন্ট, ডালটন, এলুইন, গডউইন অস্টিন, এ. ডব্লিউ. ডেভিস, এ. জে. মোফাট মিল, ই. এ. গেইট প্রমুখ ইউরোপীয় প্রশাসক এবং নৃতত্ত্ববিদদের প্রচেষ্টায় উত্তরপূর্বের উপজাতি বা আদিবাসীদের লোকজীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারত সহ বিশ্বের পরিচয় ঘটে। স্বাধীনোত্তরকালে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার নির্মাণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকারের প্রশ্নে সমগ্র অঞ্চলজুড়ে গরিমাময় অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও তার ব্যাপক চর্চা দেখা দেয়। এরই সূত্র ধরে লোককথার বৈচিত্র্যময় ভান্ডারটির কিছু কিছু সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গড়ে ওঠে এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গবেষণার কাজও শুরু হয়। এ সব নিয়ে যা কিছু আলোচনা বা প্রকাশনা তা প্রধানত ইংরেজিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে হিন্দি ভাষায়ও প্রচুর লেখালেখি চলছে। কিন্তু কেবলমাত্র ত্রিপুরা ছাড়া বাংলায় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজ চোখে পড়েনি।

আর্যদের সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি বা জনজাতি গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক কিংবা সাংস্কৃতিক ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু এই ভিন্নতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক সহবাসের ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে এমনকী কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিগঠন প্রক্রিয়ার ফলে এক বৈচিত্র্যময় মিশ্র উপাদান সমন্বিত সংস্কার ও বিশ্বাসের জগৎ গড়ে ওঠেছে। আর এই জগৎটিকে সমৃদ্ধ করেছে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব। যার পরিচয় সমতলবাসী জাতিগোষ্ঠীর লোকজীবন ধারায় স্পষ্টতই ধরা পড়ে।

লোককথাপ্রসঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে উপজাতিয়দের মধ্যে প্রচলিত লোককথায় জীবজন্তু, পাহাড়-পর্বত, সৃষ্টি ও ফসলের উদ্ভব সংক্রান্ত কাহিনির মত পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনি সম্পর্কিত কথা তেমন গুরুত্ব পায়নি।

পবিত্র বাঘের পিঠে সমাসীন অসংখ্য দেবদেবীর পূজালাভের ইতিহাসটিও সুপ্রাচীনকালের। ভারতীয় প্রাগার্য সমাজে বাঘপূজার প্রচলনের সাক্ষী মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত ব্যাঘ্রাকৃতির মূর্তিগুলির পাশে শিবলিঙ্গের অবস্থান। প্রাক্-আর্য বা অন্-আর্যসমাজে ব্যাঘ্রচর্মাসীন বাঘাম্বর বা কৃত্তিবাস শিবের আরাধিত মূর্তির ব্যাপক প্রসার ছিল। আমরা জানি যে প্রাক্-কৃষি সভ্যতায় বাঘই ছিল শিবের বাহন, এরপর কৃষিভিত্তিক সমাজে গো-পূজার প্রচলন ঘটলে শিব দেখা দিলেন বৃষভ-বাহন হয়ে। পন্ডিতদের অভিমত যে, আদি মানব সমাজের বাঘপূজা পরবর্তীকালে শৈবধমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

বাঘ নিয়ে নীতিকথা, লোককথা, সংস্কার, তার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন, টোটেম বিশ্বাস, ছড়া, প্রবচন ইত্যাদির ব্যাপক বিস্তার এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। ভারতের পুরাণ, উপপুরাণেও নানা প্রসঙ্গে বাঘের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মহাভারতকথায় দেখা যায় যে, জটাজিনধারী ব্যাঘ্র বা মৃগচর্ম পরিহিত কৃত্রিম সাধুবেশ ধারণ করে চরবৃত্তিতে লোক নিয়োগ করা হত।[২]

দিগ্বিজয়ের পর পান্ডুর বল ও ঐশ্বর্যের কথা শুনে ঈর্ষান্বিত ধৃতরাষ্ট্রকে মন্ত্রী কর্ণিক ধূর্ত কূটনীতির পাঠ প্রদান করে যে কাহিনি শুনিয়েছিল তাতে এক শৃগাল (বুদ্ধিজীবী) সহ চার বন্ধু মিলে এক হরিণ শিকারের পর কীভাবে শৃগালবৃত্তির জয় হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। এই কাহিনিতে বাঘের কথাও উল্লিখিত আছে।

অমরাবতী গমনকালে কামচারী নগরে কালকঞ্জাদি দানব নিধনে অর্জুন যে পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন তা থেকে সিংহ, ভল্লুক, মহিষ, বৃষভ, বরাহ, অশ্ব, গজমুখ, গন্ধর্ব, পিশাচ ও যক্ষের সঙ্গে বাঘও নির্গত হয়েছিল।[৩]

কর্ণার্জুন যুদ্ধে অন্তরীক্ষে যখন প্রাণীদের মধ্যে পক্ষপাত নিয়ে মহাগোলোযোগ উপস্থিত হল তখন আকাশমন্ডল সূতপুত্রের আর ভূমন্ডল অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করে। বৃক, শশ, ও অন্যান্য মঙ্গলজনক পশু-পক্ষীরা পার্থের পক্ষে যোগদান করে।[৪]

দেবগণ যখন কার্তিকেয়ের সভাসদ নিয়োগ করেন তখন সেই সভায় ব্রহ্মা প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয় যোগাসক্ত যেসব বালক, বৃদ্ধ ও যুবা পারিষদগণ কুমারের নিকট উপস্থিত হন তারা বৃষ, কুর্ম, সিংহ, শাদ্দুল, দ্বীপী (ব্যাঘ্র) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর মুখোশ পরিধান করে এসেছিলেন। তারা ছিলেন 'চর্মকৃত' ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। তাছাড়া উল্লেখ করার মত বিষয় যে— "উহারা সকলেই দেশভাষায় (মাতৃভাষা) কথোপকথন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল।"[৫]

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মিকির (কার্বি), কাছাড়ি, গারো, নাগা প্রভৃতি কোন কোন কিরাত জনগোষ্ঠীর লোককথার 'মোটিফ' প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করে লেখেন,— 'There are some *motifs* which we find in common with Aryan folk-lore, and Austric folk-lore also' এই আলোচনায় তিনি কার্বি লোককথা 'হারতা-কুনওয়ার', কাছাড়ি 'বণিক শিশু', গারো কাহিনি 'গুণাই ও তার স্ত্রী', 'পক্ষী-কুমারী সিঙ্গুইল', আঙ্গামি নাগাদের লোককথা- 'জেশু কিভাবে তার স্ত্রীর জন্য দেবী লাভ করেছিল' এগুলির মোটিফ নিয়ে বিচার করে এই বলে পরামর্শ দেন যে, — 'The study of Kirata myth and legend and folk-lore and folk-tales as well as poetry on the lines of Verrier Elwin's study of Central Indian (Dravidian and Kol) myth and legend, cults and tales should be continued, for the Indo-Mongoloid speaches and peoples, to find their proper place in the evolutions of Hindu myth, legend and cults.'[৬]

লোকঐতিহ্যে বাঘ ও লোককথায় বাঘ-মানব ও বাঘ-মানবী প্রসঙ্গে এই ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই আদি-মঙ্গোলীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের বিবর্তিত নানারূপের সন্ধান লাভ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে মিজোদের মধ্যে প্রচলিত 'চাং-শিলি ও কলপুই'র কথাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লোককথায় মহাভারতে বর্ণিত ভীমের বকরাক্ষসবধ কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব চিনের লোকজীবন ও সংস্কৃতিতে বাঘের মর্যাদা সুপ্রাচীনকাল থেকেই নানা দ্যুতিময় স্বরূপে উদ্ভাসিত। লোকবিশ্বাস যে, সাদা বাঘ পশ্চিমদেশের শাসক। শরৎকালে সে যখন পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামে তখন তাকে নক্ষত্রপুঞ্জে কালপুরুষের প্রতিনিধিরূপে দেখা দেয়। এভাবে বাঘ হয়ে যায় শরতের প্রতীক। চিনদেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রে রহস্যময় আকাশের ভালুকরূপী নক্ষত্রপুঞ্জ হল প্রথম বাঘের জন্মদাতা। তার শিকারের ভঙ্গি ও ছন্দ, ভয়ঙ্কর-সৌন্দর্য ও বাঘিনীর সঙ্গে রমণক্রীড়া-কুশলতা নিয়ে এক বিস্ময়কর সৃষ্টিরূপেই সে মানবের সম্মোহিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে দেবতা কিংবা পশুদের রাজা বলে সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত। — "... all tigers bear the Chinese character for king in the tripes on their brow. This look like an "H" turned on its side with an extra line through the middle..... [they] imbue the tiger with all sorts of fantastical magical powers, particularly in the realm of Traditional Chinese Medicine (TCM)." চিনীয় সংস্কৃতিতে বাঘের অধিষ্ঠান প্রায় ৭০০০ হাজার বছর কাল আগের। সবচেয়ে পুরনো যে বাঘের মূর্তিটি সে দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে তা নিয়োলিথিক যুগের। চিনের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নানা প্রতীকে এই বাঘ চিত্রিত। সাদাবাঘ হল দক্ষিণের দেবতা, পৃথিবী ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতীক। নীল বাঘ পুবের দেবতা ও উর্বরাশক্তির প্রতীক। লালবর্ণের বাঘ হল অগ্নি ও দক্ষিণের প্রতীক। কালো বাঘ শীত ও উত্তরের আর হলুদ বাঘ পৃথিবীর কেন্দ্র ও সূর্যের প্রতীক। দেবতা চাং তাও-লিং-এর বাহন হল বাঘ। তিনি সম্পদ ও জুয়াড়ির কল্যাণসাধক।[৭] ব্যাঘ্রবাহিনী হলেন বায়ুর দেবী। রাজকন্যা মিয়াও-শান্ শহিদত্ব বরণ করে বাঘের পিঠে চড়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন।'

পুনর্জন্মের পর মিয়াও-শান্ কুয়াও-ইং রূপে জন্ম নেয়। খ্রিস্টপূর্ব ২৫৮৭ সালের ঐতিহ্যবাহী সুবর্ণযুগের একাদশ বর্ষে মিয়াও-তুহাং ছিলেন রাজা। তার তিন কন্যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল মিয়াও-শাং। রাজার কোন পুত্র

সন্তান না থাকায় তিনি তার উত্তরাধিকারী ঠিক করতে মেয়েদের বিয়ের উদ্যোগ নেন। মিয়াও তার বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে নির্জনে আত্মশুদ্ধির পথে বোধিত্ব লাভের বাসনায় ঘর পরিত্যাগ করে 'সাদা চড়ুইর মঠ'-এ গিয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা তাকে সস্নেহে এই সাধনার পথ থেকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে ক্রোধে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতন শুরু করেন এমন কি বৌদ্ধমঠেও আগুন ধরিয়ে দেন। এরপরও মেয়েকে বশে আনতে না পেরে তার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। যখন রাজাদেশ পালনের জন্য ঘাতক তাকে হত্যায় উদ্যত হয় সেই মুহূর্তে নেমে আসে প্রলয়ংকরী ঝড় আর আকাশের বজ্রালোক তার চারপাশে গড়ে তুলে নিরাপত্তার বলয়। সে সময় পাহাড় থেকে নেমে আসে এক বাঘ আর মিয়াওকে পিঠে নিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। চেতনা ফিরলে পর সে নিজেকে আবিষ্কার করল যমপুরীর নরকে। মুহূর্তে নিজেকে জাদুবলে মুক্ত করে সে ফিরে আসে। যমলোক থেকে ফেরার পথে আকাশে মেঘের কোলে আবির্ভূত হয়ে ভগবান বুদ্ধ তাকে আদেশ দিলেন যে, সে স্থান থেকে তিনহাজার মাইল দূরবর্তী পু-তো নামক দ্বীপে যেয়ে সাধন করতে। পুনরায় বাঘ-দেবতা তাকে বহন করে সেই দ্বীপে নিয়ে যান। অন্য এক কাহিনিতে বলা হয়েছে জলে ভাসমান পদ্মের উপর আসীন হয়ে মিয়াও-শাং সেখানে উপনীত হয়েছিলেন।

প্রায় ন'বছর কঠোর তপস্যা করে তিনি তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধিলাভ করেন। সে সময় সাগরের ড্রাগন রাজার তৃতীয় পুত্র আনমনে একটি মাছের রূপ ধারণ করে ঢেউয়ের মাঝে খেলা করে চলেছিল। এক জেলে হঠাৎ তাকে জালে পুরে বাজারে নিয়ে এল বিক্রি করতে। মিয়াও-শাং তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে রাজপুত্রের এই দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তাকে উদ্ধার করেন। ড্রাগন-রাজ করুণাময়ী সাধিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার পৌত্রী লুং-নুকে দিয়ে একটি মুক্তা পাঠিয়ে দিলেন যাতে তার আলোয় মিয়াও-শাং রাতের অন্ধকারে বৌদ্ধ-সূত্র পাঠ করতে পারেন। মিয়াও-এর সংস্পর্শে লুং-নু এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে দীক্ষা গ্রহণ করে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। ক্রমে লুং-নুর মা-বাবাও মিয়াও-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে মানবজাতির ত্রাতারূপে কাঙ্ক্ষিত অমিতাভ স্বর্গ লাভ করে ধন্য হন।

হ্যারাল ও ইয়াংজিয়াং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, চিনের কানমিং-এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাঘপূজার প্রচলন আজও বর্তমান। ই-য়েই, চু-জিয়াং প্রভৃতি স্থানে একটি বিশেষ পূজাস্থলে পর্যকটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে প্রায় পাঁচ মিটার উচ্চতার সুপ্রাচীন একটি সৌরগণনার বর্গক্ষেত্র রয়েছে যার কেন্দ্রে মুখ ব্যাদান করে বসে আছে এক বিশাল বাঘের মূর্তি। তাছাড়া 'A tiger totem is presented for tourists; the totem portrays the Yi of the tiger setting the entire world in motion.'[৮]

চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অজস্র খন্ড বিখন্ড মূর্তির টুকরো তুলে নিয়ে লোকেরা তা গায়ের অলঙ্কার করে পরে থাকে এই বিশ্বাসে যে পূজ্য বাঘের আশীর্বাদে তার সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধিত হবে এবং তার মত বীর্যবান হবে। পশ্চিমের ই-সি ওয়াং মু অঞ্চলে রাজমাতাদেবীর মূর্তিটির আকৃতি বাঘের মত এবং লেজ বিশিষ্ট। সু-ওয়াংবাই প্রদেশে বাঘ-নৃত্যের মধ্য দিয়ে ই-য়েই রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের বাঘপূজার তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে বাঘ, ড্রাগন, পৌরাণিক পাখি (ফিনিক্স) ও ব্যাঙ এই চার প্রাণী চিনদেশের সংস্কৃতিতে প্রবহমান। তাদের লোককথায় বর্ণিত বিশ্বাস যে, বাঘ-বছরে জন্ম হলে সন্তান সাহসী, বলবান, ধৈর্যশীল ও দয়াবান হয়। বাঘ সদয় হলে আগুন, চোর ও প্রেত এই তিনের ভয় ও বিপদ থেকে মুক্তি লাভ ঘটে। প্রবাদ, প্রবচন ও গীতগুলিতে বলা হয় যে, বাঘের গর্জন আর ড্রাগনের গান পৃথিবীতে শান্তি আনে। পাহাড় ও উপত্যকা থেকে যখন মানুষের আহ্বান বা কণ্ঠস্বরের উত্তর আসে তখন দেশ শক্তিশালী হয় ও জনজীবনে সমৃদ্ধি নেমে আসে।

কোরীয় সভ্যতার ডাগুন্ সিংহুয়ার যুগ থেকে বাঘ সে দেশের লোকসংস্কৃতিতে এক বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এই বাঘ ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতীক- guardian spirit। সৃষ্টির সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক নিয়ে অসংখ্য মিথ সে দেশেও প্রচলিত রয়েছে। কোরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের লোককথায় সাদাবাঘ পবিত্র দেবতার বেশে সীমান্তের প্রহরীরূপে কল্পিত। এই দেবতাই তার অলৌকিক ক্ষমতার বলে পৃথিবীর রঙকে সাদা করে দিয়েছেন। এই বাঘ-

দেবতা কল্যাণময় কিছু যদি কোন শাসক কিংবা কোন ব্যক্তি অবিচার ও অন্যায় করে তাহলেই তার ভয়ঙ্কর রুদ্র-রোষ নেমে আসে। কোরিয়ায় প্রচলিত প্রবচনে আছে, — ক্ষমতাবান, বিনয়ী ও সম্পদশালী হয়। ধনী যখন দয়াবান হয় তখনই সাদাবাঘের দর্শন মিলে।

চিনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত, আসামের উত্তর-পূর্ব আর মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা পূর্বদিকে কাচিন প্রদেশ। মায়ানমার আর আসামের সীমান্তবর্তী এই গিরিপথ দিয়েই বার্মিজরা আসাম আক্রমণ করে আহোম রাজাকে বিতাড়িত করেছিল। আসাম, প্রাচীন ব্রাহ্মদেশ ও চিন এই তিন দেশের সীমান্ত সংযোগস্থল দিয়েই ছিল প্রাচীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ। এই পথ ধরেই বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। কাচিন প্রদেশেই উত্তর-পূর্বভারতের কোন কোন জঙ্গিদলের অন্যতম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আবাসস্থল গড়ে উঠেছিল। এই পথেই ইরাবতী নদী হয়ে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর এক শাখার প্রাচীন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তার ঘটেছিল। প্রচলিত জনশ্রুতি ও লোককথা মতে এই অঞ্চলের চিন-পর্বত থেকে তাদের এক শাখা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। একদল উপকূলের ধার ধরে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম হয়ে সুন্দরবন পর্যন্ত বসতি বিস্তার করে। অপর যে প্রধান গোষ্ঠী তারা বিভিন্ন পর্যায়ে কাছাড়ের পূর্ব সীমান্তের বড়াইল পাহাড় হয়ে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণপারের পর্বতে ছড়িয়ে পড়ে। এই মঙ্গোলীয়রাই পর পর তাদের প্রব্রজনের ধারায় নাগা, কুকি ও মণিপুরি এই তিন প্রধান আদিবাসী জনগোষ্ঠী নামে পরিচিতি লাভ করে। আদি উৎস-ভূমি থেকে যে লোকঐতিহ্য ও জীবনধারা তারা বয়ে নিয়ে চলেছিল তা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়েও তার স্মৃতিঅবশেষকে ধারণ করে আজও চলমান। তাদের লোককথা, সংস্কার, বিশ্বাস আর সংস্কৃতির বৈভব আদি ইতিহাসের পরম্পরা সূত্রকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাচিনদের সৃষ্টিমূলক আখ্যানে মহান 'না-ট'দের (পরমাত্মা) নবম আত্মা হলেন লান্-খেন মাদই যিনি চৈনিক, শান ও কালাদের জন্য আয়োজিত ভোজে নেতৃত্ব দেন। 'কালা' শব্দের অর্থ হল বিদেশি। মণিপুরিরাও বহিরাগত বিদেশিদের 'কালা-ছইয়া' নামে অভিহিত করে থাকে। তাদের প্রথাগত লোকবিশ্বাস যে চিতা বাঘের বাস ছিল স্বর্গে আর বজ্রের ছিল মর্ত্যে। ফলে পৃথিবীতে কোন প্রাণের সৃষ্টি সম্ভবপর ছিলনা। বজ্র-বিদ্যুতের তাপে বীজ অংকুরিত হত না এমনকী ঢাক বাজাবার জন্যও কোন প্রাণী ছিল না। বজ্র একদিন চিতা বাঘকে বলল, চল আমরা স্থান বদল করি। বাঘ নেমে এল মাটিতে আর বজ্র চলে গেল আকাশে। বাঘের তীব্র নখরাঘাতে মাটি চিরে ক্ষেত্র হল প্রস্তুত আর বজ্র নিয়ে এল মেঘ। ফসলের প্রাচুর্যে ভরে উঠল পৃথিবী। বজ্রশক্তির নিয়ন্ত্রক না-ট হলেন লা-ন্ তু-মুশেং বা মাকামওয়া নিংশাং। তার আদেশেই মেঘের সৃষ্টি, বর্ষণ, বাতাস, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত ঘটে। তাকে তুষ্ট করতে কাচিনরা হাঁস, মুরগি, মিথুন বলি দিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে।

জাতকের ভবিষ্যৎ বিচারের ক্ষেত্রে কাচিনদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা হল— ".. ways of forecasting the future are known by the greater number of Kachins and are used by them; some have recource sometimes to Shan or Chinese sorcereres or to some rare Kachins instructed by the former, who seperate days of the tiger, the leopard, the elephant, the horse, etc.

Then the new-born shall be powerful, if he is born on the day of the tiger or the leopard; great, on the day of the elephant; fat, on the day of the buffalo; shall always to eat without working on the days of the dog, the cat, the rat, the hare; shall never have his fill, on the days of the horse, the fowl, the pig, etc. ; shall have a numerous posterity, on the day of the goat, etc."[৯]

দেখা যে উনিশ শতকের শেষদিকেও উত্তর-পূর্বের পার্বত্যজাতিদের মধ্যে বাঘ-মানবের অস্তিত্বের প্রতি লোকমানসে গভীর বিশ্বাস ছিল। এ সম্পর্কে A.W.Davis প্রদত্ত তথ্য উল্লেখ করে Veriar Elwin বলেন— "Of these, two of the most curious are (1) the belief in the existence of 'Tiger-Men',

i.e, men with power of turning themselves into tigers; and (2) the belief in the existence of a village inhabited only by women. Tiger-men are well known, and I have the pleasure of the acquaintance of one. This gentleman is a Sema chief of a small village in the Tizu valley. He himself disclaims the power, but that he has it is implicitely believed by the whole of the Sema and Angami tribes. A whole village of tiger-men is said to exist in the far north-east. It is in this direction, too, that there lies the happy village peopled entirely by women. The population of this village is kept up by its Inhabitants being visited by traders from the surrounding tribes.''[১০]

লোককথায় বাঘ রূপ বদল করে মানব হয় আবার মানব-মানবী বাঘ-বাঘিনী হয়। বাঘ-মানব গ্রাম-প্রধান হয়, জুমক্ষেতে চাষ করে, মাছ ধরে, রাজকুমার হয় মানব স্বভাবের যা কিছু প্রবৃত্তি ও সাধারণগুণ সবই তার থাকে। বাঘ হয়েও মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। ওরা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয় এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে রীতিমত লড়াইও বাঁধে। বিজয়ীর প্রতি বিজিত ব্যক্তির এই বলে একটি অনুরোধ থাকে যেন মৃত্যুর পর মিথুন উৎসর্গ করে-'লা' অনুষ্ঠানের দিনে তার মুন্ডটি ঘরের বারান্দায় গৌরবের স্মারক হয়ে না থাকে। লোক সমক্ষে চিরকাল এভাবে যাতে হেয় প্রতিপন্ন হতে না হয় তার জন্য সে বিনয়ী হয়ে ওঠে। মানব তার নিজের অজান্তেই বাঘ-মানবীকে বিয়ে করে ভয়াবহ সংকটে পড়েও নিজ হাতে প্রিয় স্ত্রীকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে। অবশেষে কৌশলে তাকে হত্যা করার পর সে ও আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত গ্রামবাসী নিরাপত্তার জন্য দলবেধে এসে বাঘ-মানব মানবীদের পরিবারকে হত্যা করে তাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এই বাঘ পুজা দেবতাও হয়। বাংলার দক্ষিণরায় এমনি এক পূজিত দেবতা। উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালির লোক-জীবন সংস্কৃতিতে আজও বাঘপূজা এক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। সুরমা-বরাক উপত্যকার বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে বাঘের নামে ছড়া, পাঁচালি লোকমুখে ফিরে। বাঘের বেশে বাঘ-নাচেরও প্রচলন রয়েছে।

বাঘ মানব ও বাঘ-মানবী নিয়ে মিজো, লাখের ও পাবিদের (Pawi) মধ্যে প্রচলিত ক'টি লোককথা পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর তুলে ধরা হল :

মিজো লোককথা ঃ চাংশিলি ও রালপুই

লোকশ্রুতি বলে যে ঘটনাটি ঘটেছিল আইজল-চম্পাই রোডে। বেইতে উপজাতিদের দাবি যে তাদের পূর্বপুরুষরাই সাপ-দানব রালপুইকে আহার যুগিয়েছিল।

চাংশিলি বলে একমেয়ে তার বাবার জুমক্ষেতে চাষ করত। সেখানে এক গাছের কোটরে বাস করত রালপুই নামে এক সাপ। মেয়েটি পড়ে যায় এই সাপের প্রেমে। ক্ষেতের কাজের ফাঁকে সে প্রতিদিন তার ছোটবোনকে পাঠিয়ে রালপুইকে ডেকে এনে কোলে বসিয়ে আদর খেত। ঘর থেকে মা যে খাবার দিতেন ছোট মেয়েটি সাপের ভয়ে তা মুখে নিতো না। ক্রমে কিছুদিনের মধ্যেই সে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। ওটি ভাগ করে খেত চাংশিলি আর রালপুই। মেয়ের অবস্থা দেখে মা-বাবা তাকে একদিন খুব করে বকতে লাগলে সে সাপ ও বোনের গোপন প্রেমের কথা ফাঁস করে দেয়। পরদিন চাংশিলিকে ঘরে বন্দি রেখে ছোট মেয়েটিকে নিয়ে নারীবেশে বাবা যায় ক্ষেতে। একখানা ধারালো দাও সে কাপড়ের আড়ালে বেঁধে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে মেয়েকে দিয়ে ডেকে পাঠালো রালপুইকে। সাপটি ছুটে এসে প্রেমিকা ভেবে কোল জড়িয়ে ধরতেই এক কোপে তাকে দুটুকরো করে ঘরে ফিরল বাবা আর ছোট মেয়েটি।

পরদিন চাংশিলি ছোটবোনকে নিয়ে ক্ষেতে পৌঁছেই কি যেন এক অজানা আতঙ্কে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং চীৎকার করে তার প্রেমিক সাপকে ডাকতে থাকে। কিন্তু তার কোন সাড়া না পাওয়ায় বিষণ্ণ মনে সে ঘরে ফিরে। বারান্দায় পা দিতেই সে অবাক হয়ে দেখল দোর আগলে বাবা সটান শোয়ে আছে। বিরক্ত চাংশিলি পায়ের কাদা

মোছার জন্য চৌকাঠ ছেড়ে দিতে বললে বাবা তার কথায় কোন কানই দেয়নি। তখন সে বাধ্য হয়ে যেই সে তাকে ডিঙিয়ে দরজার দিকে যেতে চাইল তখন মুহূর্তে বাবার হাতের দায়ের কোপে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মেয়েটির গর্ভে তখন ছিল অজস্র সাপের বাচ্চা। এগুলি মাটিতে পড়ে কিলবিল করতে থাকে আর একটি একটি করে সবগুলিকে হত্যা করে নিরস্ত হল বাবার ক্রোধ। কিন্তু এরই মধ্যে একটি বাচ্চা দৃষ্টি এড়িয়ে মিথুনের শুকনো গোবরটিবির নিচে লুকিয়ে পড়ে। ক্রমে এই বাচ্চাটি বিশাল ও ভয়াল দানবাকৃতির হয়ে ওঠে। তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে হত গ্রামবাসীকে। এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাপের জন্য খাদ্য যোগান দেওয়ার একটি প্রথাগত বিশ্বাসও রয়েছে। তারা আদেশ মত একটি নির্দিষ্ট গর্ভে খাদ্যবস্তু রেখে দিত। এই গর্ভের নাম হল— 'বুলেচাওয়া কুয়া'।

প্রতিদিন এই সাপ-দানবটির চাহিদা মত শূকর, ছাগল ইত্যাদির যোগান প্রথামত সবাই দিতে থাকল। কিন্তু এসব খাদ্যে যখন তার বিরক্তি দেখা দিল তখন গ্রামবাসীর কাছে সে নরশিশুর মাংস দেবার আদেশ করল এবং তার যোগানও সবাই ভয়ে দিতে থাকল। এ সময় চিনদেশের (মায়াম্মার সংলগ্ন চিন-হিল) এক অধিবাসী সে গ্রামের এক ব্যক্তির ঘরে অতিথি হয়ে বাস করছিল। একদিন ঘরে ফিরে সে দেখল যে বাড়ির মালিক ও গৃহিণী ভয়ে কাঁদছেন। তার প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল যে, সেদিন ছিল সাপ-দানবের আহারের জন্য তাদের শিশুসন্তানটিকে উৎসর্গ করার পালা। একথা শুনে ক্রোধে আগন্তুক অতিথি গর্জে ওঠে এবং সাপটিকে হত্যা করার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে যায়। সে একটি ছাগল মেরে তার মাংস দিয়ে নিজের হাতে একটি দাও নিয়ে সেটির মাথা থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত মুড়ে নিয়ে সে চলে গেল সাপের মুখের কাছে। ধারালো দাও সহ হাতটিকে যেই সে গিলতে গেল ওমনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে দ্রুত হাতটি মুচড়িয়ে টেনে বের করল আর দানবটি মারা গেল।

লাখের সম্প্রদায়ের লোককথা ঃ নারার কথা

লিয়াথা নামে এক যুবকের বিয়ে হয়। ক'দিন পরই জানা গেল যে স্ত্রীটি গর্ভবতী। এ অবস্থায় সে প্রতিদিন ক্ষেতে কাজ করতে যায়। কাজে যাবার সময় হঠাৎই গর্ভের শিশুটি চীৎকার করে কেঁদে বলল — মা আজ বৃষ্টি হবে, তুমি পাম্-গাছের পাতা তুলে নাও শরীর বাঁচাতে। মা বলল, তুমি এখনো পেটে বৃষ্টি বিষয়ে কিছুই তোমার জানার কথা নয়। একথা বলে সে মাঠে চলে গেল এবং ঝড়-বৃষ্টিতে প্রচন্ড নাকানি-চোবানি খেল। পরদিন আবার শিশুটি বলল আজ খুব গরম পড়বে সঙ্গে কিছু জল নিয়ে যেও। সেদিনও মা তার ভবিষ্যদ্বাণী অসম্ভব ভেবে বেরিয়ে গেল কিন্তু প্রচন্ড গরমে টিকতে না পেরে ঘরে ফিরে এল। কিছুক্ষণ পরই জন্ম হল সন্তানের, নাম রাখা হল নারা।

সময়টা ছিল চাষ-বাসের। মা-বাবা শিশুটিকে নিয়েই মাঠে যায় এবং এক ছোট ছাউনির বারান্দায় রেখে (hum house) তারা কাজ করে।

নারা ঘুরে ঘুরে দেখল আকাশে একটি চিলপাখি চিৎকার করে কাঁদছে, সে তার কান্নার কারণ নিয়ে ভাবতে লাগল আর জোরে জোরে কথা বলতে থাকল, পাখিটি কি আজ বৃষ্টি অথবা প্রচন্ড গরম কিছু একটা হবে ভেবে কাঁদছে? দূর থেকে মা-বাবার মনে হল ঘরে কোন লোক এসে জোরে কথাবার্তা বলে সন্তানের বিরক্তি ঘটাচ্ছে। ওদের উদ্দেশ্য করে তাই বলল, — তোমরা কথা বলনা, ছেলেটির ঘুম ভেঙে যাবে। কিন্তু শিশুটি অনবরত পাখির উদ্দেশ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যেতেই থাকল। এ শুনে নারার বাবা রাগ করে লোকদের চুপ করতে উচ্চকণ্ঠে ধমক দিল এবং দ্রুত শিশুটির কাছে ছুটে গিয়ে ওখানে অন্য কোন লোক না দেখে ভাবল বোধ হয় সে ব্যক্তি পালিয়ে গেছে। পরদিন একইভাবে শিশুটির ওখান থেকে জোরে জোরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল তখন চুপচাপ পা টিপে ঘরের কাছে এসে বাবা দেখল যে ছেলেটি একা একাই কথা বলে চলেছে। এতে তার মন খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কারণ সে বুঝতে এই ছেলেটির মধ্যে অলৌকিক কোন ক্ষমতা রয়েছে যা ভবিষ্যতে একদিন তার দক্ষতাকে কেড়ে

নেবে। এই ভয়ে সে সন্তানের জিহ্বার কিছু অংশ কেটে ফেলল।

নারার বয়স যখন প্রায় বারো তখনই সে দক্ষ শিকারি হয়ে ওঠে। একদিন সে যখন বনের পথ ধরে ছুটে যাচ্ছিল তখন এক কিশোরীকে একা একা কাপড় বুনতে দেখে কৌতুকভরে টিটকিরি দেয়। ছিনিয়ে নেয় তার হাতের মাকু।

মেয়েটি বলে তুমি যদি একটু চুপ করে আমার পাশে বস তাহলে তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা আমি বলতে পারি। এরপরই নারা কিশোরীটির কাছে তার বাবার হিংস্রতার কথা জানতে পারে। ঘরে ফিরে বাবাকে বেশ চিন্তিত ও আনমনা দেখে সে আব্দার করে বলল, — আজ তুমি আমাকে কাঁধে চড়িয়ে একটু বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। কাঁধে চড়িয়ে ছেলের কথামত একবার মাথার উপরে একবার ঘাড়ে নানাভাবে তাকে ইচ্ছেমত তুলে ধরলেও তার হাতে জাদুশক্তি হারানোর একটা ভীতিও বাবার মধ্যে সক্রিয় ছিল। এদিকে ছেলেটিও ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। হঠাৎই সে তার বাবার পিঠের ফোঁড়াটি যেটি কিনা ছিল তার জাদুশক্তির আধার ওটা কামড়ে গিলে নিল। এরপর তার বাসনা জাগল জাদুবিদ্যার দক্ষতাকে যাচাই করে নেওয়ার। সে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, — বল দেখি শূকর না চাল, কোনটা অধিক দামি। বাবা বলল — শূকর। ছেলে প্রমাণ করতে চাইল শূকর থেকে চালই দামি তাই সে চাল নিয়ে এল। বাবা আনল এক শূকর। শূকর ছিল সহজলভ্য তাই পথে সবাই নারার কাছে চাল চেয়ে নিল। নারা প্রশ্ন করল এখন বল আমি সত্য না তুমি সত্য। বাবা বলল তুমিই সত্য, তুমি হলে 'তাসাও' (Tawsaw) মাতৃগর্ভে থাকতেই তুমি এ বিদ্যায় পারদর্শী। নারা পুনরায় প্রশ্ন করল- আচ্ছা, বল তো রাস্তায় যদি লোকে একসঙ্গে একটি হরিণ ও ইঁদুরকে আসতে দেখে তাহলে তারা কোনটিকে তাড়া করবে। বাবা বলল নিশ্চয়ই হরিণ। এরপর নারা নিজে একটি ইঁদুর আর তার বাবা একটি হরিণ পথে ছেড়ে দিল। দেখা গেল সবার নজরে আসার আগেই হরিণ গেল পালিয়ে আর ইঁদুরকে দেখে সবাই তাড়া করে ওটাকে মেরে ফেলল। এভাবে বাবা ছেলের কাছে ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। ক্রমে নারা দুঃসাহসী বীর ও কুশলী জাদুকর হয়ে ওঠল।

একদিন নারার বাবা নাসাইপু নামে এক গ্রামপ্রধানের সঙ্গে গেল দেখা করতে। এই লোকটি ছিল বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক। তাকে দেখেই গ্রামপ্রধান জিজ্ঞেস করল তুমি নিশ্চয়ই মৃত্যুনদীপথ হয়ে এখানে এসেছ? উত্তরে সে বলে - হ্যাঁ। এরপরই নাসাইপু মদ তৈরি করে দু'জনে মিলে ভোজ খেল আর মৃত্যু হল নারার বাবার। খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ নারা প্রতিশোধ নিতে এলে নাসাইপু তার বাড়ির চারদিকে জাদুজাল বিস্তার করে সুরক্ষার বন্ধন গড়ে তুললো। দূর থেকে নারা তার জাদুশক্তি দিয়ে সবই দেখতে পায় এবং সে এক ইঁদুরের বেশে ঘরে ঢুকে পড়ে। বিস্মিত নাসাইপু তাকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল — তুমি কি মৃত্যুনদীপথ ধরে এখানে এলে? উত্তরে সে বলে — না জীবননদীপথ ধরে এসেছি তোমার ভাত আর মাংস খেতে। পরদিন সকালে নাসাইপু এক ভোজের আয়োজন করে মদের মধ্যে এক সাপ লুকিয়ে রেখে তা পরিবেশন করলে নারা তা সহজে টের পেয়ে যায়। হঠাৎই সে নাসাইপুকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পাহাড়ের লড়াইর দৃশ্য দেখতে বলে। নাসাইপুর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য বাইরে যেতেই সে ঈগল হয়ে সাপটিকে মেরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাত্র থেকে মদটুকু নিল আর চকিতে নাসাইপুর পাত্রে বিষমন্ত্র ছড়িয়ে দিল। নাসাইপু সেই পাত্রের নলে ঠোঁট ছোঁয়ানো মাত্রই সেটি সম্পূর্ণ তার গলায় আটকে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এরপর নারা নাসাইপুর সব সজ্জন, ক্রিতদাস ও মিথুনগুলি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

একদিন মাছ ধরার সময় নারার উজানবাহী জালটি এক বাঘ-মানবের সর্দারের নিম্নবাহী জালের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। এ নিয়ে প্রচন্ড ঝগড়ার পর মাছ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়। সর্দারকে নিয়ে নারা তার ঘরে ফিরল। এই সর্দারের নাম ছিল কিয়াথিউর। সেও ছিল এক জাদুকর। মজার ব্যাপার হল কিয়াথিউর মাছগুলির কোন মাথা ছিলনা, কারণ ধরার সময়ই সে সবগুলির মাথা খেয়ে ফেলেছিল। মাছগুলি দেখে নারার মার কেমন সন্দেহ হয় কিন্তু নারা মাকে বোঝাল যে সে নিজেই মাথাগুলি খেয়ে এ কান্ড করেছে। তখন কিথাউর বন্ধুর বিশ্বস্ততার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। নির্ধারিত দিনে কিয়াথিউর সব গ্রামবাসীদের ডেকে বলল যে তার বন্ধু নারা যতদিন থাকবে সবাই যেন মানুষের বেশে থাকে। নারা আতিথ্য গ্রহণে উপস্থিত হয়েই

কিয়াথিউর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। প্রথমে সে আপত্তি করলেও পরে একটি ঝাঁপি দেখিয়ে বলল ওখানে ওরা রয়েছে। নারা যেই ঝাঁপির ঢাকনা খুলে দেখতে গেল অমনি বাঘ ও বাঘিনী তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। সঙ্গে সঙ্গে নারা তাদের রূপ ও গুণের প্রশংসা করতে লাগলে প্রসন্ন হয়ে কিথাউর মা-বাবা মানুষের রূপে শান্ত হয়ে তার পাশে বসল। নারা তাদের একপ্রস্ত পোশাক উপঢৌকন দিলে বিনিময়ে তার সম্মানে একটি শূকর বধ করে ভোজের আয়োজন করা হল।

কিথাউর বাড়িতে ছিল একটি আশ্চর্য গাছ, যাতে সবধরনের ফল ও শস্যের বীজ ধরত কিন্তু ফল হতনা। নারা অজস্র বীজকে মন্ত্র-সিক্ত করে সামান্য ক'টিতে পরিণত করে তার তামাকের কৌটায় ভরে নেয়। পাঁচদিন সেখানে বাস করার পর এলো তার ঘরে ফেরার দিন। সে পথে বাড়ি পৌঁছতে লাগত পাঁচদিন। পথে যাতে বাঘেরা কোন বিপদ ঘটাতে না পারে সে জন্য কিথাউর নারাকে এই বলে সতর্ক করে দিল যে, সে যেন ভুলেও কোথাও কালক্ষেপ না করে এমনকী মলবিষ্ঠা ত্যাগ করলে তার উপর মদের গাঁজলা বা খামি ঢেলে দেয় তাহলে কেউ গন্ধ শুঁকে তাকে অনুসরণ করতে অসমর্থ হবে। নারা গ্রাম ছাড়ার প্রাকমুহূর্তে কিথাউর ঘোষণা করে দিল যে, মাননীয় অতিথি গ্রামে আরো পাঁচদিন বাস করবেন এবং এই ক'দিন সর্দারের বাড়িতে ঢাক বাজবে।

পাঁচদিন পর গ্রামের বাঘ-মানবরা জানল যে ইতিমধ্যে নারা চলে গেছে এবং তাকে ধরতে সবাই দ্রুত ছুটতে লাগল। কিথাউর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে ততোদিনে তার অতিথি নিজের দেশে হয়ত পৌঁছে গেছে। তবুও কিথাউর বন্ধুর নিরাপত্তার কথা ভেবে গ্রামবাসীর সঙ্গে দৌড়ে গেল। নারা পথে একদিন দেরি করার ফলে মহাসঙ্কট দেখা দিল। জাদুবলে সে বাঘ-মানবদের উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত বন্য ভালুকের শুকনো বিষ্ঠা আর পাতার ঢিবির নীচে আশ্রয় নিল।

পথশ্রমে ক্লান্ত কিথাউর এসে এই ঢিবির উপর বসে বাঘ-মানবদের এই বলে প্রশ্ন করে যে তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় কোন বিষয়ে। উত্তরে তারা বলে, প্রভু যাকে ভয় করেন। সর্দার বলে, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল যদি আমাদের ঘিরে দেখা দেয় ভীষণ কালো মেঘের ঘন অন্ধকার আর এর মধ্যে আমি যে ঢিবিতে উপবিষ্ট সেই স্তূপের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে কোন ভয়াল কণ্ঠস্বর। ঘাপটি মেরে বসে থাকা নারা সব শুনত পেয়ে জাদুবলে ডেকে আনে কৃষ্ণমেঘের দল এবং সে তারস্বরে চিৎকার দিতে থাকে। মুহূর্তে বাঘ-মানবের দল আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পালাতে থাকে শুধু কিয়াথিউর বসে থাকে অনড় হয়ে। সে নারাকে তার বোকামির জন্য ভর্ৎসনা করে চলে যায়। নারাও ফিরে আসে বাড়িতে আর সঙ্গের মুষ্টিমেয় বীজগুলিকে লক্ষ লক্ষ বীজে পরিণত করে সবার কাছে তা বিলিয়ে দেয়। শস্য-শ্যামলা ও সুফলা হয়ে ওঠে তার গ্রাম।

নারার কৃতিত্ব দেখে ঈর্ষান্বিত বড় ভাই লোভের বশে ছুটে গেল কিয়াথিউর গ্রামে। তাকে দেখতে পেয়ে বাঘেরা তাকে গিলে ফেলে। বন্ধু নারার কথা ভেবে সর্দারের আদেশে সবাই তার দেহের বিভিন্ন অংশ উগলে দেয়। মন্ত্র বলে তার দেহাংশগুলি জুড়ে দিয়ে হতভাগ্যের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেও তার বাহুর তলদেশে একটি গর্ত থেকে যায়। কারণ ছিল এই যে, এক বুড়ো বাঘের দাঁতের ফাঁকে মাংসের অংশ আটকে থাকায় ওটা বের হয়ে আসেনি। সর্দার এই গর্তটিকে গাছের মোম দিয়ে ভরাট করে দেয়। ওখান থেকে গাছের অনেক বীজ সংগ্রহ করে সেও বাড়ি ফিরে নারার সামনে বড়াই করে বলে, আমিও এমন সব সম্ভার নিয়ে জীবিত ফিরে এসেছি। নারা জাদুবলে সব খবরই জানে তাই বলল, — তুমি নও তোমার মৃতদেহ, ফিরে এসেছে, তোমার হাতের নীচেকার মোমের অংশ খুলে দেখ। বড়ভাই আশ্চর্য হয়ে সেটা বের করতেই সে মারা পড়ল। ভাইয়ের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে নারা ছুটে যায় বাঘ-মানবদের গ্রামে। বন্ধু কিয়াথিউর নিকট এই হত্যার কৈফিয়ত চেয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

কিয়াথিউর তখন ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত জানিয়ে তাকে শান্ত করার প্রচেষ্টা করে। এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য যে বড়ভাই দায়ি একথা জানিয়ে বলে যে, এরপরও যদি নারা প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে লড়াইতে সেও একটি শর্তে প্রস্তুত। শর্তটি ছিল যে, যেই পরাজিত হোক তার মৃতদেহকে নিয়ে বিজয়োৎসব 'লা' নিশ্চয়ই পালিত

হবে। কিন্তু অন্যান্য বিজয়-স্মরাকের সঙ্গে বিজিতের মুণ্ডু ঘরের বারান্দায় লোকচক্ষুর সামনে টাঙিয়ে রাখা যাবেনা। এর পর দু'জনই বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুরু করল তুমুল লড়াই। ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নারা মোম দিয়ে তার এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করল ক্ষেত-বাড়ির প্রাঙ্গণে আর হাতে তীর-ধনুক দিয়ে নিজে আত্মগোপন করল বাড়ির ভিতর। কিয়াথিউর তাকে অনুসরণ করে এসে ভ্রমে প্রতিমূর্তিটিকে সজোরে জাপটে ধরে যখন গ্রাস করতে গেল তখন নারা তাকে তীরবিদ্ধ করে। মৃত্যুর আগে নারাকে সে বলে, — প্রিয় বন্ধু তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর, আমি পরাজিত। এরপর গ্রামে একটি মিথুন হত্যা করে কিয়াথিউর কাটা মুন্ডু হাতে নিয়ে প্রথাগত শবদেহকে ঘিরে 'লা' অনুষ্ঠান পালন করা হয়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি মত বিজয়-স্মারক রূপে মুণ্ডুটি বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। এই ঘটনার পর থেকে লাখের উপজাতির লোকেরা বাঘ কিংবা মানুষ কোন প্রাণীকেই হত্যার পর তার মুণ্ডুকে বারান্দায় শৌর্যের প্রতীকরূপে টাঙিয়ে রাখে না।

ক'দিন পর নারা অজান্তে বাউরি নামে এক বাঘ-মানবীকে বিয়ে করে ফেলে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে প্রায়ই বাউরি নারার বন্ধুদের খেয়ে ফেলত। বন্ধুরা এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে নারার কাছে নালিশ জানায় এবং স্ত্রীকে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু নিজহাতে তাকে হত্যা করতে সে দ্বিধাবোধ করেলো স্ত্রীকে মেরে ফেলার এক কৌশল সে অবলম্বন করল। মোটা একটি বাঁশের নলের নীচের দিকে ছিদ্র করে সেটি মন্ত্রপূত করে স্ত্রীকে বলল ঝর্ণা থেকে জল তুলে আনতে। বাউরির কাছে এ চাতুরি অদৃশ্য থেকে গেল। সে ঝর্ণতলায় অনবরত বাঁশের চোঙাটিতে জল ভরার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু তবু তা অপূর্ণই থেকে যায়। এরমধ্যেই তীব্র গর্জনে দুর্বার জলস্রোতের ঢল নামে পাহাড় থেকে। অসহায় বাউরিকে দেখে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে নারা। উদ্বিগ্ন বাউরির প্রশ্নে নারা বলে ও কিছু নয় বৃষ্টির জলে চোখ ভিজে গেছে তাই। এরপরই জাদুজাল বিস্তার করে নারা নামিয়ে আনে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। জলের তোড়ে ভেসে যায় বাঘ-মানবীর মৃতদেহ। গভীর বিষণ্ণতা নিয়ে নারা ফিরে এল ঘরে। নিঃসঙ্গতা ও বিবেকের দংশন তাকে ক্রমে পীড়িত করে তুলে। আত্মীয়-স্বজনেরা তার করুণ অবস্থা দেখে তাকে বাউরির মৃতদেহের কাছে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে উপদেশ দেয়। মহা আনন্দে হাতে একটি লাউয়ের খোল আর সূতাকাটার টেকো নিয়ে নদীর পারে এসে দাঁড়ায় নারা। জলে ভাসিয়ে লাউ আর টেকোটির উদ্দেশ্যে সে বলল, — তোমরা ভেসে গিয়ে বাউরির মৃতদেহের কাছে পৌঁছাও আমিও তোমাদের অনুসরণ করছি। এভাবে ভাসতে ভাসতে নারা এসে পৌঁছালো সমুদ্রের মোহনায় যেখানে বিলীন হয়ে গেছে বাউরি। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে নারা দেখতে পেল তীরে একদল সৈন্য তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতের খঙ্গ তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বলল, — হে বিদেশি সৈনিকেরা, তোমরা তা গ্রহণ করতে পার। তারা সেটি লুফে নিয়ে প্রত্যুত্তরে অভিবাদন জানিয়ে বলল, — হে মহান লিয়াথার সন্তান, তোমার শক্তি বজ্রের মত দীপ্তিময়। তোমার অস্ত্র ধারণ করে আমরা ধন্য। এরপর নারার যা কিছু বিদ্যা ও প্রজ্ঞা সবই সে তাদের উদ্দেশ্যে দান করে সমুদ্রে হারিয়ে গেল। তোমরা

এই আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস যে তাদের সৈন্যদল এই মহান নারারই বীরত্ব, ঐশ্বর্য, জাদুশক্তি, সম্পদ এমনকী লিপিকুশতা পর্যন্ত তাদের শিরবন্ধনী বা পাগড়ির মধ্যে ধারণ করে চলেছে।

পাবি লোককথা ঃ এক বাঘ-মানব ও তার মেয়ে

এক বাঘ-মানব আর তার মেয়ে জুমক্ষেতে কাজ করত। দুপুরের আহারের সময় এলেই কোন না কোন অছিলায় খাবার না খেয়ে মেয়েকে রেখে বাবা বেরিয়ে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে কাজে যোগ দিত। একদিন যখন দুপুরের খাবার তৈরি হচ্ছিল তখন বাইরে এক হরিণশিশু ক্ষেতের ধারের জঙ্গলে ডেকে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মেয়েকে খাবার খেয়ে নিতে বলে পেটব্যথার অজুহাতে জল আনতে বেরিয়ে যায়। ঘর থেকে বেরিয়েই সে বাঘের আকৃতি ধারণ করে হরিণটিকে ধরে খেয়ে মেয়ের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু বাবার ঠোঁটে ও মুখে লেপ্টে থাকা রক্তের দাগ দেখে মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে আসলে তার বাবা এক বাঘ-মানব।

সেও পেটের হজমের গোলমালের কথা বলে বাবাকে ছেড়ে দ্রুত এক যুবকের কাছে এসে আশ্রয় নেয়। মেয়েটি তাকে বিয়ে করে ছেলেটির মা-বাবার কাছে আশ্রয় চাইলে সে রাজি হয়ে যায়। এরপর মেয়েটি তার ঘরে ফিরে যাবার পথে রাস্তায় চারটি তীর গোছা করে বেঁধে পরণের জামা দিয়ে ঢেকে পুতে রাখে। এদিকে বাবার মনে মেয়েটির হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার কথায় কেমন খটকা বাঁধে। সে দ্রুত জানালার সামনে গিয়ে মেয়েকে খুঁজতে থাকলে জলের মধ্যে নিজের রক্তমাখা মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল যে সন্তানের কাছে সে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে পারেনি। মুহূর্তে সে মেয়েকে হত্যা করার সংকল্প নিল। ভয়ংকর বাঘের আকৃতি নিয়ে সে ছুটল ঘরের দিকে। পথে জামা দিয়ে ঢাকা তীরগুচ্ছকে মেয়ে ভেবে এক লাফে সে তাকে গ্রাস করল। কিন্তু পুতে রাখা শর তার মুখকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। প্রচন্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কিছুদূর যাবার পরই তার মৃত্যু ঘটলো। সন্ধ্যাবেলায় বাঘের গর্জনে শংকিত লোকজন ছুটে এসে তাকে দেখতে পেল রাস্তার পাশে। তখন তার মানব রূপ ফিরে এসেছে। সবাই মিলে তাকে এনে তখন উঠানে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখল। বাবার এই মৃত্যুর জন্যে গ্রামবাসীরা মেয়েকেই দায়ী করে বিচার বসাল। ইতিমধ্যেমেয়েটি সঙ্গের কুকুরটি নিয়ে বাড়ি ফিরে। গ্রামবাসীদের অভিযোগকে পাত্তা না দিয়ে ধীরেধীরে কুকুরকে বলল, — চল, আমরা হত্যাকারীরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। মুহূর্তে কুকুরটি লাফিয়ে পড়ল শবদেহের উপর আর নিমেষে সবাই দেখতে পেল প্রাণহীন দেহটি ক্রমে এক ডোরাকাটা ভয়ঙ্কর বাঘের আকৃতি নিয়ে নিল। শোকাহত গ্রামবাসী আতঙ্কে চারদিকে ছুটে পালিয়ে গেল। পরদিন সমস্ত লোক মিলে বাঘ-মানব পরিবারের সবাইকে হত্যা করে তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

পাবি ঃ বাইংসামের কথা

শিকারি বাইংগাম উঁচুটিলা থেকে নামার পথে দেখতে পেল একটি বাঘ হরিণ মেরে তাক ভোজের উদ্যোগ করছে। সঙ্গে সঙ্গে হরিণটিকে তুলে নেবার জন্যে বাঘকে তাক করে ধনুক তুলতেই সে তাকে হত্যা না করার অনুরোধ জানিয়ে বলল আমি বাঘিনী, আমি তোমাকে বিয়ে করে সুখী করব। বিয়ের পর বাঘিনী বাইংগামের চোখ দুটি নিজের কাছে রেখে তাকে তার উজ্জ্বল দুটি চোখের জ্যোতি উপহার দিল। রাতের অন্ধকারে বাইংগাম বাঘের চোখ নিয়ে সব উজ্জ্বল দেখতে পায়। বাঘিনী শিকার ধরে আনে আর ঘরে বসে বাইংগাম তৃপ্তিতে তার ভোজ সারে। বাঘিনীর নিবিড় ভালবাসার বন্ধনে বাইংগামের বছর কাটে। ইতিমধ্যে তার ঘরে দুটো ছেলে জন্মায়। দীর্ঘদিন একসঙ্গে বসবাস করার পর হঠাৎ একদিন তাদের মহান ধর্মীয় উৎসব খুয়াংচাবির কথা বাইংগামের মনে পড়ে যায় আর সে চঞ্চল হয়ে পড়ে। গ্রামের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের জন্য ব্যাকুল হয়ে সে তার স্ত্রীকে হত্যা করে পালাবার ফন্দি আঁটে। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল এখানকার গ্রামপ্রধানের বাড়িতে উৎসবের জন্য যে পবিত্র মিথুনটিকে গাছে বেঁধে রাখা হয়েছে তার কলেজটা এনে দিতে। বাঘ-রমণী জানে এই অনুরোধ পালন করতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য তবু তার প্রাণ রক্ষাকারী ভালোবাসার স্বামীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি যে সে দায়বদ্ধ। যাবার আগে সে তার আসন্ন মৃত্যুর কথা বাঘ-সন্তানদের জানিয়ে তাদের হাতে বাইংগামের চোখ দুটি তুলে দিয়ে বলল যে মারা যাবার পর তারা যেন তা বাইংগামকে দিয়ে তাকে দেশে ফিরে যেতে বলে। ছেলেদের সে আরো বলে যে, তারা যেন তাদের বাবার কোন পশু ও পরবর্তী সময়ে কোন সন্তানের জন্ম হলে তাদের ক্ষতি না করে এবং তারাও যেন তোমাদের প্রতি সদয় থাকে। তাছাড়া তোমাদের মৃত্যু হলে পর তারা কেউ যেন তোমাদের জন্য কোন অনুষ্ঠান বা উৎসবাদি পালন না করে। বাঘেরা যেন গৃহস্থের কোন প্রাণীর ক্ষতি সাধন না করে।

একথা বলে বাঘ-রমণী দ্রুত ছুটে গিয়ে মিথুনটিকে মেরে তার কলেজ এনে দিল স্বামীর হাতে। মহানন্দে সবাই যোগ দিল ভোজে। আর তারপরই গ্রামবাসীর হাতে দারুণভাবে প্রহৃত এই রমণী মারা গেল। বাইংগাম গ্রামে ফিরে গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধল। সন্তান-সন্ততিতে ভরে উঠল তার ঘর। এরপর থেকে এই উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘ আর মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। পাবিদের বিশ্বাস যে এই বাইংগামের উত্তরপুরুষেরাই

বর্তমানে মুয়ালহলুনম নামে পরিচিত। তারা কখনো বাঘ হত্যা করে না আর বাঘও তাদের কোন ক্ষতি করে না।

পাবি ঃ একটি মেয়ের বাঘিনীতে রূপান্তরিত হবার কাহিনি

কোনও কালে এক বীর শিকারি তার গ্রামেরই অপরূপা এক কুমারীর প্রেমে পড়লে আত্মীয়স্বজনেরা তাদের বিয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দিনক্ষণ স্থির হবার পর উভয় মিলে প্রথাগতভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার নিদর্শনরূপে জুমক্ষেতে চাষের কাজে হাত লাগায়। ক্ষেতটি ছিল গ্রাম থেকে বেশ দূরে। সেদিন প্রচন্ড গরমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত মেয়েটি পাশের এক ঝর্ণায় যাবার অনুমতি চাইলে ছেলেটি তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু পিপাসায় কাতর মেয়েটির প্রাণ তখন প্রায় ওষ্ঠাগত। ছেলেটি তখন তাকে বলল যে সেখানে পরপর দুটি ঝর্ণা রয়েছে। প্রথমটির জল স্পর্শ করলে ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখা দেয় তাই মেয়েটিকে সে পরের ঝর্ণাটির দিকে যাবার কথা বলে সতর্ক করে দেয়। তেষ্টায় কাতর মেয়েটি আর দ্বিতীয়টির দিকে ছুটে যেতে পারেনি। প্রথমটির জলে পিপাসা মিটিয়ে সে দ্রুত জুমক্ষেতে ফিরে আসে। এর কিছুক্ষণ পরই তার মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে তার দেহে বাঘিনীর লক্ষণ জেগে উঠল। অসহায়ভাবে সে অনুভব করতে লাগল যে মানুষের মধ্যে ঘর করা তার পক্ষে অসম্ভব। সবাই তাকে পরিত্যাগ করবে। চোখের জলে প্রেমিককে ছেড়ে দ্রুত সে জঙ্গলে চলে গেল। বিষণ্ণ মনে গ্রামে ফিরে ছেলেটি এই খবর দিলে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এরপর থেকে গ্রামবাসীরা এই বাঘিনীর আহার যোগাতে থাকে। কিন্তু ক্রমে এই বাঘিনীর ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে গোটা গ্রাম এমনকী পাশের গ্রামগুলির গরু-মেষ-শূকর সব উজাড় হতে থাকল। অসহায় ও অতিষ্ঠ গ্রামবাসী এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে বসাল গ্রামসভা। গ্রাম প্রধান এই বাঘিনীকে হত্যার আদেশ জারি করল আর এই কাজে নেতৃত্ব দিতে নির্বাচিত হল একমাত্র দক্ষ শিকারি বাঘ-মানবীর প্রেমিক যুবকটি। এই সিদ্ধান্তকে ফিরিয়ে নিতে সে কান্নায় লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু গ্রামপ্রধানের অমোঘ নির্দেশকে কার্যকরী করতে সে যে বাধ্য। শেষপর্যন্ত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা নিয়েই সে তার প্রেয়সীকে হত্যা করে ঘরে ফিরে আর তাকে ঘিরে সমগ্র গ্রামজুড়ে চলে বিজয়োৎসব।

পাবি ঃ বাঘ-মানব ও তার প্রেয়সীর কথা

এককালে খুব সুন্দরী এক মেয়ে-সন্তান নিয়ে এক দম্পতির সুখের সংসার ছিল। একদিন গভীর রাতে তাদের চাং-ঘরের নীচে পোষা হৃষ্টপুষ্ট শূকরটাকে ধরতে এক বাঘ-মানব ঢুকে পড়ে। আতঙ্কে শূকরটি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে বাড়ির মালিক তাকে সম্বোধন করে বলল চুপ করতে নইলে তার মেয়ের বিয়ের ভোজের জন্য তাকে হত্যা করে ফেলবে। একথা শুনতে পেয়ে বাঘ-মানব গ্রামে ফিরে গেল। বাঘ-মানবটি ছিল তার গ্রামের প্রধান। একদিন সে অপরূপ মানববেশে দলবল নিয়ে এসে সুন্দরী মেয়েটিকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়। তার রাজকীয় সাজপোশাক আর সুঠাম দেহ দেখে ওই দম্পতি এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। মহা উল্লাসে মদ-মাংস দিয়ে বিয়ের ভোজ প্রস্তুত হল। কিন্তু যখন খাবার জন্য বর আর বরযাত্রীদের আমন্ত্রণ করা হল তখন তারা পেটের ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে সবিনয়ে তা প্রত্যাখান করল। গভীররাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন তাদের খুব ক্ষিদে পেল। তারা তখন তাদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য রাখা কাঁচা মাংসগুলি খেয়ে চারদিকে কিছু টুকরো ছড়িয়ে রাখল যাতে ঘুম ভেঙে এসব দেখলে সবাই ভাববে যে বিড়াল এসব কান্ড করেছে। কিন্তু সে সময় জেগে থাকা কনের এক বান্ধবীর নজরে সব ঘটনা পড়ে যায় এবং ভীষণ আতঙ্কে সে রাত পার করে। পরদিন ভোরে সে বান্ধবীর কাছে সব প্রকাশ করে দিলে ক্রমে সব জানাজানি হয়ে যায়। ক্রুদ্ধ হয়ে বাবা এই বরের হাতে মেয়ে তোলে দিতে অস্বীকার করে এবং তার বদলে দাসীকে দিতে চাইলে সে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ও গ্রামে ফিরে যায়। এদিকে গ্রামবাসীরা তাদের পালিত পশুগুলির উপর বাঘের হামলার ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং বাঘ-মানবটিকে ফিরিয়ে এনে এই মেয়েটির সঙ্গেই বিয়ে দিতে

তার বাবাকে বাধ্য করে। অনিচ্ছায় মেয়েটি স্বামীর অনুসরণ করলেও আভিজাত্যের গর্বে সে স্ত্রীকে অস্বীকার করে। নিরুপায় হয়ে মেয়েটি পথ থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কিছুদিন পর অপর এক গ্রামপ্রধানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বরের ঘরে যাবার পথে পড়ে বাঘ-মানবের গ্রাম। এই পথ পার হবার সময় তার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেবার জন্যে মিনতি জানালে নববধূটি বাঘ-মানবের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে না পেরে ভয়ে উপস্থিত হয়। বাঘ-মানবটি মেয়েটিকে কাতর মিনতি জানিয়ে বলে তার চুল দিয়ে ঝুঁটি বেঁধে দিতে এবং এই বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে আমৃত্যু সে এই ভালোবাসার স্মৃতিটি বহন করে যাবে। চতুর বধূটি ঝুঁটির মধ্যে অজ্ঞাতে একটি সাপের ডিম রেখে দিয়ে তার ঘর ছেড়ে স্বামীর বাড়ির পথে চলে যায়।

এদিকে সময় হলে বাঘ-মানবের মাথায় ডিম ফেটে বাচ্চা হয় এবং বিশাল আকৃতি নিয়ে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে জলাশয়ের দিকে দ্রুত ছুটতে থাকে কিন্তু সাপ-দানবের টানের দ্রুততায় সে জলাধারে আছড়ে পড়ে প্রাণ হারায়।

তথ্যাদি বলে যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মধ্যভারতের বিবিধ অঞ্চল, রাজপুতানা, উত্তর ভারত, বিহার, নেপাল ও বঙ্গ সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাঘপূজা ও বাঘকে কেন্দ্র করে নানাবিধ বিশ্বাস ও সংস্কার, কথা, ছড়া ও পাঁচালির ব্যাপক প্রসার ছিল যার স্মৃতি অবশেষ সাম্প্রতিক কালেও লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গে বহমান।

রাজপুতানার 'বাঘেল রাজপুত'রা প্রাচীন কোন ব্যাঘ্র-উপাসক সম্প্রদায়ের বংশধর কি না তা জানা না গেলেও ভিল সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের বাঘ-বংশজাত বলে মনে করে। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলে বাঘ-দেবতা 'বাঘেশ্বর' নিম্নশ্রেণির মধ্যে জনপ্রিয় পূজ্য দেবতা। বিহারে কিষাণদের মধ্যে কোথাও তার নাম 'বনরাজা', মধ্যপ্রদেশে হোসাঙ্গাবাদের বাঘ-পূজক কুন্ধুদের কাছে তিনি 'বাঘদেও'। এই পূজারীরা 'ভোমকা' নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্রই এককালে বাঘপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ত্রিচিনাপল্লীর গ্রামে বাঘের উপর আসীন তিনজন পুরুষের মূর্তিটি প্রাচীন কোন বাঘ-দেবতার অধিষ্ঠান বলে পন্ডিতদের অনুমান।[১১]

সাঁওতালদের মধ্যে বাঘপূজার প্রচলন রয়েছে এবং তারা বাঘের ছাল স্পর্শ করে পবিত্র শপথ গ্রহণ করে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে বাঘ হল তাদের টোটেমগুলির মধ্যে একটি প্রধান দেবতা।[১২]

গোন্ড উপজাতিদের বিয়েতে দুজন পুরুষ বাঘের বেশ পরিধান করে তার অনুকরণে একটি জ্যান্ত ছাগলছানাকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।[১৩]

Herbert Risley, F. Han প্রমুখ পন্ডিতেরা লক্ষ করেছেন যে, ওরাওঁদের মধ্যে বাঘ ও লুক্কা বা লাকরা নামে দুটি সম্প্রদায় রয়েছে যারা বাঘের দেহের কোন অংশই খায় না। বাঘ হল তাদের টোটেম দেবতা। যেভাবে বিভিন্ন টোটেমের অন্তর্গত যেমন- কয়্যা (বন্য কুকুর), চিগলা (শেয়াল), টিগা (ক্ষেত-ইঁদুর), খাখা (কাক), এক্কা (ব্যাঙ) প্রভৃতি তাদের পবিত্র প্রাণীদের হত্যা করেনা এবং খায় না। ছোটনাগপুর অঞ্চলের বিখ্যাত পশুপালক গোয়ালা সম্প্রদায়দের মধ্যে প্রায় ৩১টি টোটেম শ্রেণিভুক্ত শাখা-উপশাখা রয়েছে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — বাঘ, হরিণ, বাছুর, কোবরা, ইঁদুর, ক্ষেত-ইঁদুর, গাছের লাল পিঁপড়া, হাঁস, পদ্ম, তীর-ধনুক প্রভৃতি। ছোটনাগপুরের বাঘাল সম্প্রদায়েরও টোটেম হল বাঘ। এসব পবিত্র টোটেম দেবতারা কোন না কোন ভাবেই নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পুজিত হয়ে থাকেন।

সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের দুধরণের মাটির মূর্তি পূজিত হয়ে থাকে। একটি পূর্ণাঙ্গ দিব্যভাবমূর্তি আর অপরটি হল কান্ডবিহীন বারামূর্তি। বারা অর্থাৎ ধড়হীন মনুষ্যাকার মূর্তি আর মাথায় শূকরাকৃতি শিরস্ত্রাণ পরিহিত। সাধারণ লোকসমাজে বারামূর্তিটির পূজাই অধিক প্রচলিত। পূজাবিধি অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই বারাঠাকুরের কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। গবেষকদের অনেকের অনুমান এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও পরিণামে সমন্বয়ের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এই বারামূর্তি প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক অনন্য শিল্প নিদর্শন ও

আদিম নরবলি কিংবা নরমুন্ড শিকার প্রথারই স্মারক।[১৪]

ড. শীলা বসাক বন্যা, অতিবৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য 'বাঘরাই' ব্রত উদযাপনের কথা জানিয়েছেন। বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাঘাই পূজা বা বাঘাইর শিরনি ছাড়াও বাংলায় গাজির বাঁশ উঠান, গাজির বাঁশ বিয়া, দক্ষিণরায় বা কুলাই ঠাকুরের ব্রতও পালন করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পৌষ সংক্রান্তি ও ১ বৈশাখ সব গৃহস্থের ঘরেই দক্ষিণরায় (বারাঠাকুর বা বড়ঠাকুর)-এর পূজা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক ঝাঁপের সঙ্গে বনবিবি এবং দক্ষিণরায় একসঙ্গে পূজা পান। উত্তরবঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতা হলেন সোনারায়।[১৫]

ওড়িশার আদিবাসীদের বাঘ সম্পর্কিত অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে John Campbell জানান যে, এই অঞ্চলের 'খোন্ড' সম্প্রদায়ের মধ্যে জাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তাদের বিশ্বাস যে-ডাকিনীরা খুশি হলে ইচ্ছেমত তাদের বাঘে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা ধারণ করে। এধরনের বাঘকে বলা হয় 'পুল্টা বাঘ'। এজাতীয় বিশ্বাস নরম্যান্ডি বা ব্রিটানীর কৃষকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ওদেরও বিশ্বাস যে কোনো কোনো লোক জাদুবিদ্যায় পারদর্শী এবং অনায়াসে নিজেদের নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়। ওই সব অঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সময়ের একটি চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ তিনি প্রদান করেন যার মধ্যে জাদুবিদ্যার মূল রহস্যটি ফাঁস হয়ে যায়। Campbell লেখেন —"Whilst examining some magisterial cases, I observed a crowd approaching with two women in front, guarded by three or four armed men. In due time they were brought before me, and charged by a Beniah (one of a tribe of khonds inhabiting the slopes of mountains) with having transformed themselves into tigers, and killed and carried off his son.... to my surprise both women acknowledged that they had killed his son, and had power to transform themselves into tigers. Determined to undeceive the people as to the extraordinary belief, I told the women that I will release them on condition of their transforming themselves into tigers in my presence, which, to the horror of all, they agreed to do if taken to a neighbouring jungle. This I ordered to be done; when, seeing no mode of escape, they threw themselves on the ground, imploring mercy and pardon, and confessing the imposture. They stated that they were poor, and lived by imposing on the credulity of the villagers, who supplied them with food and clothing whenever they those to demand it, in order to secure themselves and cattle from their depredations in the form of a Pulta-Bag." [১৬]

বাঘাইর শিরনি বা বাঘপূজা উপলক্ষে মাঘ মাসের ১৩ তারিখ থেকে সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত সিলেট ও বরাক উপত্যকার গ্রামের ছেলেরা হাতে লাঠি নিয়ে দলবেঁধে পাড়ায় পাড়ায় লোকদের বাড়ি ভিক্ষা চেয়ে ছড়া বা পই, আঞ্চলিক ভাষায় আই (পংক্তি বা শ্লোক) বলতে বলতে মজার মজার নানা দোহাই পেড়ে গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে। টাকা-পয়সা-চাল ইত্যাদি পেলে বর দিয়ে অন্য বাড়িতে উপস্থিত হয়। অজস্র এসব মজাদার 'আই' ক'টির উল্লেখ করা যাক ঃ

১। ডেফলনী গো ডেফলনী
একটা ডেফল দিবে নি
হাইর ডরে, পুতর ডরে
ডেফল থৈল উগার তলে
বাঘে খাইল উগার ভাঙ্গি
ও বাঘ চুণ খা সাদা খা

বারগাম সিলট যা
বাঘবেটা লই থই
গোয়ালনী মারি খাইল দৈ
তেলি মারি মাখল তেল
তেই বাঘ বনে গেল
বনে গিয়া মাইল গাই
ই বাঘর নাম নাই।

২। আর বাঘ আর বাঘ
আর বাঘ আর বাঘ
আর বাঘ রঙ্গিয়া
কুইয়ার খায় ভাঙ্গিয়া;
আর বাঘ আর বাঘ
আর বাঘ তীর
ভাঙ্গিল বুড়ির শির;
আর বাঘ লাউপাতা
নিল গি বুড়ির ফারা কাথা;
আর বাঘ তেতই গাছ
নাটিল বুড়ির ভাজা মাছ;
আর বাঘ বসলাত
আগি দিল বুড়ির তসলাত
আর বাঘ বিয়াবাইল
পাছাত দুই ছিয়া গাইল
আর বাঘ বন
তার দুই বরণ
আর বাঘ পলো বায়
যত পায় তত খায়
আর বাঘ কুচিমুচি
খায় তার মাউগর..
আর বাঘ উছু বায়
সিংহে মাইলে পেন্‌পেনায়
আর বাঘর কপাল বেত
হরুতা পাইলে পেত পেত
আর বাঘর হাত ছুরি
বেড় ফাড়ি বাইর কৈল বুড়ি
আর বাঘর পেট বিষ
মোকদ্দমা ডিসমিস্
আর বাঘ পরফেসার

ঘণ্টায় ঘণ্টায় লেক্‌চার
আর বাঘ লক্ষীপুর
জিনিয়া আইন্‌ল চাম্পা ফুল
আর বাঘে গাইঞ্জা খায়
মানুষ দেখলে চউখ রাঙ্গায়
আর বাঘ অইন হউ
যে নিল তার পুতর বৌ
আর বাঘর কপালে চুণ
আঠারো বাঘর নাম শুন।।

৩। ঝন ঝন ঝন ঝনরে
এক টেকা পাইলাম রে
ভাগিনা বড় সদাগর
সুনার মাথায় ধর
লামার গাউর পুলাইন ইতা
আইলা কেন তনে
আমন ধানর তল তনে
আমন ধানর বড় পাতা
বাঘে নিছে বলদর মাথা
ও বাঘা পুত রে
বন বইয়া খাও রে
আলিত বইয়া চা রে
আমরা তরে দেখি রে।।

৪। আয় ওরে বাঘ রে
আলুম গুলুম ধন রে
গলায় তর সুনার মালা
দেখতে দেখতে চিকনা কালা
চিকন কালার পরাণে
দক্ষিণ দক্ষিণ চরণে
দক্ষিণরায়ে দিলা বর
ধানে চাউলে ঘর ভর।।

৫। গাও গাও রে ভাই দেবীর পাইঞ্চালী
বারগুণী ঝি-পূত লৈয়া লামিল বাঘুনী
বারগুণী ঝি-পুতের তেরগুণী নাম
আমনধানী গাও রে বাঘাইর নাম

আমরুতু জামরুত লামাইল বাণিয়া
আমার যত রাখাল ভাই যায় রে ভাসিয়া
বায় ভাসে আটেরে ভিখারীর ছাগল
তানে দেখি লক্ষীদেবী হৈলেন পাগল
অ এগো লক্ষীদেবী কি কাম কৈলে
মাঘ মাসেতে চাউল কড়ি মাগাইলে
মাঘ মাসেতে অরে টানর বেলা
লক্ষীদেবীরে মানত করলা দুধচাম্পা কলা
দুধচাম্পা কলা না রে মেলিল পাত
সুনা দিয়া বান্ধাই দিমু লক্ষীদেবীর হাত
দুধচাম্পা কলা না রে মেলিল থুর
সুনা দিয়া বান্ধাই দিমু লক্ষীদেবীর বুক
দুধচাম্পা কলা না রে মেলিল ঢেক
সুনা দিয়া বান্ধাই দিমু লক্ষীদেবীর ঠেঙ
দুধচাম্পা কলা না রে মেলিল কলা
সুনা দিয়া বান্ধাই দিমু লক্ষীদেবীর গলা ।

সাধারণত ব্রত উদযাপন করেন মেয়েরা কিন্তু বাঘব্রত প্রচলিত রয়েছে ছেলেদের মধ্যে বিশেষত রাখাল বালকদের মধ্যে। ব্রত ব্যাপারটিই আদিম ধারণাজাত বলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত। বাংলায় প্রচলিত কুলাইব্রতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি রাখালদের বাঘ সেজে অভিনয় করা এবং নানাধরনের ছড়া কাটার কথা বলেছেন। মূলত গরু-বাছুরদের বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে এ জাতীয় অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।[১৭]

সাঁওতাল, মুন্ডা ও কোল ভাষায় 'কুল' শব্দের অর্থ হল বাঘ। সুহৃদকুমার ভৌমিক দেখিয়েছেন অবলুপ্ত খেরোয়াল গোষ্ঠীর যে শাখাটির ছেলেরা রাখালের কাজ করত তারা 'কুলাই' ব্রত করত। এই রাখালের দল হিন্দুসমাজের 'জাতে' (caste) হারিয়ে গেছে, কিন্তু রয়ে গেছে 'কুলাইব্রত'।'[১৮]

ব্রতচারী মাত্রেই ব্রাত্য। ঋগ্বেদীয় আর্যরা ছিলেন যজ্ঞধর্মী; এদের বাইরে যারা ব্রতের গুহ্যশক্তি বা জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন তারা হয়ত ছিলেন 'ব্রাত্য' বা 'পতিত'-এ অনুমান নীহাররঞ্জন রায়ের।' স্মরণ করা যেতে পারে যে ব্রতের প্রচার ও প্রসার বিহার, বঙ্গ, ওড়িশা ও আসামেই সর্বাধিক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেন যে — "বাঙালি জাতির স্তর বিন্যাসের তৃতীয় স্তরে অন্ত্যজ সমাজ এবং বাঙালি লোক-সমাজের কাঠামোর শেষ ধাপে আদিবাসী সমাজ অবস্থান করছে। যে সমাজ পর্বতে, মাঠে, নদীতীরে, জঙ্গলে এবং জনবহুল নাগরিকসমাজ থেকে বহুদূরে বসবাস করছে।"[২০]

মহাভারতে জেনেছি লোকেরা পশু-পক্ষীর মুখোশ পরত। আবার Joseph Campbell দেখিয়েছেন "এস্যিরীয় প্রাসাদগুলিতে পশুদেহে মানুষের মাথা, সিংহের শরীর, ঈগলের ডানা, বলদের পা এই চার রকমের রাশি চিহ্ন চারদিকের প্রহরীরূপে বিরাজমান। এরা হল শূন্য সময়ের আচ্ছাদন।"[২১]

বাঘ ও বিবিধ পশু-পক্ষীর মুখোশ ধারণ করে নৃত্যের প্রচলন বিশ্বব্যাপী বর্তমান। বরাক উপত্যকার লোকসমাজে কিংবা উত্তরপূর্বের আদিবাসীদের মধ্যেও এর পরিচয় রয়েছে। বাংলার ছৌ-নাচ এর একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। বাঘ-মানবেরা আসলে যে এমনি মুখোশধারী মানবমাত্র এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১. The Nagas in the Nineteenth Century: Elwin, p. 510-11. ১.
২. কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত 'মহাভারত', আদিপর্ব, পৃ. ১৭৩। ২.
৩. তদেব, বনপর্ব, পৃ. ৫৫৮।
৪. তদেব, কর্ণপর্ব, পৃ.৪১১।
৫. তদেব, শল্যপর্ব, পৃ. ৫০২-৫০৩।
৬. Suniti Kumar Chatterjii: Kiratajana kriti, p. 180-182.
৭. The Gods of Northern Buddhism (Alice Getty)
৮. Harrell and Yongxiang 2003, p. 380)
৯. C. Gilhodes: The Kachins Religion and Customs, New Delhi, Reproduced, 1995, pp. 141, 178-79.
১০. A. W. Davis, in Census of India, 1891, Assam, Vol.1,pp. 250-1. The NAGAS in the Nineteenth Century: VERRIER ELWIN, Oxford University Press, 1969; p.622.
১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস', অষ্টম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৯২২-২৪।
১২. J.G. Frazer: Marriage and Worship in the Early Societies- A Treaties on Totem and Exogamy., Vol. 1, p. 23.
১৩. Dalton: Descriptive Ethnology of Bengal, p. 280.
১৪. Major General John Campbell: Human Sacrifices in India, Delhi, 1986; p. 29.
১৫. ড. শীলা বসাক। বাংলার ব্রতপার্বণ, পৃ. ২৬-২৭।
১৬. Major General John Campbell: Human Sacrifices in India, Delhi, 1986; p. 44-46.
১৭. 'লোকশ্রুতি', দ্বাদশ সংখ্যা, ১৪০২, পৃ. ১৫৩-১৫৪।
১৮. সুহৃদকুমার ভৌমিক: বাঙালির সংস্কৃতি ও আদিবাসী ঐতিহ্য, 'লোকশ্রুতি', দ্বাদশ সংখ্যা, ১৪০২, পৃ. ১৫৩।
১৯. নীহাররঞ্জন রায় বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৮৩-৪৮৪।
২০. Suniti Kumar Chatterjii: Kiratajana kriti, p. 20.
২১. খালিকুজ্জামান অনূদিত 'জোসেফ ক্যাম্পবেল ঃ মিথের শক্তি বিল ময়ার্সের সঙ্গে কথোপকথন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪৬।

গাজিনৃত্য : বরাক উপত্যকার এক অনুপম লোকশিল্পকলা

কামালুদ্দীন আহমেদ

উপক্রমণিকা : লোকনৃত্য নিঃসন্দেহে একটি অভিকরণমূলক শিল্পকলা এবং ভারতীয় শিল্পকলা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। বরাক উপত্যকার গ্রামীণ নৃত্যকলায় এ তিনটি শ্রেণিরই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য — গ্রামীণ নৃত্যকলা' গ্রন্থে এ উপত্যকায় প্রচলিত লোকনৃত্যকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন — (১) নির্দিষ্ট কর্মভিত্তিক গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নৃত্য, (২) সামাজিক দলবদ্ধ নৃত্য এবং (৩) ব্যবসায়িক নৃত্য। তিনি আবার সামাজিক দলবদ্ধ নৃত্যের মধ্যে তিনটি উপশ্রেণির সন্ধান পেয়েছেন — (১) লৌকিক, (২) ধর্মীয় এবং (৩) ব্যবহারিক।[১] গাজির গান অভিধায় বরাক উপত্যকায় সমধিক পরিচিত নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত অভিকর্ম এমন একটি একক বা দ্বৈত নৃত্য যাতে সামাজিক নৃত্যের উপবিভাগের সকল লক্ষণগুলিই সুস্পষ্ট। একজন ব্যক্তি বা দুজন ব্যক্তি কয়েকজন গায়ক ও বাদক পরিবেষ্টিত হয়ে নৃত্যটি প্রদর্শন করেন। সাধারণত বরাক উপত্যকার মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃষক শ্রেণিভুক্ত 'মাইমাল' নামক একটি সামাজিক উপশ্রেণির লোকেরাই এ নৃত্যের পরিবেশক এবং উপভোক্তা। মৎস্য শিকার এবং মৎস্য বিক্রি এই উপশ্রেণির লোকদের জীবিকা নির্বাহের প্রধানতম অবলম্বন।

সামাজিক পটভূমি : বরাক উপত্যকার বাঙালি হিন্দুদের ধর্মাচরণে কিছু কিছু আঞ্চলিক উপাদান থাকলেও মূলত তা সর্বভারতীয় হিন্দু সমাজে আচরিত ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই অঙ্গীভূত। আবার উপত্যকার মুসলমানরা অন্যান্য ভারতীয় মুসলমানদের মত ইসলামধর্মের পালনীয় আচার-আচরণের অনুশীলন করে থাকেন। কাজেই ইসলাম নির্দেশিত পথেই তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণ অভিজ্ঞতার আলোকেই দেখা যায়, ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক বিবর্তনে এবং সামাজিক প্রকৃতি গঠনে দুটি উপাদান অত্যন্ত সক্রিয়— একটি ধর্মজ যার উৎপত্তি স্থল ভারত বহির্ভূত হলেও মৌলিক আবেদন বিশ্বজনীন বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ, অপরটি দেশজ যা এদেশের জলহাওয়ায় সৃষ্ট, লালিত, ঐতিহ্য চেতনায় উদ্দীপ্ত এবং যার দীর্ঘমূল এদেশের পেলব মাটির গভীরে প্রোথিত। এ সত্যটি অবশ্য রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক সচেতন মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটিই হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয় অবস্থান থেকে ধর্মান্তরিত বলে তাদের আচার-আচরণে কিছু ব্যতিক্রমের লক্ষণ সহজেই দৃষ্ট হয়। এ ব্যতিক্রম থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটি যেন কোন সচেতন প্রয়াসজাত নয়, বরং একটা প্রয়োজনীয় বন্ধন। তাদের সামাজিক ব্যবহারে ইসলামের মৌলিক তত্ত্বেরও কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট। ইসলাম সামাজিক সমতা এবং জাতিভেদহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা ভারতীয় ঐতিহ্যগত কঠোর বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথায় উদ্ভুত বর্ণবৈষম্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে মুসলিম জাতিভেদ প্রথা তুর্ক-আফগান ও মোগল আমলের ভূমি ব্যবস্থায় উদ্ভুত সামন্ত প্রথার

উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইসলামি রীতিনীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে শ্রেণিবিন্যাসটি জন্মভিত্তিক না হয়ে সামন্ত প্রথার অনুষঙ্গ হিসেবে বিত্ত-ভিত্তিক হয়েছিল। এছাড়া মুসলমান সমাজে বিত্ত-ভিত্তিক জাতিভেদ প্রথার প্রচলন হলেও অস্পৃশ্যতার উদ্রেক ঘটেনি। কিন্তু সামাজিক জলচলে বিশেষ করে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কঠোরতা অবলম্বন করার রীতি প্রচলিত আছে। অবশ্য বর্তমানে এ জাতীয় সামাজিক ব্যবস্থার শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। বরাক উপত্যকার মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ সর্বভারতীয় ইতিহাস প্রক্রিয়ার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। বরাক উপত্যকার কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলাদ্বয়ের অন্তর্গত অঞ্চলসমূহ যদিও ইতিহাসের কোন পর্যায়েই বাংলার সুলতান বা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তথাপি এখানকার মুসলমানদের সামাজিক চালচলনে এই সর্বভারতীয় সমাজ সংগঠনের রীতিটি অনুসৃত হয়েছে।

বরাক উপত্যকার মুসলমানদের সামাজিক বিন্যাসে মাইমাল অভিধাযুক্ত একশ্রেণির লোক আছেন যাদের বংশগত পেশা মৎস্য শিকার ও বিক্রয়। মুসলমানদের সামাজিক বিভাজনে তারা নিম্নবর্গীয় বলে চিহ্নিত, এমনকী বরাক উপত্যকার মুসলমান কৃষিজীবী সমাজেও তারা প্রান্তিকায়িত। উপত্যকার মুসলিম জনসাধারণের প্রায় এক চতুর্থাংশই এই শ্রেণিভুক্ত জনসাধারণ। তারা বরাকের বিভিন্ন নদ-নদী, বিল ও হাওরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করেন। এই শ্রেণিভুক্ত মুসলমানরাই মূলত গাজিনৃত্য নামক লোকনৃত্যের ধারক, বাহক এবং উপভোক্তা।

গুরুসদয় দত্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '***দি ফক ড্যান্সেস অব বেঙ্গল***' এবং মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য তাঁর '***বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য — গ্রামীণ নৃত্যকলা***'[২] গ্রন্থে গাজিনৃত্যের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই নৃত্যকলার পেছনে যে একটি তত্ত্বের ব্যাপার আছে তা গাজিনৃত্য পরিবেশকরাই বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে বহন করে চলেছেন। এছাড়া তাল, মাত্রা, লয় এবং মুদ্রা প্রভৃতি নৃত্যের কলা কৌশলগুলিও পরম্পরাগতভাবে পরিবেশকরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পারিবারিক ঐতিহ্যরূপে বহন করে চলেন। এই নৃত্যটির জন্য পৃথক কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না।

গাজিতত্ত্ব : মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচারে কোন নতুন বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী ব্যাপার। কিন্তু বরাক উপত্যকার 'মাইমাল' সহ কৃষিজীবী সমাজের নিম্নবর্গীয় মুসলমানরা তাদের ধর্মবিশ্বাসে '***গাজি*** নামক এক লোকদেবতার কল্পনা করেন যা ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। ইসলামি পরিভাষায় *গাজি* অর্থ জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী। গাজি নামক এই লোকদেবতার উদ্ভব ইসলামি পরিভাষার গাজি থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত নয়। প্রচলিত কাহিনি মতে গাজি সিকন্দর নামক এক রাজার পুত্র। তাঁর মাতা অজুফা বালি নামক এক হিন্দু রাজার কন্যা। অর্থাৎ তাঁর জন্ম বৃত্তান্তের কল্পনার সঙ্গে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয় সাধনের একটা সহজ প্রয়াস বিদ্যমান। কালু নামে তাঁর এক ভাইও আছে। তাঁর সকল কর্মে কালু দোসর। চম্পাবতী নামে এক ব্রাহ্মক্ষ্মণ কন্যা তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত। তিনি অলৌকিক শক্তিবলে সে ব্রাহ্মক্ষ্মণ কন্যার শয়নকক্ষেও যেতে পারেন। এভাবে তিনি এক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। কালিদহ (স্থানীয় উচ্চারণে কালিদর) সাগর তীরে সুন্দরবনে তাঁর পিতৃরাজ্যে তাঁর জন্ম এবং সেখানেই তাঁর আসন অর্থাৎ বসবাসের মূল ঠিকানা। তিনি অমর, অজর এবং দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে সর্বত্র বিরাজমান। যেখানে তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, শিক্ষা ও উপদেশাবলী জনগণের মধ্যে প্রচারের অনুষ্ঠান হয় সেখানে তিনি দৈববলে উপস্থিত হন, অবশ্য অদৃশ্য অবয়বে। তাঁর নামে ***সিরনি*** উৎসর্গ করে তাঁর শিক্ষা ও উপদেশ জনসাধারণ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং আয়োজকদের কোন মনস্কামনা থাকলে তা পূর্ণ করেন। তিনি এত ক্ষমতাশালী যে, সন্তুষ্ট হলে বন্ধ্যা রমণীকেও সন্তান ধারণের ক্ষমতা দান করতে পারেন। বরাক উপত্যকার প্রান্তিকায়িত মাইমাল শ্রেণির সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করেন — *জিন্দাপির* (অমর তাপস) গাজি ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন এবং অত্যন্ত সৎ সহজ সরল জীবন যাপন করেন। তিনি তাঁর ঈশ্বর ভক্তি, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিত্বের জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই সমভাবে জনপ্রিয়। তিনি এই প্রান্তিকায়িত মুসলমান শ্রেণিকে ধর্ম ও সমাজ জীবন পরিচালনার সুষ্ঠু শিক্ষা দান করেন। তিনি আবার স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে রক্ষণশীল হিন্দু

সম্প্রদায়ের লোকেরও একজন প্রকৃত বন্ধু তিনি হিন্দু রক্ষণশীল ব্যক্তিগণকেও তাদের জীবন সুষ্ঠু এবং ধর্মসম্মতভাবে পরিচালনা করার উপদেশ দেন। তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে স্ত্রীলোক, গৃহবধূ এবং ধর্মশীলা বধূদের ব্যবহারিক জীবন নির্বাহের অনুশীলনের উপদেশ দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন ধর্মপ্রাণা গৃহবধূদের অবদানেই একটি ভাল পারিবারিক জীবন পরিচালিত হয়। গোয়ালাদের প্রতিও গাজি তাঁর বিশেষ উপদেশ ও আশীর্বাদ দান করে থাকেন। কারণ তারা গো-পালন ও গোচারণের মত পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন। গাজির শিক্ষা এবং উপদেশাবলী নৃত্য সহযোগে গানে গানে প্রচারিত হয়। তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী শিক্ষামূলক এবং সুস্থ ও সুসমঞ্জস সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠার আদর্শে উদ্দীপ্ত।

গাজিনৃত্যের বিন্যাস ব্যবস্থা : গাজির জন্মবৃত্তান্ত, শিক্ষা, উপদেশ, অলৌকিক কার্যকলাপ প্রভৃতি নৃত্য সহযোগে গানে এবং কথায় আগ্রহী শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে পরিবেশন করার জন্য 'মাইমাল' শ্রেণির লোকদের মধ্যেই দল গঠিত হয়। দলের প্রধানকে খলিফা বলা হয়। খলিফাই গাজিনৃত্যের মূল ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে থাকেন সহশিল্পীরা যারা একাধারে দোহার এবং বায়েন। খলিফা গাজির জন্মবৃত্তান্ত, শিক্ষা, উপদেশ, অলৌকিক কার্যকলাপ প্রভৃতি নৃত্য সহযোগে গানে এবং কথায় পরিবেশন করেন এবং বায়েনরা ধুয়ো দেন। খলিফা এই আরবি শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। আবার শিল্পকলা এবং কারুশিল্পে নিপুণ ব্যক্তিকেও খলিফা বলা হয়। বরাক উপত্যকায় গাজিনৃত্য পরিবেশনের জন্য গঠিত দলের নেতাকে খলিফা অভিধা দানের মধ্যে দুটি তাৎপর্য নিহিত আছে। একে তিনি গাজির প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর উপদেশ এবং শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন, অপরদিকে নাচে-গানে তিনি খুবই দক্ষ। কাজেই গাজিনৃত্যের খলিফা মাইমাল সমাজে একজন মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি। আবার খলিফারা সাধারণত বংশগতভাবেই এ অধিকার প্রাপ্ত হন এবং তাই খলিফা জন্মদাতা পরিবারগুলির একটা আলাদা সামাজিক মর্যাদা এখনও অবশিষ্ট আছে।

গাজিনৃত্য দু'ভাবে পরিবেশন করা যায়: একজন গাজির ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং সঙ্গে তাঁর দুজন খলিফা থাকেন; আর গাজি ছাড়াই শুধু একজন খলিফা থাকেন। উভয় ক্ষেত্রেই বায়েন বা বাদ্যকারের সংখ্যা সমান থাকে। গাজির ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন তাঁকে খুব মর্যাদাব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সৌম্যদর্শন মৌলবির চেহারা বিশিষ্ট হতে হবে। তাঁর মাথায় শিখাবিহীন ফেজ টুপি, কাঁধে ঝুলন্ত একখণ্ড পাটকরা বস্ত্র, হাতে তালপাতা অথবা ময়ূরপুচ্ছ বা পালকের তৈরি পাখা। তিনি মাঝে মাঝে শ্রোতা-দর্শকদের কাছে গিয়ে পাখা সঞ্চালন করে কুপ্রবৃত্তি দূর করে দেন। সম্পূর্ণ গাজিনৃত্য প্রদর্শনে গাজি ছাড়াও দুজন খলিফা থাকেন। একজন খলিফা বিচিত্র বর্ণের পোশাক পরিধান করেন। তিনি চমরি গরুর লোম দ্বারা তৈরি চামর নামক একটি বুরুশ বা পাখা একহাতে ধারণ করেন এবং আরেক হাতে ধারণ করেন একটি লাঠি। লাঠির মাথাটা পিতলে মোড়া এবং তাতে চন্দ্র-সূর্য-তারকা খচিত। তাঁর গলায় তসবিহ, কব্জিতে হাতকড়া এবং পায়ে নূপুর। কিন্তু মস্তক অনাবৃত। তিনি মাঝে মাঝে দর্শক-শ্রোতাদের গায়ে বুরুশের আলতো স্পর্শ দান করেন। অপর খলিফা ওঝানৃত্য পরিবেশকের মত একটা ঘাগরা পরিধান করেন। তিনি ফুলহাতা লম্বা কুর্তার উপর একটি ওয়াচকোট পরিধান করেন। তার মাথায় ফেজটুপি বা পাগড়ি থাকে। দুহাতে দুটি রুমাল বাঁধা থাকে যা দিয়ে তিনি নৃত্যের বৃত্ত নির্মাণ করেন।

বায়েন বা বাদকরা নৃত্যাঙ্গন বা মঞ্চের এক পাশে বসে থাকেন। তারা সংখ্যায় পাঁচজন। এরা ঢোলক এবং বাদ্যযন্ত্র বাজান। তাদের একজন অবশ্য ঢাকও বাজান।

নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হয় অনেকটা ধর্মীয় আবেগে উদ্বুদ্ধ আচার সহযোগে মোমবাতি, আগরবাতি, ধূপদান, কলা, গুড়, গামছা, রুমাল, আতর, নকুল, বাতাসা প্রভৃতি উনিশটি উপচার সহযোগে নৈবেদ্য সাজিয়ে। গাজির ভূমিকায় অভিনয়কারী এবং বায়েন সহ খলিফারা পশ্চিমমুখী হয়ে বসে গাজির উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য তাঁদের সামনে রাখেন।

প্রথমেই একজন খলিফা আল্লাহ ও রসুলের প্রশস্তিমূলক গান গাইতে আরম্ভ করেন—

আল্লাহ আল্লাহ বলো ভাই রসুল বলো মুখে
ছাড়িও দুনিয়ার ধান্দা বেস্ত যাইবার সুখে
আল্লার নাম লও ভাই বদন ভরিয়া একবার।

সঙ্গে সঙ্গে বায়েনরা বাদ্যের ঝংকার তুলে ধুয়ো দিতে থাকেন- আল্লার নাম লও ভাই বদন ভরিয়া একবার। তারপর খলিফা দাঁড়িয়ে যান এবং ঘুরে ঘুরে নৃত্য সহযোগে দিক-বন্দনা করতে থাকেন। প্রশস্তি অংশে দিক বন্দনার সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিও থাকে—

পূর্বেতে বন্দনা গাইলাম পূর্ব উদয়ভানু
রাধিকার অঞ্চলো ধরি বিদায় মাঙ্গইন কানু।
উত্তরে বন্দিয়া গাইলাম উত্তর সিংহাসন
ঊনকোটি দেবগণে পাতিছইন আসন।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাইলাম মক্কা বানস্থান
যেই জাগাতে পয়দা অইছন কিতাব আর কোরাণ।
দক্ষিণে বন্দিয়া গাইলাম কালিদর সাগর
পদ্মার বিবাদে চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা তল।
আও গো সরস্বতী কণ্ঠে কর ভর
জানি কি না জানি মা গো কালাম জুআও মোর।
শুনগো সরস্বতী মাই বলি যে তোমারে
কামাখ্যার দোহাই দিয়া ডাকিয়া ফিরি তোরে।।

বন্দনার পরই গাজির জন্মবৃত্তান্ত, তাঁর মনুষ্য সেবার কাহিনি, ধর্মবিজয় কাহিনি, অলৌকিক গুণাবলীর উদাহরণ বর্ণিত হয় কথকতার ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝে একঘেয়েমি কাটাবার জন্য খলিফা নৃত্য সহযোগে গেয়ে ওঠেন :

এইসব ধেইসব কথা অন্তর করি থইয়া
গৌর বাদশার কথা এবে শোন মন দিয়া।।

সঙ্গে সঙ্গে বায়েনরা বাদ্যযন্ত্রে ঝংকার তুলে ধুয়ো দিতে থাকেন— 'আরে শোন মন দিয়া'।

অথবা কোন গুঢ়তত্ত্বমূলক কথাও গানে গানে পরিবেশন করে থাকেন—

ভাইরে কেউ বলে আল্লা আল্লা কেউ বলে হরি
কেউরর বাপর জুলা নায়রে একই নামে তরি
আল্লার নাম লও ভাই বদন ভরিয়া একবার

দোহাররা ধুয়ো তোলেন — আল্লার নাম লও ভাই বদন ভরিয়া একবার।

গাজিনৃত্য দুটি উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হয়- (১) মানত বা মনস্কামনা পরিপূর্ণতায় প্রতিশ্রুত গাজির সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে এবং (২) নিছক বিনোদনের জন্য। নৃত্য যখন মানসিক হয় তখন নৃত্যের আয়োজক গৃহকর্তা, কর্ত্রী, গাজি ও খলিফার ভূমিকায় অভিনয়রত ব্যক্তিরা এবং বায়েনরা নিরম্বু উপবাস থাকেন। অবশ্য কাহিনির অগ্রগতিতে গাজি এবং তাঁর ভাই কালু যখন এক দরিদ্র কাঠুরের কাছ থেকে আহার্য ভিক্ষা করে ভক্ষণ করার বিবরণ বর্ণিত হয়, তখন সবাই আহার করেন। কিন্তু বিনোদনের জন্য আয়োজিত গাজিনৃত্যের অনুষ্ঠানে এরূপ কোন আচার পালনের বিধিনিষেধ থাকে না। তখন গাজিনৃত্যের উপজীব্য কাহিনিটি গাজির বৃত্তান্ত নাও হতে পারে। কারণ ছয়ফুল মূলকবদিউজজামাল, তাজুলমূলক, গুলেবাকওয়ালি, মিলনপরি, নুরপরি প্রভৃতি আরও চল্লিশটি কাহিনি আছে যা

নাচে-গানে-কথায় পরিবেশিত এবং গাজির গান বা নৃত্য অভিধায় ভূষিত। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনি হল গাজি। ধর্মবিজয়ের সঙ্গে ধর্মসমন্বয়, অলৌকিক কাহিনির সঙ্গে মানবিক প্রেম প্রীতি, কৃষ্ণসাধনের সঙ্গে রাজোচিত ঐশ্বর্যের আধিক্য প্রভৃতি মিলে কাহিনিকে এক অনন্যতা দান করেছে। তবে কাহিনি যাই হোক না কেন নৃত্যানুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্বের প্রশস্তিভাগের কোন রকমফের ঘটে না।

আজকাল অবশ্য গাজিনৃত্য পরিবেশনে মাত্র একজন খলিফাই থাকেন। ঘাগরা পরা খলিফাই একক নৃত্য পরিবেশন করেন, গাজির কাহিনি বর্ণনা করেন, তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী গানে এবং কথায় বিবৃত করেন। গাজি থাকেন অদৃশ্য এবং অপর খলিফা অনুপস্থিত। যেসব শিল্পী গাজিনৃত্য পরিবেশন করেন এ ব্যাপারে তাঁদের একটা ব্যাখ্যাও আছে। তাঁদের মতে একজন খলিফাই যথেষ্ট, দ্বিতীয়জন অতিরিক্ত বিধায় অপ্রয়োজনীয়। আর গাজি তো এক অদৃশ্য শক্তি। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁকে দৃষ্টিগোচর করার জন্য প্রতীকের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। এছাড়া গাজি যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অমর ব্যক্তি তাঁর ভূমিকায় কোন মরণশীল মানুষের অবতীর্ণ হওয়াও উচিত নয়। মরণশীল সংসারী মানুষ যতই ধর্মনিষ্ঠ হোন না কেন, তিনি তো গাজির সমকক্ষ হতে পারেন না। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এর মূলে ক্রিয়াশীল বলে মনে করাটা শুধুই অনুমান নির্ভর নয়।

গাজিনৃত্যের কলাকৌশল, বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য : বস্তুতপক্ষে গাজিনৃত্য গান ও নাচের সমন্বিত অনুষ্ঠান। ঘাগরাপরা খলিফাই একই সঙ্গে নাচ ও গান উভয়ই পরিবেশন করে থাকেন। তিনি দুহাতে দুটি রুমাল বেঁধে অথবা শুধু ডানহাতে একটা রুমাল বেঁধে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। এভাবে নৃত্য পরিবেশনে খলিফার নৃত্যভঙ্গির মধ্যে অভিনয়ের ভাবভঙ্গিও সহজে দৃষ্ট হয়। গাজির শিক্ষা ও উপদেশাবলী জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং তাদের কাছে মনোগ্রাহী করার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় শিল্পকলার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গচলন, মুদ্রা, পদচলন এমনকী রুমাল সঞ্চালন সবকিছুর মধ্যেই তাল, লয় ও মুদ্রার লক্ষণ সুস্পষ্ট। খলিফা শরীরের কোন কোন অংশ, বিশেষ করে নিতম্ব সহ কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত নিম্নাংশ এমনভাবে ছন্দের তালে তালে দুলিয়ে থাকেন যে, এরকম দেহক্রিয়া এতদঞ্চলের অন্য কোন নৃত্যে পাওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছেন 'মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য্য'।' পদচলন খুবই সহজ এবং ছন্দায়িত ভঙ্গিতে স্বচ্ছন্দ। অভিনয় ভঙ্গি এবং শৈলী মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত এতদঞ্চলে প্রচলিত ওঝানৃত্যের আঙ্গিক এবং চলনধর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সূচনায় পরিবেশিত ধামাইল নৃত্যের অনুরূপ।

গাজিনৃত্যের প্রবর্তনা এবং উদ্দেশ্য লক্ষ করলে এটাকে গুরুসদয় দত্ত কৃত লোকনৃত্যের একাদশ বিভাগের শিক্ষামূলক উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গুরুসদয় দত্ত তাঁর বাংলার লোকনৃত্য (Folk Dances of Bengal) গ্রন্থে বাংলার লোকনৃত্যকে বিষয়বস্তু ও প্রবর্তনার বিভিন্নতার জন্য একাদশভাগে বিভক্ত করেছেন।[৩] গাজিনৃত্যকে এই বিভাজনে শিক্ষামূলক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ গাজিনৃত্যের সঙ্গে পরিবেশিত গান এবং কথার বিষয়বস্তু নির্মাণ করে গাজি নামক ঐশী পুরুষের উপদেশ এবং শিক্ষা। এছাড়া এ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গানগুলির প্রবর্তনা ও লক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং এক অখণ্ড মানবসমাজ গঠনের বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। তাই এ বিশ্বায়নের যুগেও এগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। গাজির গানের একটি পংক্তি এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখযোগ্য :

আল্লা আল্লা বল ভাই হরি মুখে বল,
ভেদভাও ছাড়ি ভাই সব এক সাথে চল।

গাজিনৃত্যে পরিবেশিত গাজির জন্মবৃত্তান্ত এবং তাঁর অলৌকিক কর্মপ্রবর্তনার কাহিনি প্রমাণ করে যে, গাজির উৎপত্তি স্থান বরাক উপত্যকা নয়। তাঁর জন্মভূমি, কর্মভূমি এবং নর্মভূমির সঙ্গে সুন্দরবনের নামটি অভিন্নভাবেই সম্পৃক্ত। কাজেই গাজিকাহিনির উৎপত্তিস্থল সুন্দরবন বলেই মনে হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ রাঢ় ও সুন্দরবন অঞ্চলে বরখাঁ গাজি নামক এক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে অনেক গাঁথা, পদ্য এবং

ছড়া রচিত হয়েছে। গাজিকাহিনির সঙ্গে বরখাঁ গাজির সম্পর্ক থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। সুন্দরবনে দক্ষিণরায় হিন্দুদের লোকদেবতা হলেও মুসলমানদের জিন্দাপির (অমর সাধু) গাজি। আব্দুল গফুর রচিত বলে কথিত এবং আব্দুল আজিজ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিখ্যাত বিশালাকার লোকগাঁথার নাম *'গাজি কালু চম্পাবতী'*। সপ্তদশ শতাব্দীর রচিত এই গাঁথাটি বরাক উপত্যকা সহ সমস্ত বাংলার লোকসমাজে খুবই জনপ্রিয়। গাজিনৃত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাহিনিটির মধ্যে এই লোকগাঁথার বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, বরাক উপত্যকা ভূপ্রকৃতিগতভাবে বঙ্গ সমভূমির পূর্বপ্রান্তিক সম্প্রসারণই নয়, বঙ্গ সংস্কৃতি ভূগোলেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাঢ়, সুন্দরবন এবং বরাক উপত্যকায় একই সঙ্গে গাজি লোকবিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে গাজিনৃত্য পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল বর্ণিত লোকদেবী মনসা বা বিষহরির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পরিবেশিত ওঝানৃত্যের একটা মুসলমানি সংস্করণ বলেই মনে হয়।

বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ গাজিনৃত্য। লোকসংস্কৃতি বলতে লোকসমাজের সংস্কৃতিই বোঝায়। মানব সমাজের একটি অংশকে লোকসমাজ বলে চিহ্নিত করা হয় বলে লোকসংস্কৃতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা নেই যা সমাজের অর্থনীতির কাছে দায়বদ্ধ নয়। মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে কৃষিকার্যের আবিষ্কার অনুরূপ একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এই ঘটনার ফলে মানবসমাজে কৃষিভিত্তিক এবং নাগরিক সমাজের উদ্ভব ঘটেছে। আজকাল নাগরিক শব্দটি রাষ্ট্রের সকল মানুষের পরিচয়ের সূচক। তাই সমাজের একটি অংশকে নাগরিক সমাজ না বলে নগর সমাজ বলাই যুক্তিযুক্ত। কৃষিভিত্তিক সমাজ, কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকা নির্ভর সংহত জনগোষ্ঠী, তারা ভৌগোলিক সান্নিধ্যে এবং জীবিকার বন্ধনে পরস্পর দৈনন্দিন আদান প্রদানের শরিকই শুধু নয়, বরং অনেকটা নির্ভরশীল। এই সমাজকেই সাধারণত লোকসমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। এদের আচার-আচরণ, জীবনচর্যা, সাহিত্য, শিল্প ও ললিতকলার ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলন এবং স্বাভাবিক পারঙ্গমতা লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। বরাক উপত্যকার মানুষের মধ্যে এই লোকসমাজের মানুষই সংখ্যাধিক্য। এই লোকসমাজের একটি শ্রেণির লোকেরা যখন গাজিনৃত্যের উদ্ভাবক এবং এর ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলনে এবং পরিবেশনে স্বাভাবিক পারঙ্গমতা প্রদর্শন করে থাকে, তাই এ নৃত্যটি উপত্যকার লোকশিল্পকলার এক অনুপম উদাহরণরূপে চিহ্নিত করাটা অসঙ্গত নয়।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে এই শিল্পকলাটি অবক্ষয়ের শিকার। অবশ্য সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে গাজিনৃত্যের জনপ্রিয়তা কমতে আরম্ভ করেছে বেশ আগে থেকেই। সামাজিক কারণটি ভূ-বাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমান বরাক উপত্যকা ব্রিটিশযুগের সুরমা উপত্যকার খণ্ডিতাংশ। বর্তমান বরাক উপত্যকা এবং বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ নিয়ে গঠিত ছিল সুরমা উপত্যকা। সুরমা উপত্যকার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ বর্তমান বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলা ও বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ নিয়ে গঠিত ছিল সে সময়ের সিলেট জেলা। এই জেলাটি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন ছিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী সে অঞ্চলে ভূমির মালিক ছিলেন জমিদার এবং মিরাসদার। গাজিনৃত্যের সংগঠক, পরিবেশক এবং রসভোক্তা যে শ্রেণিভুক্ত ছিলেন, সে শ্রেণিটি কোন না কোন জমিদার বা মিরাসদারের প্রজা ছিলেন। ভূস্বামী বা জমিদার বা মিরাসদাররা এ শ্রেণির হতভাগ্য মানুষদের উপর বিভিন্নভাবে শোষণ চালাতেন। তবে মাঝে মাঝে গাজিনৃত্য জাতীয় বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। অবশ্য এটা তাদের বদান্যতা বা উদারতা ছিল না, এর মধ্যেও তাদের ন্যস্তস্বার্থ সম্পৃক্ত ছিল। জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত হওয়ার ফলে এই সুযোগটি বন্ধ হয়ে গেছে।

ধর্মীয় পুনর্জাগরণের প্রভাবে গাজিনৃত্যের পৃষ্ঠপোষক, রসভোক্তা এবং পরিবেশকদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের লক্ষণ খুবই স্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছে। এ জাতীয় দ্বন্দ্বের বশবর্তী হয়ে অনেক পৃষ্ঠপোষক আর গাজি নৃত্যানুষ্ঠানে সহায়তা করেন না, অনেক রসগ্রাহী আর গাজিনৃত্যের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন না এবং অনেক শিল্পী তাঁদের বংশ

পরম্পরাগত পেশাটির প্রতি আগ্রহ বোধ করেন না। সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে গাজিনৃত্য যখন এভাবে অবক্ষয়ের শিকার তখন পশ্চিম প্রেরিত প্রযুক্তির প্রাকৌশলিক বিস্ফোরণ আমাদের সংস্কৃতির চলিষ্ণু ধারাবাহিকতায় এক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করল। তার পরই গত শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্বায়ন নামক পশ্চিমি আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণ আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলতে লাগল। বিশ্বায়ন আসলে এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার একটা বড় অংশই ধূর্ত বাণিজ্যিক স্বার্থে গড়ে উঠেছে। ফলে তা আমাদের জীবনের ও সমাজের অবশিষ্ট সৎনীতি ও শিল্প-সংস্কৃতির নিবিড় ও সূক্ষ্ম তন্তজালকে কোথাও কোথাও গভীরভাবে ছিন্ন করছে। এই পরিস্থিতিতে গাজিনৃত্যের টিকে থাকার সম্ভাবনাটা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। তবে গাজিনৃত্যের বিষয়বস্তু এমন একটি বার্তা বহন করে যা এই সংকটাকীর্ণ পরিবেশে শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতেই নয়, সমস্ত জাতির জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের লেখকরা গাজিকে গঙ্গা, দুর্গা, পদ্মা, শিব এবং শাখোটার অধিবাসী বনদেবী সহ হিন্দুদের বন্দনীয় সকল দেবতার বন্ধু এবং আত্মীয়রূপে চিত্রিত করেছেন।[৪] গাজির কাহিনি বর্ণনায় অসংখ্য বিকৃতি ঘটলেও এটা এখনও সামাজিক জীবনে ঐক্য ও সম্প্রীতির গুরুত্বের কথা অহরহ বলে যায়। লোকসংস্কৃতির এই উজ্জ্বল দিকটার ধারক ও বাহক হিসেবেই গাজিনৃত্যের মূল্যমান নির্ধারিত হতে পারে। সামাজিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বার্তাটি যৌন আবেদনহীন এ নৃত্যের মধ্য দিয়ে যেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচারিত হতে পারে, তা অন্য কোন মাধ্যমে হয় না। তাই বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতির এই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গটি এই বিশ্বায়নের যুগেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

তথ্য নির্দেশনা :

১. মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য, বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য গ্রামীণ নৃত্যকলা, শিলচর, ১৯৯৫, পৃ. ৯-১১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩. Guru Saday Dutta, The Folk Dances of Bengal, Edited by - Asoka Mitra, Calcutta, 1954, pp. 9-13.

৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৮।

বৌ নাচ বা বধূবরণ নৃত্য

মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য

যৌথ শ্রম প্রক্রিয়া থেকেই ও সুরের উৎপত্তি। গণ জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মলীলা বা শ্রমক্রিয়া সেই ছন্দ ও সুরে আশ্রিত হয়ে লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি করে। লোক-সংস্কৃতির এই উপাদানগুলি এক জায়গায় স্থির থাকে না। এগুলো পরিবর্তনশীল তো বটেই, তবে সে-পরিবর্তন ঘটে অতি ধীরে, পরোক্ষে, সাধারণ অভিজ্ঞতার অগোচরে। পরিবর্তনের একটা নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত ধারা আছে, বাইরে থেকে তা আরোপ করতে গেলেই তা বিচ্যুত ও বিকৃত হয়ে পড়ে। বর্তমানকালে এরকম একটা বিচ্যুত ও বিকৃত নৃত্য হল আমাদের আলোচ্য বৌ নাচ ও বধূবরণ নৃত্য। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই নৃত্যশিল্প, শ্রীহট্ট-কাছাড়ের গৌরব। যার কলা-কৌশল ভারতের অন্যান্য যে কোন নৃত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং প্রথাসিদ্ধ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তার চর্চা ও অনুশীলনের সুযোগ সুবিধা নেই, তা বলে নাচটি সম্বন্ধে জনমানসে প্রকৃত চিত্র না তুলে ধরে বিকৃত রূপ তুলে ধরা নিশ্চয়ই অপরাধ বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয়তা নেই, এমন অনেক কিছুই আজ পুনরুদ্ধার করে অনুশীলন করা হচ্ছে। অনেক লোককলা, লোকশিল্প, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য নিয়ে চর্চা-অনুশীলন করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই বিশেষ ঐতিহ্যবাহী নৃত্যটি কেন বিকৃত আকারে প্রদর্শন করা হবে? সহৃদয় পাঠকবৃন্দের কাছে আমাদের আবেদন রইল, আলোচ্য প্রবন্ধ 'বৌ নাচ বা বধূবরণ নৃত্য' যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করবেন। প্রত্যাশা রইল এ সম্বন্ধে মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাদের লুপ্তপ্রায় এবং বর্তমানে বিকৃত এই নৃত্যটির প্রকৃত মূল্যায়নে সহযোগিতা করবেন।

আমাদের এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বিচারের প্রধান মানদণ্ড হল সুর ও গীতিরীতি। সুর এখানে কথা-নির্ভর, কথা-অনুসারী, কথা-নিরপেক্ষ নয়। কথাকে সুন্দর করে তোলার জন্য সুরের জাল। সেই সুরে থাকে আঞ্চলিকতার প্রভাব, কথায় থাকে আঞ্চলিক উপভাষায় ছাপ, উচ্চারণ ভঙ্গিটি থাকে আঞ্চলিক প্রভাব যুক্ত। পার্থিব-অপার্থিব দেখা, উপলব্ধি করা বিষয়বস্তুর প্রকাশ থাকে গানের কথায়, সুরে ও কথায় থাকে কল্পজ্ঞানের পরিচয়। এই সবের মধ্য দিয়েই বিচার করে নেওয়া যায় তা লোকসঙ্গীত কি না? এই সব গানের শৈলী (style) আসে আঞ্চলিক জীবনধারা থেকে। এই সব সুরে আঞ্চলিকতা গড়ে ওঠে বিশেষ স্বরসমষ্টিকে অবলম্বন করে, তার সঙ্গে মেশে আঞ্চলিক কণ্ঠস্বর এবং পারিভাষিক উচ্চারণভঙ্গি যাথেকে বুঝে নেওয়া যাবে লোকসঙ্গীতের প্রকৃত রূপটি। সুতরাং জল-মাটি-হাওয়া তার উৎস স্থল। তেমনি নৃত্যেও পাওয়া যায় আঞ্চলিকতার প্রভাব। নৃত্যের আঞ্চলিকতা হচ্ছে তার পরিবেশ, পরিস্থিতি, দেশাচার, লোকাচার এবং সামাজিক প্রচলিত প্রথা। আমাদের দেশের মহিলারা তাঁদের আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবরণ-আভরণ প্রভৃতির মধ্যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যে তা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজের অলিখিত সাহিত্য হচ্ছে লোকসঙ্গীত, আর তার মানবিক আবেদন বা রুচির নান্দনিক প্রকাশ হল লোকনৃত্য। সঙ্গীত রচনার মধ্যে তাই কোন জটিল কৃত্রিমতা থাকে না, কোন অস্বাভাবিক শব্দ যোজনা বর্জন করা হয়, অর্থহীন শব্দ ব্যবহার হয় না। এমন শব্দ বা কথা থাকে না, সুর যাকে অনুসরণ করতে গিয়ে গানের সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দিতে পারে।

এভাবে আঞ্চলিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সৃষ্টি হয় লোকসঙ্গীত-লোকনৃত্য। এমনই একটি লোকসঙ্গীত হল — 'সুয়াগ চান বদনী দনি নাচত দেকি/বালা নাচত দেকি, ভালা নাচত দেকি' ইত্যাদি (আঞ্চলিক পরিভাষায় গানটি এখানে উল্লেখ করা হল। বিশেষ করে'' রেখাঙ্কিত শব্দগুলো)। এই গানটিকে ভিত্তি ধরে বিশেষ এক উৎসবে একটি নাচ হয়, যাকে বলা হয় বৌ নাচ এবং গানটিকে বলা হয় বৌ নাচের গান। বৌ নাচকে আবার বধূবরণ নৃত্য বা বরণ নৃত্যও বলা হয়ে থাকে।

পদকীর্তন বা কীর্তনের নাচ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনের প্রবক্তা, তাঁর সময়েই কীর্তনগান লোকসঙ্গীতের স্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করেছিল। এ ভাবে বৈষ্ণব সাধক বৈষ্ণব কবি ও মহাজনদের লীলাসঙ্গীত বা কীর্তনসঙ্গীত লৌকিক সংস্রবে এসে যায়, আবার কিছু লোকসংস্রব থেকে এক বিশেষ প্রণালীবদ্ধ হয়ে যায়। এ ভাবেই অনেক লীলাসঙ্গীতের একটি লৌকিক সংস্রবে এসে বৌ নাচের গান বলে আশ্রয় পেয়ে যায়। আসলে এই গানগুলো ধামাইল গান শ্রেণীভুক্ত। বিশেষ উৎসব-কর্মে গাওয়া হয় বলে ঐ কর্ম বা উৎসবের নামে নামকরণ হয়, যেমন গোষ্ঠের গান, বিয়ার গীত ইত্যাদি।

বৌ নাচ বধূবরণ উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ এবং গ্রামীণ মহিলা সমাজে প্রচলিত প্রথা। এ অঞ্চলের বিবাহ উৎসবটি একটানা অনেকদিন ধরে চলে। উৎসবের প্রধান আকর্ষণীয় অঙ্গ হল বধূবরণ উৎসব। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ উৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। অনেক আচার-আচরণ নিষ্ঠা সহকারে সমানভাবে পালিত হয় এবং নৃত্যগীত ইত্যাদি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবাহ উৎসবের শেষ পর্যায় হল বধূবরণ। এই উৎসবের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ও প্রতীক্ষা থাকে। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে তার উৎপত্তি হলেও জনপ্রিয়তার জন্য তার পরিধি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার বিস্তৃত। এই উৎসবের একটি দিনক্ষণ নির্ধারণ করে গ্রামের সর্বশ্রেণির মহিলাদের সমবেত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। নির্দিষ্ট স্থলে আমন্ত্রিতা মহিলাদের সামনে নব-পরিণীতা বধূকে উপস্থিত করানো হয় তার নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করার জন্য। উদ্দেশ্য নৃত্যকলা জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া। অনুষ্ঠানটি মহিলাদের হলেও নানাভাবে আনন্দের ভাগীদার হন পুরুষেরাও। ঢোল, কাসি, সানাই বাজাবার জন্য প্রয়োজনবোধে পুরুষদের আনানোও হয়ে থাকে। অঙ্গন সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। নৃত্যস্থলে আলপনা দেওয়া হয়। পাশে নানা রং-এর মাটি, বালি, ক্ষেত্র বিশেষে ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া রং করে রাখা হয়। রাখা হয় বাতাসা। নববধূ নৃত্যকালে তাঁর পদকর্ম দ্বারা এই সব বস্তুসামগ্রীর ওপর নৃত্য করে নানা নকশা বা ফুল তৈরি করেন, কোথাও বা বাতাসা অক্ষত রেখে নৃত্যক্রিয়া করেন। নববধূর নৃত্যের পূর্বে উপস্থিত মহিলারা ধামাইল নৃত্য করে আসরের শুভারম্ভ করেন। এই সময়ের ধামাইল গানগুলিতে কনের বাড়ি, বরের বাড়ি বা অন্যান্যদের সম্বন্ধে নানা তাৎক্ষণিক কথা সংযোজন করে দেওয়া হয়। এগুলো প্রায়শই আদিরসের কৌতুকমিশ্রিত হয়। (গানগুলো বেশ অভব্য ও অশ্রাব্য হয় বলে সমাজ তাকে বিশেষ স্বীকৃতি দেয়নি। বিবাহ একটা সর্বজনীন উৎসব। তাই এ ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ সঙ্গীতধারার স্থায়িত্ব স্বল্পকালই ছিল। একে নাকি কালা ধামাইল বলা হত। প্রবন্ধকারের বাস্তব অভিজ্ঞতায়

এরকম কোন গানের সন্ধান মেলেনি, তবে প্রচলন যে ছিল বলে তা সত্য। অতি অল্প সংখ্যক মহিলারা এসব গান করতেন।) ধামাইল নৃত্য সমাপনান্তে এক বরণডালাতে নানা মাঙ্গলিক দ্রব্য সহকারে এয়োতি মহিলারা নববধূকে বরণ করে তাঁকে নৃত্য প্রদর্শন করার অনুমতি দান করেন। গান আরম্ভ হওয়া মাত্র নববধূ তাল-লয়-ছন্দ রক্ষা করে সর্বপ্রথম মনে মনে ভূমিবন্দনা, দেববন্দনা এবং উপস্থিত গুরুজন বন্দনা করে তাঁর নৃত্য প্রদর্শন শুরু করেন। নৃত্য ধীর লয়ে শুরু হয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। সময়ের নির্দিষ্টতা থাকে না, তিনি পুনরায় বরণীয়া না হওয়া পর্যন্ত নৃত্য চলতেই থাকে। তাল-লয়কে আশ্রয় করে চলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ সারা দেহের ছন্দ লহরী, গাত্রবিক্ষেপ, অঙ্গচালনা, পদচালনা। কোথাও কোন অসংযম প্রকাশ পায় না। অবশ্য পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তা হওয়ারও কথা নয়। একদিকে ভয়, সংকোচ, লজ্জা, তারই সঙ্গে সফল হওয়ার প্রচন্ড মনোবাসনা নিয়ে, সম্পূর্ণ অপরিচিতা, অভ্যাগতা বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন রুচির সমবেতা মহিলাদের সামনে তিনি তাঁর নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করেন বলেই নৃত্যটি হয় গভীর ব্যঞ্জনাময়। আড়াই প্যাচ করে শাড়ি পরা হয় (শ্রীহট্টীয় ঢং), শাড়ি দিয়ে ঘোমটা দেওয়া, তার উপর ওড়না দিয়ে চিবুক পর্যন্ত ঢাকা থাকে। কনুই থেকে হাতের অঙ্গুলি ভাগ, পায়ের পাতা আর মুখমণ্ডল ছাড়া দেহ আবরণ ও আভরণাবৃত। আভরণ যা সহজলভ্য। তথাপি চরণপদ্ম, হস্তপদ্ম, নূপুর, কর্ণকুন্তল, চন্দ্রহার, সিঁথিহার, শায়া, বালা, অনন্তপাশা, সিঁদুর, আলতা, চন্দন এগুলি অতি স্বাভাবিক। পত্রপুষ্প বা অলঙ্কারে কেশ-সজ্জা।

এ-নৃত্যের পদচালনা এমন কৌশলময় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা ভারতবর্ষের কোন লোকনৃত্য বা অন্যান্য নৃত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষত এইভাবে মাটিতে ঘসে ঘসে নৃত্য করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অথচ নাচটি সহজ-সরল ও বিজ্ঞানসম্মত। নৃত্যটির এ-ধরনের শৈলী সম্ভব হয়েছে তাল, লয়, ছন্দ, সুর ও গানের ভাষার জন্য। নৃত্যে যেসব হস্তক্রিয়া বা হস্তমুদ্রা প্রয়োগ করা হয় তা নৃত্যের তাগিদেই এসে যায়, কোনও কৃত্রিম অর্থ বহন করে না। নৃত্যটির প্রধান উদ্দেশ্যই হল কলাকৌশল প্রদর্শন, আনন্দদান। নৃত্যটির পদক্ষেপ এবং চলন সম্বন্ধে কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

(১) পদদ্বয়ের অঙ্গুলিভাগ একত্রিত করা, গোড়ালি দুটো পরস্পর থেকে ৩/৪ ইঞ্চি ব্যবধানে, কোমর থেকে দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। চোখ মুখ ভুমির দিকে থাকে সব সময়ে, দুই হাতের কনুই থেকে হাত সমান্তরাল এবং এই অবস্থায় হাতের পাঞ্জা ওড়না ঢাকা চিবুক থেকে নিচে বাইরে দিকে। দুই হাঁটু একত্রিত থাকবে এই সমস্ত ক্রিয়া ত্রিমাত্রিক ছন্দে চলবে। দুই হাঁটু একত্রিত থাকবে। (দ্রষ্টব্য, চিত্র পদচালন)

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনমাত্রায় পরিবর্তন হচ্ছে-পায়ের অঙ্গুলি ভাগ সরে গিয়ে গোড়ালি একত্রিত হবে। হাঁটু বিচ্ছিন্ন হবে, দেহ থাকবে সোজা উপরের দিকে, হাতের কব্জি ঘুরিয়ে পাঞ্জা দেহের দিকে আসবে। এভাবে পুনরাবৃত্তি হবে দক্ষিণাবর্ত চক্রাকারে এক আর্বতন ঘুরে না-আসা পর্যন্ত। (চিত্র পদচলন-দ্বিতীয়)

(৩) গানের দ্বিতীয় স্তবকে নাচের পরিবর্তনে হবে-পদচালন, দেহ ওঠানামা, সামনে ঝুঁকে সব কিছু ঐ ভাবে চলতে থাকে। কেবল হস্তক্রিয়ার পবিবর্তন হয়, কনুই থেকে বামহাত বাঁয়ে হেলে থাকবে, ডানহাত সমান্তরালভাবে এসে ডানহাতের কনুই এর নিচে অবস্থান নেবে, তেমনি ডানহাত ডানে ঘুরে বাম হাতে এসে লাগবে।

(৪) তৃতীয় স্তবকে সব কিছু পূর্ববৎ, কেবল দুই হাতে পৃষ্ঠদেশ মুখের দিকে, দুই হাতের অঙ্গুলিগুলির ক্রিয়া চলবে, এক একটি করে সরবে, আবার ফিরে আসবে। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় করতল সমানভাবে না-থেকে কুঞ্চিত হবে, অঙ্গুলি ফাঁক ফাঁক অবস্থায় সামান্য বক্রভাবে নিম্নমুখি থাকবে পদ্মকোশ মুদ্রার মত। প্রতি ত্রিমাত্রিক ছন্দে এক একটা অঙ্গুলি সরে যাবে, প্রথমে কনিষ্ঠা যাবে, তারপর অনামিকা, তারপর মধ্যমা, প্রথমা বৃদ্ধাঙ্গুলির সঙ্গে যুক্ত থাকবে। আবার এক এক করে সব ফিরে এসে পদ্মকোশ তৈরি হবে।

(৫) চতুর্থ স্তবকে দেহ পূর্ববৎ দুই হাতের পাঞ্জা মাটির দিকে ঘোমটার নিচে, শূন্যে একটা কাল্পনিক বৃত্ত সামনের দিক থেকে তৈরি করবে, সেই সঙ্গে ডান পা বাম পায়ের পিছন দিকে অর্ধবৃত্ত করবে। তেমনি বাম পা ডান

পায়ের সামনের দিকে বাম পায়ের পিছন দিকে অর্ধবৃত্ত রচনা করবে। (চিত্র পদচলন তৃতীয়, ক, খ, গ,)

(৬) পূর্ববৎ কেবল ডান পা তালে সরতে সরতে ক্রমশ বাম পা-কে অতিক্রম করে আড়াআড়ি হবে এবং ঐভাবেই প্রথম পদক্রিয়ার মতো হবে এবং সেই সঙ্গে বাম হাত কোমরে রেখে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ওড়নার খুঁট ধরে ধীরে ধীরে দেহটাকে বসিয়ে পদক্রিয়ার মাধ্যমে ছোট একটা বৃত্ত রচনা করতে হবে। এভাবে পুনরাবৃত্তি চলে। পরে আবার উঠে গিয়ে মাটিতে রাখা রং, কালি, তুষ ইত্যাদির ওপর পদক্রিয়ায় নকশা ফুল তৈরি করা হবে এবং অন্তে প্রথমে পর্যায়ে ফিরে যেতে হবে। (চিত্র পদচলন চতুর্থ)

(৭) প্রথম পর্যায়ের মতোই, তবে শাড়ির আঁচলে কাল্পনিক পুষ্প চয়ন করে রাখা হবে।

(৮) সব কিছু পূর্ববৎ, তবে কাল্পনিক সংগৃহীত পুষ্প গুরুজনদের চরণে নিবেদন করা হবে অর্থাৎ অজ্ঞানে তাল-লয়-ছন্দ ভঙ্গজনিত বা অন্যকোনও অপরাধ হয়ে থাকলে বা মনোরঞ্জনে অক্ষম হয়ে থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করাই চরণে পুষ্প নিবেদনের অর্থ।

সাধারণত এই ক্রমগুলি যথাযথ পালন করে নৃত্য সম্পন্ন হলে আনন্দ উল্লাস, শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, প্রদীপের আরতি, ফুল ও খৈ বর্ষণ করে, মঙ্গল ঘটের পবিত্র জল ছিটিয়ে এবং ধামাইল নৃত্য সহকারে বধূকে বরণ করা হবে। নব-পরিণীতা সর্ব সমক্ষে বরণ্যা হবেন। নৃত্যটি একক নৃত্য হলেও ভাব-অভিনয় বিহীন তালাশ্রয়ী মনোরম গাত্র বিক্ষেপ বলেই লোকনৃত্য হিসাবে স্বীকৃত। নাচের ধারাবাহিকতা প্রথাবদ্ধ। নৃত্যের অনুষঙ্গী গীতটি স্তবক পরিবর্তনের সাথে সাথে নৃত্য ক্রিয়া কৌশলের পরিবর্তন হয়। গানটি স্থায়ীতে ফিরে গেলে নৃত্য প্রথম পর্যায়ে চলে যায়। নৃত্য রচনা তাৎক্ষণিক হলেও তার বিভিন্ন ক্রম কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে অনুশীলন করা হয়। নৃত্যের ক্রম ছাড়াও কয়েকটি নির্দিষ্ট রীতি ও প্রথা আছে যেমন —

- গুরুজনদের সামনে পা তুলে হাঁটা-চলা অশোভন, নৃত্য করাও অশোভন, তাই পদক্রিয়া কোনভাবেই মাটিছাড়া হবে না। মাটিতে ঘসে ঘসে হবে।
- অভ্যাগতা গুরুজনদের সামনে আনত নয়নে থাকা শোভনীয়।
- শির-গ্রীবা বেশি দোলানো অশালীন।
- কারো সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হবে না।
- পদক্রিয়ায় নকশা বা ফুল লতাপাতা তৈরি করতে কখনো মস্তক ঊর্ধ্বমুখী হবে না।
- দক্ষিণাবর্ত হবে..........
- নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত বা বরণ্যা না-হওয়া পর্যন্ত নৃত্য করতে হবে।

শৈশব থেকে প্রত্যেক বালিকাকে গৃহকর্মের নানা ক্রিয়া সম্বন্ধে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তেমনি নানা শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে তাকে তৈরি করে নেওয়া হয়। নানা ব্রত উৎসবের মাধ্যমে তাদের সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় আগ্রহী করে তোলা হয়।

নৃত্য প্রদর্শনের ওপর যেখানে স্বামীগৃহের আদর আপ্যায়ন সবকিছু নির্ভর করে, সেখানে শৈশবকালে নৃত্যচর্চা শিক্ষা কোন লজ্জার বিষয় নয়। আর তা দেখে দেখে আয়ত্ব করতে হয়।

সেই জন্য কাছাড় শ্রীহট্ট অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এতো গান, এতো নাচ। বাংলা ভাষাভাষী অন্য কোন অঞ্চলে বা সমাজে এতো ভিন্ন নাচ নেই। আর সবগুলিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। যদি বলা যায় জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে (cradle to grave) নৃত্য আমাদের উৎসাহ, প্রেরণা, সহযাত্রী তা-হলে তা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না।

বৌ নাচের অনেকগুলি গান পাওয়া যায়। তবে সর্বাধিক জনপ্রিয় গানটি হলো 'সুয়াগ চান্দ বদনি দনি'। গানটি লীলাসঙ্গীত পর্যায়ের তবে বৈষ্ণব মহাজন রচিত গানটি লৌকিক সংস্রবে এসেছে প্রায় ১৫০ / ২০০ বৎসর হবে। গীতটি ভনিতাযুক্ত। ইচ্ছাকৃতভাবে একটা চাষাড়ে পোশাকও পরানো হয়নি। সহজ-স্বাভাবিক আঞ্চলিক উপভাষা

আর আঞ্চলিক সুর-তাল-ছন্দ এবং কথার গাঁথুনি দিয়ে রচিত বলেই এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল। আঞ্চলিক উপভাষায় গানটি এখানে তুলে হচ্ছে : —

সুয়াগ চান্দ বদনি দনি নাচত দেকি
বালা নাচত দেকি, ভালা নাচত দেকি।।
(এগো) জেমনি নাচইন নাগর কানাই,
তেমনি নাচইন রাই
একবার নাচিয়া বুলাও চাইন দেকি নাগর কানাই,
রাই নাগর কানাই।।
(এগো) নাচিতে আতের বাশি রাখইন শামরায়
(এগো) চাইর দিকে চাইয়া রাইএ বাশিটি লুকাইন, রাইএ বাশিটি লুকাইন।।
(এগো) নাচইন বালা সুন্দরীয়ে পিন্দইন বালায় নেত
(জেন) এলিয়া দুলিয়া পরে সুন্দিজালির বেত
বালা নাচত দেকি।।

নেত—খোঁপায় দেওয়ার জালি নয়, নেত হচ্ছে সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র বা রেশমিবস্ত্র। সুয়াগ—সোহাগ, চান্দ—চাঁদ, দনী—ধনি, দেকি—দেখি, জেমনি—যেমনি, নাচইন—নাচেন, বুলাওচাইন—ভোলাওতো, আতে—হাতের, বাশী—বাঁশি, রাখইন—রাখেন, শামরায়—শ্যামরায়, এগো—ওগো, দগো—ওগো সম্বোধনে, নাচইন—নাচেন, বালা—ভালা, পিন্দইন— পরেন, বালায়— বালিকায়, এলিয়া—হেলে, দুলিয়া—দোলে, পরে—পড়ে, সুন্দী জালির—চিক্কণ একপ্রকার বেত।

☐ *এই নিবন্ধটি মুকুন্দদাস ভট্টাচার্যের ‘বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য: গ্রামীণ নৃত্যকলা’ (১৯৯৫) গ্রন্থে সংবদ্ধ আছে। নিবন্ধটি বরাক-সুরমা উপত্যকার লোকসংস্কৃতি ও লোকনৃত্য অধ্যয়নের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা এটি পুনর্মুদ্রণ করলাম।*

বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি বলয়ে ওঝানাচ

শিবতপন বসু

পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলে সাঁওতালদের মধ্যে ভূত বিতাড়নের জন্য যার শরণাপন্ন হতে হয় তিনি হলেন ওঝা। মুণ্ডা উপজাতির ডাইনি ভীতি থেকে জন্ম নিয়েছে ওঝা সম্প্রদায়। এরা ডাইনি অনুসন্ধানের কাজে গণনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। লোধা সমাজে যিনি স্বাধীনভাবে জাদু চিকিৎসা করেন তিনি হলেন ওঝা। মণিপুরে এঁরাই হলেন মাইবা। খাসিয়াদের এঁরা নংকহম নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ওঝা নানাবিধ ধর্ম ও গুপ্তক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকেন। ভূতের রোজার মত এঁরাও মায়াবিদ্যার অধিকারী। দেশজ গাছগাছড়া থেকে এঁরা ওষুধ প্রস্তুত করেন, ভূতপ্রেতের কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। সর্পদংশিত ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ নামানোর কাজ এঁরাই করে থাকেন। চিকিৎসকদের মত এঁরা আজও গ্রামীণ মানুষের সুহৃদ বা আপনজন। শত্রু দমনে, আরোগ্যকরণে, পারিবারিক বিঘ্নাদি দূরীকরণে পরী আনয়নে হৃতদ্রব্য পুনরুদ্ধারে, আভিচারিক ক্রিয়া সম্পাদনে, মহামারীর প্রাদুর্ভাবে উত্তরবঙ্গের গ্রামগঞ্জে আজও ওঝাদের ডাক পড়ে।

সংস্কৃত উপাধ্যায় শব্দটি থেকে বাংলায় ওঝা শব্দটি এসেছে। উপাধ্যায়>উবজঝাঅ ওঝা। পদবি হিসেবে উপাধ্যায় শব্দটি আজও চালু আছে। আবার শব্দটি প্রাকৃতায়নের ফলে 'ওঝা' হয়েছে এবং পদবি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতেই ওঝা নির্বাচিত হন। ওঝাকে মানব কল্যাণের জন্য, বিশেষ করে তাঁর স্বজাতির কল্যাণের মনপ্রাণ উৎসর্গ করতে হয়। কল্যাণ ব্রতধারী ওঝা তাই এক অর্থে জনসেবক। দেশে দেশে কালে কালে ওঝারা মানবকল্যাণের জন্য নানা ধরনের কাজ করে থাকেন। যেমন (১) ভূতপ্রেত ও দুরাত্মা বিতাড়ন (২) পোকামাকড় ও জীবজন্তর কামড়ের প্রতিকার (৩) নানা ধরনের রোগ নিরাময় (৪) শত্রুক্রনিধন (৫) পশুরোগ নিরাময় (৬) বশীকরণ বা নতিস্বীকার করানো ইত্যাদি।

মানুষ কখন ওঝার শরণাপন্ন হয়? উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা যায়, যখন মানুষের জীবনে ঘটে এমন কোনও বিচিত্র ঘটনা যার ব্যাখ্যা বুদ্ধি বা বিচারে কুলায় না, তখন সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ আবেগাপন্ন হয়ে বিপদ মুক্তির কারণে ওঝার শরণাপন্ন হয়। এ হল লোকবিশ্বাস— যাকে লোকধর্ম বলতেও আপত্তি নেই।

বরাক উপত্যকায় 'ওঝার' সঙ্গে নাচ ও গান শব্দ দুটি যুক্ত হয়ে যথাক্রমে ওঝানাচ ও ওঝাগানের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আর এক ধরনের নাচ আছে যাকে ওজাপালি নাচ বলা হয়। আমরা যাকে ফোকলোর বা লোকঐতিহ্য বলি তার প্রাচীনতম নিদর্শন হল নৃত্য। নৃত্য এক সময় ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল এবং এখনও পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে যাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ নাচ বলে কিছু নেই। নৃত্যের মূল কথা হল অঙ্গ সঞ্চালন — যার মধ্যে থাকে ছন্দ। বিশ্বের লোকনৃত্যের ধারায় যদি বরাক উপত্যকার ওঝানাচকে বিচার করি তাহলে একথা অবশ্যই বলতে হয় যে এই নাচ ধর্ম ও জাদুর হাত থেকে মুক্ত হতে পারেনি। লোকনৃত্যের যে বিষয়ভিত্তিক সূচি প্রস্তুত হয়েছে তাতে জন্তু-জানোয়ার ও পাখির অনুকরণে লোকনৃত্যের উল্লেখ আছে। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে যে সর্পনৃত্য বা Snake Dance-এর কথা পাই তার উদ্ভব ঘটেছে জাদুবিদ্যা থেকেই। বরাক উপত্যকার ওঝানাচে যে সর্পিল গতি বা ভুজঙ্গচলন তার সঙ্গে সর্পনৃত্যের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

বরাক উপত্যকায় ওঝানাচে ভুজঙ্গচলনের সঙ্গে ময়ূরচলন কৌশলও প্রদর্শিত হয়। এর পিছনে একটি প্রাচীন বিশ্বাস কাজ করছে বলে আমাদের বিশ্বাস। লোকনৃত্যে পশু বা পাখির অনুকরণে নৃত্য পরিবেশনের অন্যতম প্রধান কারণ রোগব্যাধির প্রতিকার। ভারতের মতো টোটেমবাদী দেশে যেখানে লোকনৃত্যের সামগ্রিক ধারা উৎসারিত হয়েছে মূলত ধর্ম ও জাদুবিদ্যা থেকে সেখানে কথক নৃত্যের পদকর্মযুক্ত ওঝানাচে ময়ুরচলনের পিছনে রোগ নিরাময়ের বিশ্বাস কাজ করছে বলে মনে হয়। বিষহরির পূজা প্রসঙ্গে ওঝানাচ এবং ওঝানাচ প্রসঙ্গে ময়ূরচলন। সুতরাং আমরা এ ব্যাপারটিকে একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে পারি মনসাপূজার ধ্যানমন্ত্রের একটি বিশেষ পংক্তি দিয়ে-'বন্দে শঙ্কর পুত্রিকার বিষহরিং পদ্মোস্ত্রাবাং জাঙ্গুলীম।' বিষহরি বন্দনায় জাঙ্গুলীর উল্লেখ কেন? জাঙ্গুলী আসলে মহাযানী বৌদ্ধদের জাঙ্গুলী-তারা যাঁর ক্ষেত্রে 'ময়ূরপুচ্ছ' ও 'লেখনীহস্তা' বিশেষণ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। জাঙ্গুলী ও সরস্বতীর বাহন হংস। উভয়েই চতুর্ভুজা। মনসার ধ্যানমন্ত্রে উল্লেখিত জাঙ্গুলীর সবকটি গুণই দেবী সরস্বতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জাঙ্গুলী ও সরস্বতী প্রকৃত প্রস্তাবে অভিন্ন। সুতরাং বিষহরি পূজাকে কেন্দ্র করে ওঝার যে নাচ ও গান পরিবেশিত হয় তার সঙ্গে বিদ্যাদেবীর পরোক্ষ যোগ রয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এই যোগের কারণে হয়ত বা ওঝানাচ গান বিষয়ক 'ধ্রুপদী' বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে দ্বাদশ বর্ষকাল পর্যন্ত গুরুমুখী বিদ্যাশিক্ষার ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হত।

আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মগুলি ওঝা — গুণীন বা পুরোহিতদের ritual ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মিস্টিকধর্মী এই আচারগুলির মধ্যে একটি হল Mystic Dance। ওঝানাচ ধ্রুপদী নৃত্যের যোগ্যতা নিয়ে যদিও আজ সাধারণ লোকনৃত্য পরিচয়ে বরাক উপত্যকার বেঁচে আছে তথাপি এই নৃত্যে জাদুবিদ্যাগত তাৎপর্যটি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। জাদুবিদ্যার প্রয়োগগত কৌশলই হয়ত বা ওঝানাচের ভুজঙ্গচলন বা ময়ুরচলনে বেঁচে আছে। ওঝানৃত্যে গান একটি অপরিহার্য অংশ। যিনি মূল ওঝা তিনি বেহুলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বন্দনা গান শুরু করেন এইভাবে :

বন্দি মাগো সরস্বতীর চরণ যুগল
(মাগো) দ্বিতীয়ে বন্দি আমি যত দেবগণ।
তৃতীয়ে বন্দিনু আমি গুরুর চরণ
সর্বশেষ বন্দি আমি উপস্থিত জন।'

উত্তরবঙ্গে বিষহরি পূজার সঙ্গে মনসার ভাসানগানে যে বন্দনা অংশ তাতেও সরস্বতীর উল্লেখ রয়েছে:

প্রথমে বন্দনা করং দেবী সরস্বতী
দ্বিতীয়ে বন্দনা করং দেবগণপতি। (ব্যক্তিগত সংগ্রহ: ১৯৭৮)

ওঝাগান বরাক উপত্যকার ধর্মীয় সাধনসংগীতের পর্যায়ভুক্ত। বাংলার ধর্মসংগীতের যে প্রধান দুটি ভাগ— আচারমূলক ও লৌকিক, তার মধ্যে ওঝানাচ প্রথম ভাগে পড়ে এই কারণে যে এ গান প্রথমত গুরুশিষ্য পরস্পরায় চলে আসছে। দ্বিতীয়ত, নিজস্ব সাম্প্রদায়িক সীমায় আবদ্ধ থেকেই এর প্রচার ঘটে। আদিম যুগে মানুষ শুধু নানাধরনের অঙ্গভঙ্গি করে নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দেবতাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করত না, দেবপূজায় জাদুক্রিয়াগত নানাধরনের সংকেতও ব্যবহার করত। এই সংকেতগুলি পরবর্তীকালে মুদ্রায় উন্নীত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ মুদ্রা বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর কাছে প্রিয়। যেমন, শিবের প্রিয় মুদ্রা লিঙ্গ-যোনি-ত্রিশূল-অক্ষমালা। দেবী কালিকার প্রিয় মুণ্ডমুদ্রা। দেবদেবীর পূজায় যখন তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রবেশ ঘটে তখন থেকেই বিভিন্ন মুদ্রা শাস্ত্রসম্মত ও শাস্ত্রবিহিত হয়েছে। সুতরাং মনসাপূজা উপলক্ষে বরাক উপত্যকায় যে ওঝানাচ প্রদর্শিত হয় তাতে যে বাহুকর্ম তা মুদ্রার সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত বলেই আমাদের মনে হয়। মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য বলেছেন,'ওঝা নৃত্যশিল্পীর হাতে দুটি চামর অবশ্যই ধারণ করতে হয়। কখনও তা হাতে ধরে, কখনও কব্জিতে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়, তখন বাহুদ্বয় সঞ্চালিত হয়ে নানা মনোভাব প্রকাশ করে।' আমাদের মনে হয়, এই বাহুদ্বয়ের সঞ্চালনেই রয়েছে একাধিক মুদ্রার প্রকাশ, যা বিষহরির তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রদর্শিত হয়। এই নৃত্যে যদি দেবদেবীর সন্তষ্টিমূলক তান্ত্রিকমুদ্রার প্রতিফলন ঘটে থাকে তাহলে ওঝানাচ সম্বন্ধে আরও নতুন তথ্য সংযোজন করা সম্ভব হবে।

ওঝানাচ মনসাপুজার সঙ্গে কখন কীভাবে যুক্ত হল? ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতের মতো দুখানি অর্বাচীন পুরাণে যখন প্রথম মনসার স্থান হয় তখন থেকেই এই পূজার সঙ্গে গীতবাদ্য যুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ 'মনসা গীতবাদ্য প্রিয়, গানবাজনা না হইলে (ঝল্লমল্ল) তাহার পূজা হয় না এবং গীতনৃত্য করিয়াই বেহুলা তাহার প্রসাদ লাভ করিয়াছিল।' সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, পৌরাণিক যুগের শেষভাগে নৃত্যগীতবাদ্য সম্বলিত বিষহরি মনসাপূজার সূত্রপাত ঘটেছিল।

বরাক উপত্যকায় বিষহরি পূজার সঙ্গে গীতবাদ্য সম্বলিত ওঝানাচ যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে সব সন্দেহের নিরসন ঘটবে উপরের আলোচনা থেকে। এই নাচে কথক নৃত্যের যে পদকর্ম, ভরতনাট্যমের যে গ্রীবা ও চক্ষুকর্ম প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় তা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণ করে যে ওঝানাচ কালের দিক দিয়েই শুধু প্রাচীন নয়, প্রয়োগ কৌশলের দিক দিয়েও বহির্বঙ্গের একাধিক নৃত্যের দ্বারা প্রভাবিত। এই নাচে ময়ূরচলন সম্বন্ধে আর একটি কথা বলার রয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধদের পুজিতা দেবী হলেন মহামায়ূরী। ইনি বিষনাশিনী ও বিদ্যার দেবী। এর এক হাতে কলস, অন্য হাতে বরমুদ্রা। ওঝানাচে ময়ূরচলন ও বরমুদ্রা সদৃশ হস্ত সঞ্চালন থেকে মনে একথা জাগে যে বৌদ্ধযুগের পর হিন্দুযুগের পুনরুজ্জীবনকালে বৌদ্ধ বিষনাশিনী দেবী জাঙ্গুলী মহামায়ূরীর প্রভাব বিষহরি পূজায় পড়েছিল যার স্মৃতি রয়ে গেছে ওঝানাচে। তাছাড়া বিষহরির সঙ্গে ময়ূরের যে সম্পর্ক তার পাথুরে প্রমাণ রয়ে গেছে ইলোরার ৬ নম্বর গুহাচিত্রে অঙ্কিত মহামায়ুরীর সঙ্গে পেখমধরা ময়ূরের চিত্রে।

যদিও ওঝানৃত্য বরাক উপত্যকায় লোকনৃত্য হিসেবে স্বীকৃত তথাপি এর জন্য শাস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এখানেই বৈদিকযুগের কথা এসে যায়। বেদগানের সঙ্গে নৃত্য ও মুদ্রা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। নৃত্যগীতাদি ছিল পূজা-প্রার্থনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। যে বাক্যের সঙ্গে কণ্ঠস্বর বা সুরের উত্থান-পতন জড়িত, ওঝানৃত্যের গানেও সেই সপ্তসুরের সবগুলি রক্ষিত আছে। নৃত্যে দেহ বা সর্বইন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত করার শিক্ষা গুরুর কাছ থেকে অর্জন করেন ওঝা নৃত্যশিল্পীরা। যদিও নৃত্যের প্রধান অঙ্গ হস্ত ও পদবিন্যাস তথাপি ওঝানৃত্যে গ্রীবা, দ, ললাট চক্ষু, অধর, ওষ্ঠ ইত্যাদিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দেবী মনসার তুষ্টির জন্য দেহের সর্বইন্দ্রিয়কে পরমরূপের মাধ্যমে নিবেদন করেন বরাক উপত্যকার ওঝানৃত্যেশিল্পীরা। তাই প্রত্যেক শিল্পী গুরুমুখী বিদ্যা গ্রহণকালে যৌগিক ব্যায়াম, হস্ত-পদ মুদ্রার অনুশীলন, সুর ও তালশিক্ষা, দেহবিন্যাসের অভ্যাস, স্বাস্থ্যরক্ষা আহার-বিহারে সংযমের পরিচয় দিতেন। ওঝানৃত্য দীর্ঘসাধন সাপেক্ষ এক উন্নত কলাবিদ্যা। তাই একে শুধু লোকনৃত্য আখ্যা দিয়েই আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চাই না। এ নৃত্য ভারতীয় শাস্ত্রসম্মত নৃত্যরই সগোত্রীয়।

তথ্য নির্দেশ :

১। বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য-গ্রামীণ নৃত্যকলা মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য শিলচর, ১৯৯৫, পৃ. ১১৬।

২। বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য-গ্রামীণ নৃত্যকলা মুকুন্দদাস ভট্টাচর্য শিলচর, ১৯৯৫, পৃ. ৭৮।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড) সুকুমার সেন কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৯।

‘গুরমার গান’ বা ‘ওঝানাচ’ : লিঙ্গাতিযায়ী লোককলা

দীপেন্দু দাস

বরাক উপত্যকা, বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে ‘গুরমার গান’, ‘গুরমীর গান’, ‘ওঝানাচ’ বা ‘ওঝানৃত্য’ অত্যন্ত জনপ্রিয় এক লোকশিল্পকলা। মনসাপূজা উপলক্ষে এই নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়।

‘গুরমা’ বা ‘গুরমী’-রা না-পুরুষ, না-নারী। সাইমন দ্য বিভ্যুয়ারের ‘দ্য সেকেণ্ড সেক্স’ মাথায় রেখে, পুরুষ যদি প্রথম পুরুষ হয়, নারী হয় দ্বিতীয়, তা হলে ‘গুরমা’ বা ‘গুরমী’-রা তৃতীয় পুরুষ। নারী-পুরুষের ইতররতিপ্রবণ (hetero sexual) সমাজে, লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষণের মাপকাঠিতে নির্ধারিত নারী পুরুষ ভূমিকায় চরিত্র চিত্রণ যাদের নিখুত হয় না, তারাই ‘গুরমা’ অথবা ‘গুরমী’। এই শিল্পকলায় নিযুক্ত মুখ্য মধ্যে যদি শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চলাফেরায় পুরুষভাব বেশি থাকে, তাহলে তারা গুরমা। আর যদি নারী ভাগ অথবা নারী ভাব বেশি থাকে তাহলে তারা গুরমী। মুখ্য শিল্পী পুরুষ, নারী অথবা বৃহন্নলা যা-ই হোন না কেন, সবাই ‘ওঝা’।

মনসাপূজা ভিত্তিক এই লোকশিল্প শুরুতে ‘গুরমার গান’ হিসেবে পরিচিত ছিল। কারণ তখন এই শিল্পকলায় অর্ধনারীশ্বর শিল্পীর প্রাধান্য ছিল বেশি। ধীরে ধীরে নৃত্য-গীত আধারিত এই শিল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরুষ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী শিল্পীরাও এই কলা প্রদর্শনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ‘গুরমার গান’ নাম থেকে ‘ওঝানাচ’ বা ‘ওঝানৃত্য’ ধীরে ধীরে বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পল্লী-গাঁয়ের মাটি থেকে উৎসারিত এই শিল্পকলা যখন শহরের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করে, তখন তথাকথিত ভদ্রসমাজের শহুরে জীবনের প্রথম পুরুষ কেন্দ্রিক সমাজে এই নৃত্যগীতের নামের সঙ্গে বৃহন্নলা অনুষঙ্গ আপত্তিজনক মনে হয়। ধীরে ধীরে ‘গুরমার গান’ থেকে ‘ওঝানাচ’ বা ‘ওঝানৃত্য’ নামটি বেশি প্রচলিত হয়ে ওঠে, এবং ‘গুরমার গান’ নামটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। এতদিন নগর সংস্কৃতিতে ব্রাত্য এই লোকশিল্প ‘ওঝানৃত্য’ নামে শহরের শিক্ষিত ভদ্রসমাজে মান্যতা পায়। সাংস্কৃতিক উৎসবে এলিট শ্রেণির সামনেও এই শিল্পকলা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু পুরুষ-নারীর মূলধারার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তৃতীয় পুরুষের অস্তিত্ব ও ভূমিকা মুছে ফেলার সচেতন প্রয়াসে ‘গুরমার নাচ’ নামটি অপাংক্তেয় হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই নৃত্যকলায় বৃহন্নলা শিল্পীদের অংশগ্রহণ অনেক কমে যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা ছাড়া গুরমা বা গুরমী ‘ওঝা’ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

‘গুরমার নাচ’ বা ‘ওঝানাচ’-এর ভিত্তি লোককাব্য ‘মনসামঙ্গল’ বা ‘পদ্মপুরাণ’। ‘সংসদ বাঙ্গালা অভিধান’ মতে ‘ওঝা’ শব্দের অর্থ ‘সর্পবিষ-চিকিৎসক; ভূতগ্রস্তের চিকিৎসক; ব্রাহ্মক্ষণদের উপাধিবিশেষ।’ কিছু কিছু লোকসংগীতে দলের মুখ্য শিল্পীকেও ‘ওঝা’ বলা হয়।

‘গুরমার গান’ বা ‘ওঝানাচে’ মুখ্য শিল্পী নৃত্য ও গীতের মধ্য দিয়ে ‘পদ্মপুরাণ’ ভিত্তিক মনসা কাহিনি উপস্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রে ও দোহার হিসেবে উপস্থিত থাকেন একদল সহযোগী শিল্পী। সাধারণত একজন মুখ্য শিল্পীকে দুজন সহযোগী শিল্পী সহযোগিতা করেন। ‘পাখাজ’ নামের একধরনের তালবাদ্য বাজান। এই বাদ্যশিল্পী প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে মুখ্য শিল্পীর নৃত্য-গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৃত্য ও গীতে অংশগ্রহণ করেন। একটু বড় দলে

আরো চারজন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ 'করতাল' বা 'ঝাঁজ' বাজান। বাকিরা ওঝার গাওয়া অংশের নির্ধারিত জায়গা পুনরাবৃত্তি করেন।

পরম্পরা অনুযায়ী বাৎসরিক মনসাপূজার আগে আচার মেনে মূলত তিনভাবে 'পদ্মপুরাণ' পাঠ করা হয়।

প্রথমত, বাড়ির পুরুষ-মহিলা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শী মিলে কোনও বাদ্যযন্ত্র ছাড়া বাড়ির মধ্যে সুর ধরে 'পদ্মপুরাণ' পাঠ করা হয়। দ্বিতীয়ত, কোনও পেশাদার বা অপেশাদার শিল্পী অথবা শিল্পীদলকে আমন্ত্রণ করে 'পদ্মপুরাণে'র বিভিন্ন অধ্যায়ের গান গাওয়ানো হয়। এইসব দল শুধু নারী বা পুরুষ অথবা নারী-পুরুষ সমন্বিত হতে পারে। তৃতীয় ভাগে পড়ে 'গুরমার গান' অথবা 'ওঝানাচ'।

সাধারণত শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন 'পদ্মপুরাণ' পাঠ/গাওয়া আরম্ভ হয়। এই মাসের শেষ দিনটিতে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। যে কোনও পঞ্চমী তিথিতেও মনসাপূজা করা যায়। কখনও বা যে কোনও মাসের পাঁচ তারিখ মনসা পূজা করা হয়। কেউ কেউ যে কোনও সোমবারে মনসাপূজা করে থাকেন। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন রূপে এবং আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবী মনসা পূজিতা হন। দেবীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে বেশি প্রচলিত অষ্ট নাগ, নব নাগ, বিয়াল্লিশ নাগ, ঘট বিষহরী, করন্দী ইত্যাদি। কোথাও কোথাও নৌকাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নৌকাপূজাতে দেবী মনসার সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীরও পূজার্চনা করা হয়। মনসার আরেক রূপ দেবী ডরাই। মৎস্যজীবী কৈবর্ত সমাজে এই দেবীর পূজা বেশি প্রচলিত।

আজকাল দেবী মনসার জনপ্রিয়তা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রচলিত হলেও, মনসা মূলত হিন্দু ব্রাত্য সমাজের আরাধ্যা দেবী। চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার তাঁর চূড়ান্ত প্রয়াস উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের মধ্যে নিজের বিস্তার লাভ করার দেবীর আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ।

মনসার পূজার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 'গুরমার গান' অথবা 'ওঝানাচ'। 'পদ্মপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল'-এর বিভিন্ন অংশ নিয়ে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে এই কৃতিকলার উপস্থাপনা হয়। 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মপুরাণে' দুটো জায়গায় নৃত্য-গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম, ইন্দ্রের রাজসভায় উষার নৃত্য, আর দ্বিতীয় নিজের মৃত স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দেবসভায় বেহুলার নৃত্য। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে বেহুলার নৃত্য প্রদর্শনের সময় দেবসভায় যেসব দেবদেবী উপস্থিত ছিলেন, নৌকাপূজায় সেই সব দেবদেবীর পূজার্চনাও করা হয়।

বরাক উপত্যকায়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, 'গুরমার গান' বা 'ওঝানাচ' এখনও জনপ্রিয়। হয়ত ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বাঙালি সংস্কৃতির কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ও নিয়মিত যোগাযোগের অপ্রতুলতার ফলে বরাক উপত্যকার মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক লোককলা ও পরম্পরা টিকে রয়েছে; যেগুলো নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির তথাকথিত কেন্দ্র থেকে বহুদিন আগে হারিয়ে গেছে বা ব্রাত্যজনের বলে প্রবেশাধিকার পায়নি। বরং ব্রাত্যসমাজের প্রান্তিক পরিসরে, সময়ের সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, সম্পূর্ণ না পাল্টে টিঁকে রয়েছে।

অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের মত 'ওঝানাচ'ও গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষাদান করা হয়। দীর্ঘদিন গুরুর সঙ্গে থেকে শিষ্য এই নৃত্য-গীতের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মাবলী, বৈশিষ্ট্য ও জীবনদর্শন শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষান্তে গুরু শিষ্যের হাতে ওঝা নৃত্যের বিশেষ পোশাক ও অন্যান্য সাজসজ্জা তুলে দেন। এর মধ্যে থাকে 'চামর', 'ঘুংগুর' ও 'নেত' ইত্যাদি। সেদিন থেকে সেই শিষ্য 'ওঝা' হিসেবে পরিচিত হয়।'

'গুরমার গান' বা 'ওঝানাচ'-এর সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রচলিত 'ওজাপালি' লোককলাকে মিশিয়ে ফেললে ভুল হবে। 'ওঝানাচ' শুধু 'পদ্মপুরাণ' ও 'মনসাকাহিনি' নির্ভর। অন্যদিকে 'ওজাপালি' বিভিন্ন ধর্মীয় কাব্য, ধর্মীয় আখ্যান বা পুরাকাহিনি নির্ভর করে উপস্থাপিত হতে পারে। ওজাপালিতে শুধু গুরমা শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে 'ওঝানাচে' পুরুষ, নারী অথবা তৃতীয় পুরুষ যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন।

'গুরমার গান' বা 'ওঝানাচে' মুখ্য শিল্পী অথবা ওঝাকে গান ও নৃত্যের মাধ্যমে পদ্মপুরাণের কাহিনি উপস্থাপন করতে হয়। এই উপস্থাপনায় তাঁকে একই সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করতে হয়। কখনও বা মনসা, কখনো চাঁদ

সওদাগর, পরমুহূর্তেই হয়ত বেহুলা বা মহাদেব। এভাবে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষণের মাপকাঠিতে সমাজ জীবনে নির্ধারিত পুরুষ ও নারীর ভূমিকায় একই সঙ্গে তাঁকে রূপদান করতে হয়। একটা বিষয় অত্যন্ত লক্ষণীয় 'ওঝা' পুরুষ, নারী, অথবা বৃহন্নলা যা-ই হোন না কেন, এই লোকনৃত্যে 'ওঝা'র পোশাক সবসময়ই লিঙ্গ নিরপেক্ষ। তাই প্রধান শিল্পী অর্থাৎ 'ওঝা' নারী, পুরুষ অথবা না-নারী, না-পুরুষ যা-ই হোন না কেন, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করে যখন তিনি আসরে অবতীর্ণ হন, তখন লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লক্ষণের সীমারেখা অতিক্রম করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না। সীমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই লিঙ্গের চরিত্রে রূপদান তাঁর জন্য সহজ হয়। এদিক থেকে দেখলে 'ওঝানাচ' বা 'ওঝানৃত্যে'র আদি নাম 'গুরমার গান' অনেক গভীর তাৎপর্য বহন করে।

'বাইবেলে'র মত অনেক ধর্মগ্রন্থের মতে সৃষ্টির আদিতেই লিঙ্গ পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন ঈশ্বর। প্রথমেই সৃষ্টি হয় পুরুষ, তারপর নারী। হিন্দু দর্শন লিঙ্গ পার্থক্য নিয়ে সৃষ্টির এই মিথ-এ বিশ্বাস করে না। নারী ও পুরুষ একই দেহে সহাবস্থান পরিলক্ষিত হয় অর্ধনারীশ্বর কনসেপ্ট-এর মধ্যে। শিব ও শক্তির মিলনে এই দেবতা উভলিঙ্গ বা লিঙ্গনিরপেক্ষ রূপ পরিগ্রহ করেছেন। নারীশক্তি ও পুরুষশক্তি একই দেহে অধিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর মধ্যে।

'বেদ'-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা monogenic অস্তিত্বের কথা বলেছে। 'ঋগ্বেদ'-এ আছে ডিম ফেটে 'ভূত' ও 'প্রাণ' এর কথা। এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় শৈব মন্ত্রে 'একোহম বহুস্যাম', অর্থাৎ 'আমি এক, কিন্তু বহু হতে চাই'। দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের কথা ধ্বনিত হয়েছে ঋগ্বেদে। বলা হয়েছে, যে পুরুষ বলে অভিহিত হয়, সে সমপরিমাণ নারী। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া তা উপলব্ধি করা যায় না। একইভাবে নারী বলে যে পরিচিত, সে সমপরিমাণ পুরুষ। পুরুষ ও নারী একই আধারের মধ্যে নিহিত।

বৈদিক এই দর্শন শুধু সমাজের উচ্চবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্গে ও বর্ণের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে তার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

'সূর্যব্রত' বা 'কালাঠাকুরের কীর্তন'-এ সৃষ্টি বিষয়ক বৈদিক দর্শনের অনুরণন লক্ষ্য করা যায় :

সৃষ্টি পত্তন কৈলা হরি নারায়ণ।
কল্পনা করিয়া মায়া পাতি নিরঞ্জন।।
এক গোটা কায়া তথা করিলা সৃজন।
তাহারে ধরিতে চায় পীড়িত মদনে।।
নহে স্ত্রী নহে পুরুষ অক্ষতে শরীরে।
অর্ধ ভাগে গুপ্ত দ্বার বিদারিলা নখে।।'

লিঙ্গাতিযায়ী নারী-পুরুষ আধারে অধিষ্ঠান — এই যে দর্শন; শারীরবৃত্তীয়, আবেগিক ও মানসিক এই যে মিলনের কল্পনা ও দর্শন — এই সবকিছুর নান্দনিক প্রকাশ হয়েছে 'ওঝানাচ' অথবা 'গুরমার গান' লোক শিল্পকলায়।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, মুকুন্দদাস (১৯৯৫), 'ওঝানৃত্য' (গ্রন্থ) মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য, বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য গ্রামীণ নৃত্যকলা, গৌহাটি: প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিকেশনস্।

২. পাল, চৈতন্যচরণ (২০০৭), সূর্যব্রত অথবা কালাঠাকুরের গান, করিমগঞ্জ: উষা প্রকাশনী।

ভূমি চারণা (Landlore) : বরাক উপত্যকার মাটির ইতিবৃত্ত

সঞ্জীব দেবলস্কর

'মাটিতে জন্ম নিলাম,
মাটি তাই রক্তে মিশেছে'
(প্রবীর মজুমদার)

মাটির প্রতি মানুষের ভালবাসা নিছক কোন জড় পদার্থের প্রতি ভালবাসা নয়, এ ভালবাসার শিকড় অনেক গভীরে। এ ভালবাসাকে ঘিরে আছে মানুষের ঐতিহ্য, পরম্পরা এবং সংস্কৃতি। মাটি তো কেবল নিষ্প্রাণ ভূত্বকের একটি স্তর মাত্র নয়, মাটি আমাদের সত্তারই একটি অংশ। কথাগুলো কেমন দার্শনিক বা আবেগিক শোনালেও মাটির টান, ভিটের টান, জন্মভূমির টান তো কোন আরোপিত কিছু নয়। পৃথিবীর সকল দেশের সংস্কৃতিতেই মাটির প্রতি এ ভালবাসা মিশে আছে। 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা' কিংবা 'খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি'- এটা একটা জাতির অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই উৎসারিত সত্য। যুদ্ধক্ষেত্রে বসে যে ইংরেজ দেশপ্রেমের কবিতা লিখেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর মৃতদেহটি যদি কোন বিদেশি রণাঙ্গনে শায়িত হয়, তবে ওই দেহকে আশ্রয় দেওয়া ভূখন্ডটি হয়ে উঠবে তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি (The Soldier, by Rupert Brook)। ধনধান্য পুষ্প ভরা এই বসুন্ধরার বন্দনাগীতি যে কবি গেয়েছেন, তিনি আশা করেন, 'এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি'। এ মাটির টান এমনই যে এর টানে বৃদ্ধা, অতিবৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ (পথের পাঁচালীর) তাঁর জন্ম মাটিতে, বাপের ভিটেয়ই নিঃশ্বাস ফেলার জন্য অকিঞ্চিৎকর সমস্ত সম্পত্তি বয়ে নিয়ে চলে আসেন। বিভূতিভূষণের কাহিনির সেই চিত্রায়ন, সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরায়। বিশ্বের তাবৎ দর্শককুল কি আজও ভুলতে পেরেছেন?

একজন ভূতত্ত্ববিদের মাটি-অন্বেষা আর একজন মানবিকীবিদ্যার ছাত্রের অন্বেষার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির মাটি-অন্বেষায় ঘুরে ফিরে মানুষই প্রধান হয়ে উঠবে, কারণ মানুষ ছাড়া তাঁর কাছে মাটি তো অস্তিত্বহীন। 'তিনি পাথর পড়তে পারতেন'- বরাক উপত্যকার এক ঐতিহাসিক সম্বন্ধে এক কবির উক্তি। সামান্য চারটি শব্দের মধ্যে বিশাল একটা ইতিহাসকে ধরার প্রয়াস এ অনুজ কবির (অমিতাভ দেব চৌধুরী, সম্ভার, সুজিৎ চৌধুরী স্মরণ ক্রোড়পত্র, ২০০৯) পঙক্তিটি পড়েই আমরা অনুভব করি এ ঐতিহাসিকের প্রাণসত্তা বরাকের মাটি-ঘাস-পাথর-নিসর্গের সঙ্গে বিলগ্ন হয়ে আছে। তার মননের চারণভূমি এ বরাকের কোন রাজা-মহারাজার ধূসর জগৎ নয়; যুদ্ধ-দেশবিজয়-হত্যা-রক্তপাতও নয়। তার চারণভূমি এ বরাকের মাটি, যে মাটি হাজার বছর ধরে, তারও চেয়ে আগের সহস্রাব্দ ধরে, হয়ত বা আরও আগেকার থেকেই সুরমা-কুশিয়ারা-জিরি-চিরি-মধুরা- জাটিঙ্গা-ধলেশ্বরী-সোনাই-ঘাগরা-সিংলার অববাহিকায় মনুষ্য, পশুপক্ষী,

সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ এবং লতাগুল্ম, ফুলফল, বনস্পতিকুলকে দিয়েছে আশ্রয়। এ মাটিকে পড়তে না পারলে তো এ মানুষের প্রাণের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব হবে না; এ মাটির বুকের মাঝে বন্দি যে জল লুকিয়ে আছে, সে জলের কাছে পৌঁছোতে না পারলে তো শান্ত, ভিজে, মায়াভরা এ মাটিকে মনে হবে নিষ্প্রাণ পাথরের ঢেলা। এখানেই থাকুক এ আলোচনার নান্দিপাঠ, নৃত্যকলার ভাষায় বলি, এখানে থাকুক এ আলোচনার 'উঠান' পর্ব। 'উঠান' শব্দটির মধ্যেও রয়েছে মাটির স্পর্শ, তাই না?

দুই.

এবারে পদচারণা করা যাক্ ইতিবৃত্তে। ইতিহাসের প্রাক্-পর্বে, কিংবা পাথুরে পর্বের পর, স্বাভাবিক নিয়মেই আসে একটি আরণ্যক পর্ব, যে পর্বের অবসানেই আত্মপ্রকাশ করে জনবসতি, গড়ে ওঠে গ্রাম শহর, দেখা দেয় জীবনের কর্মচাঞ্চল্য। ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি এরকমই একটা গ্রহণযোগ্য ধারণাতেই উপনীত হয়েছেন যে, দুই কিংবা আড়াই হাজার বছর পূর্বের যে ভূখণ্ডটিকে আমরা বরাক উপত্যকা বলে চিহ্নিত করছি- গাঙ্গেয় সমভূমির সম্প্রসারিত এ উত্তরাংশ এ অঞ্চলটি ছিল গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত। এখানে মনুষ্যবসতির কোন চিহ্নই ছিল না। তবে নিশ্চিতই অরণ্যচারী কোন না কোন ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠীর আনাগোনা ছিল।

ভূতত্ত্ববিদদের অনেকেরই অনুমান, এ অঞ্চলটি একসময় ছিল সমুদ্রগর্ভে (স্যার চার্লস্ লেয়ল, 'প্রিন্সিপলস্ অব জিওলজি', পর্ব-১, পৃ. ৪৭০ থেকে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' ২য় ভাগ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬-এ উদ্ধৃত)। পরবর্তীকালের ভূবিজ্ঞানীরা বলেছেন 'মায়সিন' যুগেই এ মাটির আত্মপ্রকাশ (এম, এস, কৃষ্ণাণ, জিওলজি অব আসাম অ্যান্ড বার্মা)। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বরাক উপত্যকার ভুবন পাহাড়ের শিলাস্তর (basement-এর স্তর) নাকি এর স্বাক্ষর বহন করছে। এ থেকে আমরা এরকম ধারণা করতেই পারি, আধুনিক কাছাড়ে যদি ভুবন পাহাড়ই সর্বপ্রথম 'সুনীল জলধি হইতে' আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তবে এ ভুবনের আশপাশেই যে এখানকার প্রাচীনতম জনবসতি গড়ে উঠেছে, এটা অবিশ্বাস্য না-ও হতে পারে। তাছাড়া এটাও লক্ষণীয়, হাজার বছর পূর্বে এ ভুবন পাহাড়েই গড়ে উঠেছে এ অঞ্চলের প্রাচীনতম গুহামন্দির। আমাদের মাটির ইতিবৃত্তে যে ভুবন পাহাড় গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

আবার, আমাদের প্রাচীনতম মহাকাব্য, অর্থাৎ মহাভারতেও এ মাটির অস্তিত্ব স্বীকৃত। ভীমসেন-হিড়িম্বা কাহিনি, অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা কাহিনি আমাদের জানিয়ে দেয় পঞ্চপাণ্ডবের পদচারণায় ধন্য হয়েছিল এ কাছাড়ের মাটি। অবশ্য ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে ভিন্নমত পোষণও করেছেন। যদি মেনেই নিই মহাভারতে কাছাড়ের অবস্থিতি ভিত্তিহীন কল্পকথা, তবুও মহাভারত-কার বেদব্যাসের মানস-মানচিত্রে এ মাটির ক্ষীণতম যোগসূত্র অথবা এ যোগসূত্রের সম্ভাবনাটাই তো আমাদের এ ধূলিকে পরম রমণীয় করে তুলেছে, এটা অস্বীকার করার জো নেই।

গভীর অরণ্যের আচ্ছাদন থেকে মাটির মুক্তি, হাজার বছরের বনস্পতি-ছায়ার অন্ধকার সরিয়ে সূর্যালোক এবং মাটির মিলন যারা ঘটিয়েছেন, এরা আমাদের সেই প্রপিতামহের দল, যাদের হাত ধরে সুরমা-বরাক অববাহিকায় লাঙ্গল-ভিত্তিক সূচনা হয়, সূচনা হয় কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির, এবং এ অঞ্চলটিতে গড়ে ওঠে স্থায়ী বসতি। ইতিহাস জানায় যে খ্রিস্টিয় প্রথম সহস্রাব্দে আর্য-ব্রাহ্মণ্য জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশই এখানে সংঘটিত করেছিল প্রথম কৃষি-বিপ্লব। মুক্ত সমভূমিতে বনস্পতির একচ্ছত্র আধিপত্যের হয়েছিল অবসান, মানুষ মাটি চাষ করে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল, অপেক্ষা করছিল মাটি ফুঁড়ে শস্যবীজের অঙ্কুরোদ্গমের। 'চৌদিকে অরণ্য মাঝে' এমনি একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল সবুজ ধানক্ষেত, শুরু হয়েছিল এ মাটির নতুন ইতিহাস, 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা'-র ইতিহাস।

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ পর্বগুলোতে নিধনপুরের ব্রাহ্মণগণ, জয়তুঙ্গবর্ষের ভূমি গ্রহীতাগণ, ভাটেরার ভূমিপ্রাপক - এ অঞ্চলের অবাধ্য মাটিকে মানুষের বশে আনতে এরাই তো অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইতিহাসে এদের নামও রয়েছে। কিন্তু যাদের সহায়তা ছাড়া এ কাজ সম্ভবই হত না, সেই আর্যেতর ভ্রাম্যমান অরণ্যচারী মানুষ — এদের কথা ইতিহাসে অনুক্তই রয়ে গেল। এরাই তো শিকারের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। একটা সময় হয়ত জুমচাষের চেষ্টাও করেছিল। নতুন ভূমি গ্রহীতারা যখন এদিকে স্থায়ী বসতি করতে এলেন, তখন এরাও হ'ল এদের সহযোগী। এ মাটির সঙ্গে যে এদের লৌকিক প্রথা, ধর্মাচার, সংস্কারের যোগসূত্র রয়েছে, রয়েছে এখানকার স্থাননাম এবং জীবন জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শব্দসম্ভারেও।

মাটির ইতিহাসের খোঁজে আমরা যদি একাদশ-দ্বাদশ শতকে পৌঁছোই, দেখব মনুষ্য পদস্পর্শে এ মাটি ওই সময়ই নতুন জীবন লাভ করেছে। অবশ্য ইতিপূর্বে বঙ্গ-সমতট-হরিকেল-প্রাগজ্যোতিষপুর-ত্রিপুরা রাজত্বের ছত্রছায়ায় এখানে সমাজগঠন প্রক্রিয়া একটি সুসংবদ্ধ রূপ ধারণ করে ফেলেছে। এর পরবর্তীতে এ ভূমিতেই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের আগমন জন্ম দিল এক ভাবান্দোলনের। সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগানে এ মাটিতে স্ফুরণ হ'ল সহজিয়া সাধনতত্ত্বের। ভুসুকপাদ, কুকুটপাদ, ডম্বুরপাদ এবং তাঁদের সাধনসঙ্গিনীদের বিচরণে এ মাটি এবং এ 'গহন নঈ'-এর দুই তীরের জনজীবন আরও সচল ও সজীব হয়ে উঠল। প্রায় অনুরূপ সময়সীমায়ই 'চন্দ্রপুরী বিষয়া'তে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ মঠ, যাকে কেন্দ্র করে দেশ বিদেশের ভিক্ষু, শ্রমণদের আনাগোনা চলে দীর্ঘদিন। তারপর মাটি তার বুকের মাঝে টেনে নেয় সব চিহ্ন, রয়ে যায় কেবলই স্মৃতি।

তিন.

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে এ মাটিতে পদার্পণ ঘটে শত শত নরনারীর। জৈন্তাপুরের মানুষ এলেন বাঁশবেতের শিল্প নিয়ে; এরা আনলেন পাথরের জিনিসপত্র, কাঠের বাসন কোসন। তারপর এলেন ভাটি বাংলার মাঝির দল, এল বাউল গান, ভাটিয়ালী সুর, লোকায়ত তত্ত্ব। এলেন অসংখ্য হলধর। বদরপুর, কাটিগড়া থেকে ওরা ছড়িয়ে পড়লেন নতুন নতুন অনাবাদী জমিতে। শন, বাঁশ আর লতাপাতার আচ্ছাদনে গৃহের আঙ্গিনায় শোভা পেল কদলীবৃক্ষ, জলাশয়ে ভাসল হাঁসের দল, পশ্চিমে বাঁশ বাগানের মাথার উপর দেখা গেল পূর্ণিমার চাঁদ। শোনা গেল জীবনের কলরব। বরাকের নিসর্গ ঋতুতে ঋতুতে নতুন সাজে সজ্জিত হতে থাকল। হেমন্তে ফসল কাটার উৎসবে মত্ত হ'ল এ ভূমি। শীতের প্রবল প্রতাপ সহ্য করে বসন্তে উজ্জ্বল হাসির ছটা দেখা গেল নীল দিগন্তে। প্রবল বর্ষণে বাড়িঘর, জমিমাটি ডুবে গেলে মানুষ কাঠের নৌকোতে সাজিয়ে তুলল হাটের পশরা, জলে জলে চলল এদের সওদা- লাঙ্গলের ঈশ, জোয়াল, ফাল, মাছ ধরার জাল, সবজি সংগ্রহের টুকরি, পোনামাছের খলুই, চাল ঝাড়ার ডালা, চালনি আরও কত কি।

এরপর এলেন সুফি পির শাহজালাল, সুদূর ইয়েমেন থেকে। সঙ্গে এক পুটুলিতে কিছু মাটি, আর ৩৬০ জন আউলিয়া। শ্রীভূমির মাটির সঙ্গে এ পুটুলির মাটি মিলে গেল, পিঞ্জরে আনা একজোড়া কবুতর এ আকাশে বোধ করল স্বাচ্ছন্দ্য। অলৌকিক ক্ষমতায় এ পির বরাকের জলকে করে তুললেন সুপেয়। সঙ্গী আউলিয়ারা, যারা একাধারে মরমিয়া সাধক আবার অস্ত্রধারী যোদ্ধাও, এরা এখানকার অরণ্যের ব্যাঘ্রকুলকে আনলেন বশে। শাহজালাল নাকি ব্যাঘ্রবাহনে মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজা গৌড় গোবিন্দের। তিনি নদী পারাপার করতেন এক আশ্চর্য ভাসমান মৃগচর্মে ভর করে। এসব হয়ত বা মনুষ্য কল্পনা-সৃষ্ট, হয়ত বা প্রতীকীও। এদের হাত ধরেই এ মাটিতে প্রতিষ্ঠা পেল ইসলাম ধর্ম, মানুষ মাটির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক করল আরও নিবিড়। শাহজালালের রহস্যময় মাটির পুটুলি হয়ত বা কোন বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য ধারণ করে আছে; বরাকের জলকে সুপেয় করার কাহিনির গভীরেও নিশ্চিত কোন

ভিন্নতর তথ্য নিহিত রয়েছে। আর যে ৩৬০ আউলিয়ার কথা প্রচলিত এদের প্রয়াসেই সিলেট-কাছাড়ে সংঘটিত হ'ল দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃষিবিপ্লব, কথাটি বলেছিলেন ঐতিহাসিক সুজিৎ চৌধুরী, যদিও সময়াভাবে এ নিয়ে তেমন কিছু লিখে যেতে পারেননি। তবে তাঁরই প্রশ্রয়ে বর্তমান লেখক এ নিয়ে কিছু চিন্তাচর্চার প্রয়াস পেয়েছেন। একটু উদ্ধৃতি না দিলে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যাবে —

> A close study of the Syncretic-cult in Sylhet and in Barak Valley (especially in Karimganj district) would reveal that Muslim pirs, earned a niche in the folk-pantheon, venerated by Hindus and Muslims alike, have revolutionised the agro-economy of the time (14th-16th century AD). Badsa, Baghai, Manik pir, Sona Gazi and such others who have proved to be a cementing factor for the diverse society, have provided necessary spiritual force to the people to encounter the onslaughts of nature. Sujit Choudhury in his work on the subject <u>has left a meaningful suggestion in this regard</u>. It is, however, his conjecture that the folk godlings in Bengal (Badsa in Barak Valley) have brought the vast track of land under cultivation in between 14th to the 16th century in this part of N. E. Region. [A foot note (No. 5) in the present author's article, 'From Subanga to Bikrampur : A study of Social Formation and Political Transition in North-Eastern part of Cachar plains in South Assam – 661 - 1736', NEIHA Proceedings, 17th Session, 1997, Shillong]

শাস্ত্রে আছে আমাদের এ ধরিত্রী সাতসাগরের জলরাশি ধারণ করতে পারে, সপ্তপর্বতের বোঝাও তাঁর কাছে কিছু নয়; মাটি নীরবে সব বহন করে যায়। কিন্তু যখন তাঁর বুকে জমে ওঠে অকৃতজ্ঞতার বোঝা, মাটি কেঁপে ওঠে। পাছে অকৃতজ্ঞতার বোঝা বেড়ে যায় তাই এ দীর্ঘ উদ্ধৃতি।

ইতিহাস বলে আমাদের এ অঞ্চলের মাটি বিভিন্ন সময়ই ভূকম্পনে খণ্ড বিখণ্ড হয়েছে। চৈনিক শ্রমণ হিউ-এন সাঙ নাকি 'শিলিচটল' এসে দেখেছেন বিশাল 'সাগর'। এ সাগর কি ওমনিই শুকিয়ে গেল, নাকি কোন ভূমিকম্পনেই সরে গেল?

আমাদের মরমিয়া কবি দেওয়ান হাসন রাজা আবার এ ভূকম্পনের দুর্যোগমুহূর্তেই সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তাঁর পরম সত্তার। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন ভয়ংকর এক ভূমিকম্পে স্বজনহারা, প্রকৃতির বিরূপতায় কাতর হাসন রাজার জীবন একেবারে নতুন খাতে বইতে শুরু করল। তিনি এর স্মৃতিচারণ করে গেয়েছিলেন —

ভূঁইচালের বৎসরে বন্দে দরশন দিলরে
দয়া করিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইলরে।
'তুমি আমার, আমি তোমার', বন্দে যে বলিলরে
আমার দুঃখের কথা শুনিয়া
বন্দের দয়া হইলরে।।

চার.

বলেছিলাম, ওই আউলিয়া, পিরদের অনুপ্রেরণায় বনজঙ্গল, বাঘ শেয়াল, বিষধর সরীসৃপ এবং আরও অনেক বিপদ বাঁধা অতিক্রম করে এ মাটিতে চলল লাঙ্গল, মাঠে মাঠে দেখা দিল শস্যের হাসি; গৃহস্থের আঙিনায়, শান্ত নদীবক্ষে শোনা গেল মারিফতি, মুর্শিদি, বাউল, ভাটিয়ালি গান। এ মাটিতে রচিত হ'ল ভাসানের গান; এল

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম, এ মাটির সঙ্গে ঘটল মধুবৃন্দাবনের পবিত্র মাটির সংমিশ্রণ, মাটিতে আকুল হয়ে আছড়ে পড়লেন প্রেমরসে উন্মাদ মহাজন 'তোরা বইল্যা দেরে নগরবাসী, বৃন্দাবন কত দূরে/ গৌর চলছে ব্রজনগরে/ জয়রাধে শ্রী রাধার নাম নিয়ে'।

এখানের পল্লিকবি গানে গানে একাকার করে দিলেন শাহজালাল আর শ্রীচৈতন্যের ভূমিকে। ভাবোন্মাদনায় স্পর্শ করলেন এ মাটির বুকে ঘুমিয়ে থাকা ৩৬০ আউলিয়া আর মধুর প্রেম সংগীতের স্রষ্টাদের —

আইসি সিলেট যাইমু সিলেট
সিলেট থাকমু শুইয়া
যে মাটিতে ঘুমাই আছইন
তিনশো যাইট আউলিয়া...।
কান্দিয়া যে মাটিত ঘুমাইন হাসন রাজা
তার কান্দনে আইজও কান্দে
        রাইতর চন্দ্র তারা।
কান্দে আরকুম শিতালং শা
        কান্দে রাধারমণ রে
বাবা শাহজলালর দেশ
বাবা শ্রী চৈতন্যর দেশ
বাবা শাহপরাণর দেশ
        সিলেট ভূমি রে।।

উপসংহার :

এক গ্রামীণ বৃদ্ধ বলেছিলেন, মাটির নাকি আলস্য নেই। মাটি তার কাজ করেই যাবে। মাটিতে আলো হাওয়া আর জলের স্পর্শ লাগলেই দেখা যাবে এক চিলতে ঘাসের হাসি। সে বসে থাকতে পারেনা। আসলে মাটি মানে তো গতি, মাটি মানেই প্রাণ, মাটি মানে ক্রমাগত এগিয়ে চলা। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে মাটিরও ক্ষয় আছে, অবক্ষয় আছে, দুঃখ আছে। আছে তার কপট কটাক্ষও। আমাদের কৃতকর্মেই এ মাটি হয়ে যায় কর্মহীন, উদ্যমহীন, অলস। এমনকী প্রতিহিংসা-পরায়ণও। এ অলস মাটির বুকের মাঝে আশ্রয় পায়না কোন গোপন জলভাণ্ডার। এ অলস মাটির আকর্ষণে মৌসুমী বায়ু আর ছুটে আসেনা। মানুষ যতই অপরিণামদর্শী হয়ে উঠছে, অজৈব বর্জ্য পদার্থের পাহাড় যত জমিয়ে তুলছে মাটির বুকে, লোভ আর লাভের কোদালে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে মাটির শ্যামলিমাকে ততই বেড়ে চলছে এ অলস মাটির সাম্রাজ্য। এ মাটি আর আমাদের উষ্ণতার আহ্বান জানাবে না, ফুলে ফলে পল্লবে সেজে উঠবে না; মৌমাছি, প্রজাপতি, ভ্রমরা কিংবা বিহঙ্গকূলের সংগীতে মুখরিত হয়ে উঠবে না তার বুক। তা'র বুকের উপর শিকড় গেঁড়ে গজিয়ে উঠবে না বনস্পতির দল। মাটি রুষ্ট হলে আমাদের সমূহ বিপদ। অথচ চোখ মেলে তাকালেই আমরা দেখি আমাদের নরম, শান্ত, ভিজে, স্নেহময়ী মাটি দিনে দিনে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, রিক্ত হয়ে উঠছে। আমাদের বনাঞ্চল আজ জনপদ, সবুজ ধানক্ষেত হয়ে উঠছে কংক্রিটের জঙ্গাল। আমরা কি লক্ষ্য করি না আষাঢ়ের প্রথম দিবসে বরাকের আকাশ থাকে বৃষ্টিহীন। শ্রাবণের বুকের ভেতর যে সুপ্ত আগুন বৃষ্টির আচ্ছাদনে থাকত সংযত, তা আজ লেলিহান শিখায় পুড়িয়ে মারতে চায় আমাদের; হেমন্তের স্নিগ্ধ কুয়াশা নিশ্চিহ্ন, শীতের হাওয়ায় নেই পাতা ঝরানোর সংগীত, বসন্তেরও সেই রঙিন সাজ উধাও। এ সমস্ত কিছুর পেছনেই রয়েছে মাটির

অভিমান, মাটির ক্রোধ, মাটির প্রতিশোধস্পৃহা। আমরা যে মাটির মর্মকথা বুঝতে চাইনি। কিন্তু আমাদের কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী বুঝেছিলেন মাটির মর্মকথা, সমাপ্তিতে তাকেই স্মরণ করি —

মাটিরও নানা রঙের পোষাকের বায়না থাকে।
আমার ঘরের সামনে
যে এমব্যাঙ্কমেন্ট ও ড্রেনেজ ডিপার্টমেন্টের বাঁধ, তারও
থেকে থেকেই রং বদল হয়। বর্ষায় একরকম, শীতে
আরেক রকম।
...
মাটির রঙের বাহানা থাকলেও মাটি
বেনীআসহকলা জানে না।
মাটির রঙের সংখ্যা তাই সাত নয় — সাতশো সাত
হাজার সাত নক্ষত্র
হতে পারে —।

বরাক উপত্যকার তিনটি মেয়েলিব্রত : একটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা

প্রিয়ব্রত নাথ

'বারো মাসে তেরো পার্বণ' কথাটি বাঙালি জীবনে প্রবাদের মতো প্রচলিত। পুরো বছরজুড়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বরাক উপত্যকায়ও বিভিন্ন রকমের ব্রত পালিত হয়। ব্রত মূলত দু'ধরনের শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। কিছু কিছু লৌকিক ব্রত পুরুষেরা পালন করলেও বেশিরভাগ লৌকিক ব্রতই মেয়েদের দ্বারা পালিত হয়। এই মেয়েলি ব্রতগুলোর মধ্যে বরাক উপত্যকায় প্রচলিত তিনটি উল্লেখযোগ্য ব্রত হচ্ছে- সাবিত্রীব্রত, কার্তিকব্রত ও সূর্যব্রত।

সাবিত্রীব্রত বরাক উপত্যকার হিন্দু-বাঙালি মেয়েদের একটি অবশ্য পালনীয় ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশী থেকে অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত এই ব্রত পালনের সময়। নতুন বউদের এই ব্রতপালন বাধ্যতামূলক। তবে যদি কোন কারণে ওই নারী সেই বছর ব্রতপালনে অসমর্থ হন, তবে পরের বছর অন্যকোন নতুন বউয়ের সঙ্গে মিলে তাকে ব্রতটি করতে হয়।

ব্রত শুরু হওয়ার আগের দিন নিরামিষ খেয়ে সংযম পালন করতে হয়। ব্রত চলাকালীন ব্রতী একবেলা খান এবং শেষদিন তাকে উপোস থাকতে হয়। ব্রতের তিনদিন ব্রতীকে কিছু নিষেধ বা Taboo মানতে হয়। এই কদিন স্বামীর সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ, শস্যজাত কোন খাবার যেমন, চাল, গম ইত্যাদি; এমনকি লাঙ্গলে উৎপন্ন ফলমূল গ্রহণও নিষিদ্ধ। ব্রত চলাকালীন চাষীরাও মাঠে লাঙ্গল টানবে না।

এই ব্রতের মূল কামনা হচ্ছে স্বামীর মঙ্গল। ব্রতটির আচারে দেখা যায়, মেয়েরা উঠোনে মাটি দিয়ে বেদি বানিয়ে এর চারকোণে চারটি বটগাছের ডাল পুঁতে দেয়। এরপর লাল সুতো দিয়ে তিন বা পাঁচবার এই ডালগুলোকে পেচানো হয়, সুতোয় ঝোলানো হয় বটপাতা। একটি বটপাতায় পিটুলি দিয়ে সত্যবানের ছবি ও অন্যটিতে সিঁদূর দিয়ে সাবিত্রীর ছবি আঁকা হয়। মাঝখানে কালো গুড়ি দিয়ে আঁকা হয় যমরাজের ছবি। বেদির ওপর তামার থালায় একটি কাপড়ের পুঁটলিতে ১০৮ টি ধান রাখা হয়। এক্ষেত্রে চাষের ধান হলে চলবে না- অ-রোয়া বা এমনিতে গজিয়ে ওঠা গাছের ধান হতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় এই ধানকে বলে 'ঝরাধান'। পুটলিটাকে বলা হয় 'বানা'। 'বানা'র সঙ্গে একই থালায় ১০৮ টি কাঠি, দুর্বা ও তালপাতায় তৈরি কোদাল ও ঝুড়ি রাখতে হয়। সবমিলে বেদিটাকে একটা ছোট অরণ্যের মতোই মনে হয়। ব্রতটির গানেও তাই অরণ্যের কথা পাওয়া যায় —

দেখ অরণ্যের মাঝে,
পতির হিতে সতী কইন্যায় সাবিত্রীকে পূজে।
বিচিত্র আসনের মাঝে ঘট আরো শিরা,
নানাবিধ পূজা করে বনের পুষ্প দিয়া।

পুরো ব্রতটিই নারীরা পালন করেন। কোথাও কোথাও পুরোহিত অংশগ্রহণ করলেও তার ভূমিকা থাকে সীমিত।

আমরা জানি যে সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানটি মহাভারতের অন্তর্গত। এবং এই উপাখ্যানই ব্রতটির পটভূমি

রচনা করেছে। কিন্তু এর গানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রামায়ণ প্রসঙ্গ। যেমন সাবিত্রীর জন্মগানে দেখা যায় —

কী আনন্দ হইল আজি জনক রাজার পুরে,
জন্মিলা সাবিত্রী কইন্যা অশ্বপতির ঘরে।

কিংবা,

দেখ অযোধ্যা নগর,
সাবিত্রী পূজিতা সীতায় হরষিত মন।
ফলমূল খাইয়া সীতায় করইন উপবাস,
সাবিত্রী পূজিতা সীতায় পরম উল্লাস।

লোকমানস এখানে নিজস্ব ঢঙে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এর সঙ্গে রামায়ণ প্রসঙ্গও জুড়ে দিয়েছে।

চতুর্থদিন ব্রত শেষে কিছু অনুষ্ঠান থাকে। এদিন ব্রতী ও তার স্বামী ভোরে স্নান সেরে আসার পর বেদির সামনে দাঁড়ান। ব্রতী তখন তার স্বামীকে বরণ করেন। এরপর পুঁটলিতে রাখা ধান থেকে চাল বের করে স্বামীকে খেতে দেন। স্বামীকে এই চাল কলার সঙ্গে মিলিয়ে এক চেষ্টায় গিলতে হয়। এরপর ব্রতী নিজে সিঁদূর পরেন ও স্বামীকে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন। এরপর স্বামীর পা ধুয়ে জল পান করা ও নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে তার পা মুছে রীতিও রয়েছে। পরে ফল ও দুধ খেয়ে উপোস ভাঙা হয়। এদিন দুপুরের খাবারে ব্রতীকে মাছ খেতেই হয়। চতুর্থদিনের এই আচারটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে এদিন গাওয়া একটি গানে। গানটি এরকম —

ত্রয়োদশী চতুর্দশী পূজিলা সাবিত্রী,
অমাবস্যা দিনে কইন্যা রইলা উপবাসী।
জনকরাজার কইন্যা ও যে সীতা গো সুন্দরী,
সত্যবানকে দিতা বানা দূর্বা মুটি আনি।
চারিদিনের উপবাসী বর্ত পূর্ণ দিলা,
রজনী প্রভাতে তাইন হাল যুগাইলা।
উত্তম কুরশীর চৌকি বিচিত্র মন্ডল,
তার উপরে বইছন রাম করিয়া আসন।
ভিঙ্গারের জলে সীতার পদ ধুয়াইলা।
শাড়ির কুট দিয়া কইন্যায় পদ মুছাইলা।
সাতবার রামের পদে প্রণাম জানাইলা।
রামের আশীর্বাদে সীতা সাবিত্রীসম হইলা।

সবশেষে ব্রতী জোয়াল লাঙল বাঁধা একজোড়া বলদের জোয়ালের বাঁধন সাতবার খুলে দেন। এই জোয়াল খুলে দেবার আচারের মধ্য দিয়ে ব্রতটি শেষ হয়।

সাবিত্রীব্রতের আচার বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে এটি একটি উর্বরতাভিত্তিক জাদুকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান। স্বামীর মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে এই ব্রতে মূলত শস্য ও সন্তান কামনার ভাবই প্রকাশিত। সাবিত্রী ব্রতের গানেও তাই আমরা পতি-পুত্রের কল্যাণের কথা পাই। যেমন —

তুমরা শুন সখীগণ,
সাবিত্রী ব্রতের বিধান করি নিবেদন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি,
পতি-পুত্রের কল্যাণে কন্যা পূজয়ে সাবিত্রী।

অধ্যাপিকা শীলা বসাক এ সম্পর্কে বলেছেন —

"আদিম যুগের শিকারজীবী সংগ্রহকারী আর্থ সামাজিক স্তর থেকে শুরু করে কৃষিজীবী আর্থ সামাজিক স্তরের মানুষরা সন্তান ও শস্য কামনায় যে উর্বরতামূলক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (জাদুক্রিয়া) সম্পন্ন করতেন, সেই আদিম জাদুক্রিয়াটিই কালের গতিতে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা সাবিত্রী ব্রতের রূপ গ্রহণ করেছে।"[১]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখি যে ব্রতটির সময় নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরাক উপত্যকায়ও শালিধান বপনের উপযুক্ত সময়। তবে লাঙ্গলে উৎপন্ন কোন খাবার গ্রহণ না করা, শেষদিন লাঙ্গলের জোয়াল সাতবার খুলে দেওয়া ইত্যাদি আচারে লাঙ্গলের প্রতি যে অনীহা প্রকাশিত হয় তাতে বিষয়টিতে একটি স্ব-বিরোধিতা লক্ষিত হলেও আসলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। অধ্যাপক সুজিৎ চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেছেন —

> "যে কৃষিযন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার নারীকে তার প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যের আসন থেকে স্থানচ্যুত করেছিল, সেই লাঙ্গলের প্রতি প্রাচীন নারীসমাজের একধরনের বিদ্বেষ বীতরাগ সৃষ্টি হয়েছিল, এটাই সম্ভব। সেই মানসিকতার জের আজও কাটেনি। আজকে ব্রতধারিণী নিজের অজান্তেই সংঘাতের সেই ধ্বজাটি বয়ে চলেছেন- সাবিত্রী ব্রতে তাই লাঙ্গল প্রসূত সামগ্রী সর্বথা পরিত্যাজ্য।"[২]

অর্থাৎ যে-লাঙ্গলের আবিষ্কার সামাজিক, পারিবারিক, কৃষি সবক্ষেত্রেই পুরুষপ্রাধান্যের সূচনা করেছিল এবং মেয়েদের নির্বাসিত করেছিল অন্তঃপুরে, সেই লাঙ্গলের প্রতি নারীদের একটা বিদ্বেষভাব থাকাই স্বাভাবিক। এই ভাবই সাবিত্রীব্রতের আচারে প্রকাশিত।

অধ্যাপক সুজিৎ চৌধুরী এই ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনি ও আচারকে মিশর, পশ্চিম এশিয়া, গ্রীসের পুরাণ কাহিনিগুলোর দেবতার মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কাহিনির সঙ্গে এক করে দেখেছেন। এই ভাবনাকে আমরা যদি মেনে নিই তাহলে চতুর্থ দিনের আচারের সঙ্গে এর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চতুর্থদিন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামীকে বরণ করা আসলে পুনরায় বিয়ের রূপকমাত্র। আর এদিনই দুপুরে মাছ খাওয়া আসলে সধবাত্ব অর্জনেরই রূপক। কারণ আমরা জানি যে বিধবা মেয়েদের আমিষ খাওয়া নিষিদ্ধ। শস্যবীজপূর্ণ কাপড়ের পুঁটলি বা 'বানা' শস্যের প্রাণশক্তির ধারক। এই 'বানা' গ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্রতী মেয়ের স্বামী, যিনি হয়ে যান পুনরুজ্জীবিত সত্যবানের প্রতিভূ, নিজের প্রজনন শক্তি বাড়িয়ে নেন। এই 'বানা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বণ্ড' থেকে — যার অর্থ পুরুষ জননেন্দ্রিয়। এখানে শস্য ও উৎপাদনের ভাবনা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। ব্রতী নারীর নিজে সিঁদূর পরা এবং স্বামীকে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেবার মধ্যে প্রতীকী ভাবনা ব্যঞ্জিত। সিঁদূর এখানে রজোপ্রতীক এবং চন্দন পুরুষবীর্যের প্রতীক। প্রায় একই রকম ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় বটপাতায় সিঁদূর দিয়ে সাবিত্রীর ছবি এবং সাদা পিটুলি দিয়ে সত্যবানের ছবি আঁকার মধ্যে।

আগেই বলা হয়েছে যে সাবিত্রীব্রতের আচারের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস, মিশর ইত্যাদি দেশের দেবতার মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কাহিনির একটা সম্পর্ক আছে। এদিক থেকে মিলিয়ে দেখলে বেদির ওপর ছোট অরণ্যের ছবি ফুটিয়ে তোলার তাৎপর্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। কারণ আমরা জানি যে মৃত দেবতার পুনরুজ্জীবন লাভের এই কাহিনিগুলোর উপাদান এসেছে প্রকৃতিজগৎ থেকে। এজন্যই বোধহয় আদিম অরণ্যপরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। স্বামীর পা ধোয়া জল পান বা চুল কিংবা আঁচল দিয়ে তার মুছে দেবার আচারটিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের দাসী হিসেবে প্রতিপন্ন করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এখানে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের অবমূল্যায়নের চিত্রটিও ধরা পড়ে সহজে।

২.

বরাক উপত্যকার হিন্দু বাঙালি সমাজে প্রচলিত আরেকটি মেয়েলি ব্রত হচ্ছে কার্তিকব্রত। এই ব্রত কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে পালিত হয়। বিশেষত পুত্র কামনায় এয়ো মেয়েরা এই ব্রত পালন করেন। ব্রতটির মূল অনুষ্ঠান হয় সন্ধেবেলা। মূল জায়গায় কার্তিক ও উষার মূর্তি বসানো হয়। সামনে থাকে দুটো ঘট। ঘটগুলো যথারীতি পান,

সুপুরি, নারকেল, সিঁদূর ও চন্দন দিয়ে সাজানো হয়। এর চার কোণায় বাঁশের চারটি সরু কঞ্চি গেঁথে এর গোড়ায় একটি করে কলা রাখা হয়। খুঁটিগুলো কতগুলো সুতো দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেচিয়ে রাখা হয়। এই ব্রতের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে কার্তিকের 'জালা' ('জালা'- অঙ্কুরিত ধান)। এটা বানানোর জন্য মাটিতে চারকোণা বা গোল করে গর্ত খোঁড়া হয়। এর সামনে আরকটি গর্ত খোঁড়ে মধ্যে নালা বানানো হয় যাতে জল যেতে পারে। এতে আগে থেকে ভিজিয়ে শেকড় গজিয়ে তোলা তিল, শস্য, চানা, মটর ইত্যাদি রাখা হয়। গর্তটির ওপরে তিন কোণা করে আল বানানো হয়। গর্তের চারপাশে রাখা হয় চুন, খৈ, চিড়া, ধান দিয়ে ভর্তি করা চারটি ছোট ছোট মাটির ঘট। এছাড়াও ব্রতীরা প্রত্যেকে একটি করে তীর-ধনুক এতে গেঁথে রাখেন। হলুদ ও কলা গেঁথে রাখবার রীতিও রয়েছে। এতে পুরোহিত অংশ নিলেও তার ভূমিকা থাকে সীমিত। এদিন মেয়েরা সারারাত জেগে গান করেন। এধরনের একটি গান হচ্ছে —

রাত্রি পুহাইয়া গেলে কাকে পাড়ে রাও,
এখননি তুমি ঘর শুইয়া নিদ্রায় যাও।
তুমার দুয়ারে উষা কার্তিক সেবারে
সেবা দিয়া পূজা দিলাম কী বর দিলায় মোরে,
ধানর বর দিয়া গেলাম ধনাইরে পাঠাইয়া,
পুত্রের বর দিয়া গেলাম আপনে আসিয়া।

গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'জালা'য় প্রহরে প্রহরে জল ঢালা হয়। জল ঢালার সময় বলা হয় —

আইল দেও কাচা কাট,
জালায় ঢাল পানি।
অমুকের বউ আয়োরানি,
জালায় ঢালইন পানি।

('অমুক' — যার স্ত্রী জল ঢালে তার নাম বলা হয়; 'আয়োরানি' — এয়ো স্ত্রীলোক)

কোথাও কোথাও এই 'জালা'র বদলে অন্য একটি নকল ধানক্ষেত বানানো হয়। ব্রতের প্রায় পনেরো দিন আগে মেয়েরা মাটির সরার ওপর কাদামাটি দিয়ে এই ক্ষেত বানান। এতে বীজধান পুঁতে জল ঢালা হয়। ব্রতের দিন আসতে আসতে বীজগুলো চারায় পরিণত হয়। এদিন মাটি বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে তাকে সাজিয়ে ঐ নকল ধানক্ষেতে লুকিয়ে রাখা হয়। পরে এই নকল ধানক্ষেতটি কার্তিকমূর্তির পাশে রেখে দেওয়া হয়।

যেহেতু ব্রতটির মূল উদ্দেশ্য পুত্রকামনা সুতরাং এর আচার বিশ্লেষণ করলে সহজেই দেখা যায় যে ব্রতটির সঙ্গে উর্বরতাকেন্দ্রিক ভাবনা স্পষ্টভাবে জড়িত। কার্তিক ব্রতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন পান, সুপুরি, নারকেল, সিঁদুর, চন্দন ইত্যাদি সবগুলোর সঙ্গে উর্বরতাকেন্দ্রিক ভাবনার স্পষ্ট যোগ রয়েছে। পানের সঙ্গে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের সাদৃশ্য রয়েছে; আবার পান-সুপুরি একসঙ্গে বহুফলনের প্রতীক; সিঁদূর রজোপ্রতীক, আর চন্দন হচ্ছে পুরুষবীর্যের প্রতীক, নারকেল গর্ভধারিণী মেয়ের প্রতীক। ব্রতটির অন্যতম উপকরণ 'জালা' বা অঙ্কুরিত ধান একদিকে যেমন বহুফলনের প্রতীক তেমনি অন্যদিকে শস্যকেন্দ্রিক উর্বরতার ভাবনাকেও ব্যঞ্জিত করে। 'জালা' বলতে এখানে অঙ্কুরিত ধানকে বোঝালেও এতে ধানের বদলে চানা-মটর ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। এর চারপাশে মেয়েরা যে তীরধনুক গেঁথে রাখেন এটা সম্ভবত শস্যক্ষেতকে পশু-পাখিদের থেকে রক্ষা করার একটা প্রতীকী আচার। হলুদ ও কলার সঙ্গে প্রজননকেন্দ্রিক ভাবনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে হলুদ ও কলা গেঁথে রাখবার তাৎপর্য সহজেই অনুমান করা যায়।

ব্রতটিতে যে প্রতীকী শস্যক্ষেত বানানো হয় তা যে শুধু বরাক উপত্যকাতেই প্রচলিত তা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এধরনের ক্ষেত বানানোর রীতি রয়েছে। পশ্চিম এশিয়া এবং গ্রীসে এডোনিস-এর পুজোতে এধরনের শস্যক্ষেত তৈরির নিয়ম ছিল বলে এই ধরনের শস্যক্ষেতের নাম রাখা হয়েছে 'Adonis Garden'। উক্ত আলোচনায় সহজেই বোঝা যায় যে এ ধরনের 'এডোনিস গার্ডেন'-এর সঙ্গে শস্যকেন্দ্রিক উর্বরতা ও মানবিক উর্বরতার ভাবনা সমন্বিত। এর সমর্থন পাওয়া যায় সমাজবিজ্ঞানী জেমস্ ফ্রেজারের বক্তব্যেও। তিনি বলেছেন —

"Gardens of Adonis are cultivated by the Hindoos with the intension aparently of ensuring the fertility both of the earth and of the mankind."[৩]

সুতরাং কার্তিকব্রতের আচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে ব্রতটিতে মানবিক উর্বরতা ও শস্যকেন্দ্রিক উর্বরতার ভাবনার সমন্বয় ঘটেছে।

৩.

বরাক উপত্যকার আরেকটি জনপ্রিয় ব্রত হচ্ছে সূর্যব্রত। মাঘ মাসের রবিবার এই ব্রত পালিত হয়। এয়ো নারীরা সন্তানের মঙ্গলকামনায় আর বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় এই ব্রত পালন করে। ব্রতের আগের দিন সংযম পালন করতে হয়। এদিন রাতেই অধিবাস। এদিনই বাড়ির উঠোন ভালো করে পরিষ্কার করে লেপে তাতে একটি গোলাকার ও একটি চারকোণা আকারের ছোট ছোট দুটি পুকুর কাটা হয়। এরই সামনে বেদি বানিয়ে তাতে কলাগাছের চারা রোপণ করা হয়। ব্রতের দিন খুব ভোরে স্নান সেরে ব্রতীরা সূর্য ওঠার আগে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। এটা খুব নিরাপদে রাখা হয় যাতে নিভে না যায়। কারণ এটা সূর্যাস্ত পর্যন্ত জ্বলার নিয়ম। এই প্রদীপ দিয়ে প্রহরে প্রহরে সূর্যকে বন্দনা করতে হয়।

আগের দিনের কাটা পুকুরগুলির মধ্যে চারকোণা পুকুরে হলুদগোলা জল ও গোল পুকুরটি দুধ দিয়ে ভরা হয়। বেদির ওপরে থাকা কলাগাছটি আমলকি বা হরিতকি, তাল, বেল, খেজুর ইত্যাদি গাছের ডাল, পাতা দিয়ে সাজানো হয়। এর সামনে পাঁচ ধরনের গুড়ি দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। আলপনায় সূর্য, পাখি, স্বস্তিকা ইত্যাদির ছবি থাকে। মাঝে মাঝে প্রদক্ষিণ করে মেয়েরা এই পুকুরগুলো থেকে জল ও দুধ চারদিকে ছিটিয়ে দেয়।

এই ব্রতে মূল ব্রতীকে একটা নিষেধ বা taboo মানতে হয়। তাকে ব্রত শেষ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ধামাইল নাচও এই ব্রতের অন্যতম একটি অঙ্গ। মূল ব্রতের জায়গার পাশে আরেকটি জায়গায় রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবিকে নানাভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। এটা প্রদক্ষিণ করেই ব্রতীরা সারাদিন ধামাইল নাচ নাচেন। সারাদিন এভাবে ব্রত করে সন্ধেবেলা কলাগাছটিকে পুকুরের ধারে রোপণ করে ব্রতীরা পায়েস খেয়ে উপোস ভাঙেন।

বাঙালি জীবনে এ ধরনের সূর্য উপাসনার একটা বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বিয়ের আচারেও সূর্য অর্ঘ্য দেবার রীতি প্রচলিত। এ সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিত নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন —

> "গুপ্ত পর্ব হতেই উদীচ্যবেশী ঈরাণী ধ্যানকল্পনার সূর্যপূজা বাঙলাদেশে সুপ্রচারিত হইয়াছিল এবং আদিপর্বের শেষ পর্যন্ত তাহার প্রচার ও প্রসার বাড়িয়াই গিয়াছিল। বাঙলাদেশের অসংখ্যস্থানে প্রাপ্ত সূর্য প্রতিমাই তাহার প্রমাণ। সেন পর্বে তো এই ধর্ম রাজধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। বিশ্বরূপ ও কেশব সেন ছিলেন পরম সৌর। সূর্য প্রতিমা পূজার এত প্রসারের কারণ বোধ হয় সূর্যদেব সকল রোগের আরোগ্য কর্তা বলিয়া বিবেচিত হইতেন।"[৪]

সূর্য উপাসনার এক ধরনের লৌকিক রীতিও যে বাংলায় প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ আমরা মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে পাই। মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য যেমন 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' ইত্যাদিতে সূর্যবন্দনার প্রসঙ্গ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে ইতুর ব্রত পালিত হয়। সূর্যের বিভিন্ন নামের মধ্যে দুটো হচ্ছে 'মিত্র' ও 'আদিত্য'। ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে শব্দদুটো আলাদাভাবে বিবর্তিত হয়ে 'ইতু' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। 'ইতু' ব্রতও সূর্যব্রতের মতোই রবিবারে পালিত হয়। এর ব্রতকথায় শোনা যায় —

করিলে ইতুর ব্রত বন্ধ্যা নাম যায়।
সময়েতে বিভা হয় তাহার মায়ায়।।[৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের ইতু ব্রতের সঙ্গে বরাক উপত্যকার সূর্যব্রতের অনেকটা মিল রয়েছে। এই প্রাচীন ও সর্বব্যাপ্ত সূর্য উপাসনাই বিবর্তিত ও লোকায়ত রূপে বরাক উপত্যকার সূর্যব্রতের রূপ নিয়েছে এরকম একটা ধারণা করা যায়।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ব্রতটি পুরোপুরিভাবে একটি উর্বরতাকেন্দ্রিক ও জাদুবিশ্বাসগত ব্রত। স্বাভাবিকভাবেই ব্রতটির কামনা সন্তানলাভ। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই সূর্যকে উর্বরতাশক্তির উৎস বলে ভাবা হয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে সন্তান কামনায় সূর্য উপাসনা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এছাড়া আমরা জানি কলাগাছ বহু উৎপাদনের দ্যোতক। তাই এতে কলাগাছকে বিশেষভাবে পুজো করা হয়। ব্রত শেষে কলাগাছকে পুকুরপারে রোপণের সঙ্গে, বিয়ের আচারে কনের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া কলাগাছ বরের বাড়ি রোপণের আচারের সাদৃশ্য রয়েছে। দুটো ক্ষেত্রেই মূল উদ্দেশ্য মানবিক উর্বরতা। কলাগাছ যেহেতু তাড়াতাড়ি বহু ফল দেয় তাই এক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে কলাগাছকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আকৃতিগত জাদুবিশ্বাসের দিক থেকে দেখলে দুধভরা গোল পুকুরটি হচ্ছে পুরুষ শুক্রাশয়ের প্রতীক। দুধ পুরুষবীর্যের প্রতীক। চারকোণা পুকুরের হলুদ জল রোগ প্রতিষেধক। হলুদকে আবার কেউ কেউ যৌনতার প্রতীকও বলেছেন। ব্রত শেষে পায়েস খাবার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস লুকিয়ে থাকতে পারে। বিশ্বাসটি পুরাণ থেকেও আসতে পারে। 'রামায়ণ'-এ আমরা দশরথের তিন রানিকে পুত্রকামনায় যজ্ঞ শেষে পায়েস খেতে দেখি।

সূর্যব্রতে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার গান গাওয়ার পেছনে মূল কারণ সম্ভবত লোকসমাজে কৃষ্ণকাহিনির ব্যাপক জনপ্রিয়তা। এ ব্যাপারে আরেকটি অনুমানও খুব অসঙ্গত নয় যে পুরাণে যেহেতু সূর্য ও কৃষ্ণকে অভিন্ন করে দেখানো হয়েছে সুতরাং এই অভিন্নত্বের ধারণা বিবর্তিত হয়েছে লোকসমাজেও। 'মার্কেণ্ডেয় পুরাণ', 'পদ্মাপুরাণ', এমনকি 'ঋগ্বেদ'এও সূর্য ও কৃষ্ণের অভিন্ন রূপ দেখানো হয়েছে। 'ঋগ্বেদ'-এ বলা হয়েছে যে কৃষ্ণের ঘোড়া নব্বইটি। তিনি তাদের চারটি নাম ও গতি দান করেছেন। নব্বইকে চার দিয়ে গুণ করলে এর ফল দাঁড়ায় তিনশ ষাট। পণ্ডিতদের অনুমান এটাই সূর্যের বর্ষচক্র। প্রধান চারটি ঋতু হচ্ছে ঘোড়াগুলোর নাম। 'যজুর্বেদ'-এর 'শতপথব্রাহ্মণ'-এ পাই বিষ্ণুর ছিন্ন মাথা হচ্ছে সূর্য। তাই বলা যায়, লোকসমাজে বিষ্ণু, নারায়ণ, সূর্য এদের অভিন্নত্বের ভাবনা সম্ভবত পুরাণের ভাবনারই বিবর্তিত রূপ। এখন অনেক জায়গায় দেখা যায় যে পুরোহিত এসে পুজো করেন সূর্যের আবাহন করেন, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এজন্য এটা ভাবা ভুল হবে যে এর সঙ্গে বৈদিক বা পৌরাণিক অনুষঙ্গ জড়িত। বৈদিক আচারগুলো আসলে পরবর্তীকালের সংযোজনমাত্র ব্রতটি একান্তই লৌকিক ও মেয়েলি।

সার্বিক আলোচনায় দেখা যায় যে ব্রত তিনটিতে আদিম মানুষের শস্য ও সন্তানকামনার ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ আলোচিত তিনটি ব্রতই উর্বরতাসূচক। আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় মেয়েদের একটা বিশিষ্ট 'টাইপ' হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস যেন লুকিয়ে রয়েছে ব্রতগুলোতে। স্বামীর মঙ্গলকামনা, ভালা স্বামী লাভ করা, পুত্র লাভ করা ইত্যাদি কামনা প্রকাশক এই ব্রতগুলো আসলে মেয়েদের পুরুষনির্ভর করে তোলার কল্পিত ছক। ফলে মেয়েরা ভাবতে শুরু করে যে পুরুষের স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই জীবন সার্থক। ফলে মেয়েদের পরিবার নির্ভরতা বাড়তে থাকে। এতসবের মধ্যেও ব্রতগুলোর একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে। একঘেয়ে সাংসারিক জীবনে মেয়েদের ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দেয় এই ব্রতগুলো। তাদের বিনোদনেরও অন্যতম মাধ্যম এই ব্রত। এ কারণেই বোধ হয় বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের যুগেও এই ব্রতগুলো বরাক উপত্যকার লোকসমাজে স্বমহিমায় সাবলীলভাবে টিকে রয়েছে আজও।

তথ্যসূত্র :

১. শীলা বসাক: 'বাংলার ব্রতপার্বণ', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৮, পৃ. ১১৬।

২. সুজিৎ চৌধুরী: 'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য কিংবদন্তীর পুনর্বিচার', কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০০, পৃ. ২৩।

৩. James Frazer: 'The Golden Bough' London: (Source Internet).

৪. নীহাররঞ্জন রায়: 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১৯।

৫. শীলা বসাক পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।

বরাক উপত্যকার লোকছড়ায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র

প্রভাসচন্দ্র নাথ

লোকসাহিত্যের অঙ্গনে ছড়া এক অনবদ্য সৃষ্টি। লোকজীবনে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষাপটে হৃদয়ের আবেগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এসব ছড়া আপন বৈশিষ্ট্যে সর্বজনীনতা লাভ করে জনজীবনে এক বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। তা সর্বকালের সকল ভাষাভাষীর অন্তরের বস্তু। তাই লোকজীবনে ছড়ার স্বচ্ছন্দ বিচরণ বিশেষ লক্ষণীয়। তা জনজীবনে এনে দেয় এক ভিন্ন রুচির আস্বাদন। অতি পুরনো দিন থেকে ছড়া লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং তা ছড়ার এক বৈশিষ্ট্য।

বরাক উপত্যকায় এরূপ ছড়া সর্বত্র প্রচলিত এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যেগুলো এ উপত্যকার লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব ছড়া সহজবোধ্য সরল ভাষায় প্রাণের আবেগে রচিত বলেই সর্বজনীনতা লাভ করেছে। লোকছড়াগুলো বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, যেমন — ছেলেভুলানো বা ঘুমপাড়ানো ছড়া, সংস্কৃতিমূলক ছড়া, হাস্যরসিকতাপূর্ণ ছড়া, বিভিন্ন ধরনের খেলার ছড়া, ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত ছড়া প্রভৃতি। এখানে ছেলেভুলানো বা ঘুমপাড়ানো ছড়ার দু'একটি উল্লেখ করছি —

ডুপিরে ডুপি আইলে আইলে যাইচ
রাজার খট-খটি ধান খুটিয়া খাইবে চাইচ।
পাকিলে চুকিলে ডাল (অ) বইয়া খাইচ
ডালডুল ভাঙ্গিলে তেলিনীর বাড়ীত যাইচ।
তেলিনীএ দিব তেল, মালিনীএ দিব ফুল
বিয়া অইত (অ) পিপরায় মারে ঢুল (ঢোল)

এ ছড়ার চিত্রে পাখি, রাজার ধানক্ষেত, তেলিনী-মালিনী প্রভৃতির উল্লেখের পাশাপাশি পিঁপড়ের দ্বারা রাজার বিয়ের ঘোষণার চিত্র লক্ষিত হয়। পিঁপড়ের ঢোল পিটিয়ে জৈন্তারাজার বিয়ের ঘোষণা উপহাস বা পরিহাসমূলক কিছু নয়, বরং তা কল্পনাপ্রসূত এবং ছড়াটি জৈন্তার সঙ্গে বরাক উপত্যকার সম্পর্কের স্মৃতি বহন করছে। ছেলেভুলানো ছড়া হলেও এর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক পটভূমিকা মিলে। কান্নারত মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মা-ঠাকুরমারা ছড়া কেটে বলেন —

ও ময়না কান্দিও না রসের গলা ভাঙ্গিও না
বিয়া দিমু সাজাইয়া টেকা লইমু বাজাইয়া।

ছেলেভুলানোর সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে ছড়াগুলো যে জনজীবনের ধারা ও সামাজিক কিছু চিত্র তুলে ধরে তা অবশ্যই অনুধাবনের বিষয়। ছড়াটির সৃষ্টিকালীন সময়ে বিয়েতে সমাজে যে পণপ্রথা ছিল 'টেকা লইমু বাজাইয়া' কথাটি তা প্রতিপন্ন করে। পণপ্রথা নিয়ে এরূপ আরও ছড়া পাওয়া যায় —

খাইলাম দাইলাম বেওয়াই তত্ত্ব কথা কও
আর কালিআনা পুড়ি তোমার তিশ টেকা লও।
(ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য সংগৃহীত)

উক্ত ছড়াটি তৎকালীন সামাজিক বিয়েতে পণপ্রথার একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আরও রয়েছে —

ঝুলে ময়না ঝুলে বাইঙ্গইন গাছের তলে
বাইঙ্গইন অইল (অ) খাইবার লাখ
ময়না অইল (অ) বিয়ার লাখ।

এ ছড়ায় মেয়েকে 'ময়না' বলে দোল খাওয়ানো হচ্ছে। শব্দটির মধ্যে অপত্য প্রেম ফুটে উঠেছে। সে বেগুনের মত বেড়ে উঠুক এবং তাকে বিয়ে দেবার এক ভবিষ্যৎ নিভৃত আনন্দ মায়ের মনে উকি মারছে। এরূপ ছেলেভুলানো অপর একটি ছড়া —

আত্তিরে আত্তি পান খাইয়া যা
খুকুর হড়ি পাগলা অইছে।
তাইরে লইয়া যা।

এখানে হাতি ও শাশুড়ির কল্পিত রূপ দিয়ে অতি সহজেই শিশুকে ভুলিয়ে রাখার একটি সুন্দর ছবি অঙ্কিত হয়েছে। এরূপ অজস্র ছড়া গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

চলমান জনজীবনে বিভিন্ন খেলাধুলায়ও নানা ছড়া প্রচলিত আছে। এর মধ্যে দু'ধরনের খেলা পরিলক্ষিত হয়। একটি অভ্যন্তরীণ খেলা (Indoor game), অপরটি প্রাঙ্গণের খেলা (Outdoor game) যেমন — হাডুডু, টাঙ্গল-বেঙ্গি বা ডাণ্ডাগুল্লিল্প, বেতবন্দী, গুল্লা প্রভৃতি প্রাঙ্গণের খেলা এবং মেয়েদের ফুলগুটি ও আরও কিছু খেলা আছে তা অভ্যন্তরীণ খেলা। এসব বিভিন্ন খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অজস্র ছড়া রয়েছে। খেলার ছড়াগুলো সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত। কিছু খেলার ছড়া খেলার নিয়মানুসারে একশ্বাসে উচ্চারণ করতে হয় এবং এগুলোকে 'একশ্বাসী' ছড়া বলা চলে। আবার কতকগুলো খেলার ছড়া একশ্বাসে উচ্চারণ উচ্চারণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। হাডুডু, বেতবন্দী, গুল্লা প্রভৃতি খেলার ছড়া একশ্বাসে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন —

চলবডিড হারা সিপাইকে মারা
সিপাইকে লেটো বেটো বাঙ্গালকে ধরা।

সম্ভবত সিপাহি বিদ্রোহের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়াটির উদ্ভব। এখানে 'বাঙ্গাল' শব্দটি বাঙালি জাতিকেই বোঝাচ্ছে। এ ছড়ায় খণ্ডিত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অপর একটি ছড়ায় আছে —

আমার ছত্রে মারিলে কুথায় নিয়া গাড়িস্‌লে
শৃগাল শকুনী খায় রাঙ্গা মাটি দেখা যায়।

এখানে 'গাড়িস্‌লে' কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কোন কোন সমাজে মৃতদেহ সৎকারে সমাধিপ্রথা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। তাই এ ছড়াটি সমাজ-জীবনের একটি ধারার বাহক বলা চলে। ছড়া কেটে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার মধ্যে বাক্-আক্রমণও লক্ষ্য করা যায়। এরূপ একটি ছড়া হল —

হাডু-ডু-ডু লেং ঢেং কুদালে (কোদালে) কাটিল ঠেং
তর বাপর গুজা (গোঁজা) ঠেং।

এ ছড়ায় প্রতিপক্ষের একজনকে লক্ষ্য করে রসিকতার মাধ্যমে তার বাবার গোঁজা (পঙ্গু) পা বলে তীর্যক ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অপরপক্ষের প্রত্যুত্তরমূলক ব্যঙ্গ ছড়া আছে, তা বিপক্ষের মাকে নিয়ে সৃষ্ট। তবে এর মধ্যে শালীনতা রক্ষিত হয়নি বলে তা উদ্ধৃত না করে অপর দু'একটি ছড়ার উল্লেখ করছি —

উরির পাতা কেরাইয়া
বেটা অছতে আইয়া।

এর উত্তরে প্রতিপক্ষ বলছে —

ধরমু নাতে ছাড়মুনি
বেটা না-তে বেটি নি?

এরূপ খেলা সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ছড়া রয়েছে বরাক উপত্যকায়।
এখন 'বেতবন্দী' ও 'গুল্লা' খেলার কিছু ছড়া তুলে ধরছি —

এৎ গাছ (অ) বাড়ী মাইল্লে বেত গাছ লড়ে (নড়ে)।
কটায় কাঠল খায় কট্-কট্ করে।

অপর একটি ছড়ায় পাই —

এৎ কলাকল বেত কলাকল তেৎ কলাকল সুন্দি
কাওয়া (কাক) গেছে মরিচ খেতে ডুপি হল বন্দী।

'গুল্লা' খেলার ছড়ায় —

আমি যাই আকাশে জল খাই গ্লাসে
জলের নাম চন্দন কুটি কুটি (কোটি) বন্দন।

জল যে জীবন, জল না হলে আমাদের চলে না, এর তাৎপর্য সাধারণ খেলার মাঠেও চর্চিত এবং জীবনদায়ী জলকে কোটি কোটি বন্দনা করা হচ্ছে।

এবার টাঙ্গল-বেঙ্গি বা ডাণ্ডাগুল্লি (ডাংগুলি) খেলার একটি ছড়ার উল্লেখ করছি। এ ছড়ার খেলাটি ছোট হলেও খেলার নিয়মানুসারে বারবার তা উচ্চারণ করতে হয়, এতে তা দীর্ঘ মনে হয়। তবে এটি একশ্বাসী ছড়ার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা হল —

মনা ডনা তেনা চারা মছা ছই ঘই এক।
মনা ডনা তেনা চারা মছা ছই ঘই দুই।

এভাবে দশ পর্যন্ত গণনা করা হয়ে থাকে এবং এটাকে 'কানি' বলা হয়। এই দশ কানিতে খেলার একটি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে হার-জিতের পর্যায়ে উপনীত হতে হয়। খেলার নিয়মানুসারে এর আরও সংক্ষিপ্ত গণনা বিধি রয়েছে। তা হল —

ছই ঘই এক, দুই ঘই দুই, দুই ঘই তিন... এভাবে দশে পৌঁছতে হয়। আবার কোন কোন খেলোয়াড়দল প্রথম ছড়াটিকে উল্টো গণনা করে ওস্তাদির আনন্দে উৎফুল্ল হন। সে গণনা হল —

নাম নাড (অ) নাতে রাচা ছাম ইছ (অ) ইঘ(অ) এভাবে গণনা করে দশের কোঠায় পৌঁছেন। খেলাটি যেমন আনন্দদায়ক তেমনি বিপজ্জনকও বটে। এর মার্জিত রূপ অনেকটা পাওয়া যায় ক্রিকেট খেলার মধ্যে। বর্তমানে এ খেলাটি প্রায় বিলুপ্ত এবং খেলার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলোও প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। ডাংগুলি খেলার উদ্ভব যে দূর অতীতে এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে সন্দেহ নেই।

মেয়েদের ফুলগুটি খেলার একটি দীর্ঘ ছড়া আছে। খেলার নিয়মানুসারে পাঁচটি গুটি দিয়ে তা খেলতে হয়। একশ্বাসে উচ্চারণ করতে হয় না। ছড়াটি হল —

ফুল ফুল ফুলটি/ একে দুলটি/ তেলটি
জামন জামন জামনটি - একে দুর্জামনটি
সুসম সুসম সুসমটি - একে দূর সুসমটি
বকুল বকুল বকুলটি - একে দূর বকুলটি

তারজম তারজম তারজমটি - একে দূরতারজমটি
মন্থন মন্থন মন্থনটি - একে দূর মন্থনটি
সাচ্চা বাঘের বাচ্চা সাচ্চাটি
নন্ট কাটা ঘন্ট নন্টটি
সাড়ের গুটি বদলে গুটিকাটা কেবলে
পঞ্চে টাকা/ মুখে ডাকা/ ছয়ে রিকা/ সাতে সালু/ আটে আলু/
নয়ে নূরা/ দশে এগারয় একটি/ বারয় ঝাপটি/
তেরয় তেরচি কাটা/ চৌদ্দয় রূপার বাটা/
পনরয় পানের খিল্লি/ ষোলয় ঝাপটি তুলি/
সতরয় সত্তর ইঞ্চি/ আঠারয় বাঁশের কঞ্চি/
উন্নিশে মেষ/ বিশে শেষ।

ছড়াটির অর্থ যাইহোক কিন্তু শুনতে সাবলীল। তাছাড়া ছড়াটিতে বিশ পর্যন্ত গণনা শিক্ষা ছোটদের অত্যন্ত সহায়ক। তবে এক বলে দু'তিন চার সংখ্যাগুলোর উল্লেখ না করে পাঁচ থেকে বিশ পর্যন্ত গণনার মধ্যে সামান্য ত্রুটি রয়েছে মনে হয়। তবুও গণনা ব্যাপারে ছড়াটির যথেষ্ট মূল্য আছে।

অপর একটি ছড়ায় আমরা পাই —

আড়কি পিছইন দাড়কি পিছইন
রাজার ঘরর কুকুড়ি
মোরে দিলা বাকুড়ি,
এর পা, সে-র পা রাজায় কইছইন কাটিতা কুটিতা
দলর তলে কুয়াইতা
দল্ দুল্ ভাঙ্গিয়া বুম্বাই মাত্তম
থেং থেঙ্গা

আঙুল লুকিয়ে এরকম আর একটি খেলার ছড়ায় আছে —

ইড়কি মিড়কি ঘাঘের গুটি
চাউল চানা মট্ মটা
দাদিয়ে আইনছইন বুয়াল মাছ বউয়ে দিছে খুলা
আরিয়ে পরিয়ে জুকাড় দেইন বউর পেট (অ) উলা।

বরাকের লোকসাহিত্যের অঙ্গনে সংস্কৃতিমূলক 'আই' এর ছড়া রয়েছে। কার্তিক মাসে সন্ধ্যার পর অথবা সকালে রাখালেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আই-এর ছড়া বলে মাঙ্গন নিয়ে গৃহস্থের গো-মহিষকে আশীর্বাদ দিয়ে যায়। সাধারণের ধারণা এতে গৃহস্থের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হয়ে থাকে। আইগুলো আইনাথ আদিনাথের স্মৃতিবাহী। এরূপ একটি 'আই'-এর ছড়া উদ্ধৃত করছি —

আদিনাথরে আদিনাথ, আদিনাথে দিলাবর
এই ঘর সুবন্নির ঘর,
সুবইন ঘরে তুলছে মাটি
ই ঘর (অ) আছে কুমার আটি
কুমার আটির কুমার ভাই
তুমার (তোমার) লাগাল কেমনে পাই,

গাঙ্গেরই তীরে তীরে ঢলু ঢলু কাঞ্চন
কাঞ্চনে গুয়া খায় কাঞ্চনে পান খায়
উট (অ) লাইগল চুন
ফালদি উঠে বরইর ঝুন
বরই নারে কেরাইয়া
আত (অ) (হাত) লইমু পুরাইয়া

গোরক্ষনাথকে নিয়েও এরূপ আই-এর ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। গোরক্ষনাথকে এক সময় গোরক্ষক দেবতা হিসাবে পুজো করা হত। ছড়াটি এরূপ —

গোরখলাই গোরখলাই
কবুলি গাই এর দুগ্ধ খাই,
দুগ্ধ ক'টি লড়ে চড়ে
সাত রাখুয়াল পইড়া মরে
সাত রাখুয়াল জিওইল আমার
গোরখ নাথের পুণ্যে।

রাজা মহীপালের আমলে আই-এর রাখালদের সেবার কথা পাওয়া যায় অপর একটি আই-এর ছড়ায় —

আইরে আই বনর ভাই
বন জ্বলে লক্ষ্মী ফলে
গৌড়ের গবিন মহীপাল**
তাইন দিলা ফলাহার
ফলাহার খাইয়া
ডাইনের সিঙ্গাসন (সিংহাসন) বামে থইয়া
লিলু খাইয়া বৃন্দাবন, তাতে অইল আইর জনম
আশ্বিন যাইতে কার্তি হামাইতে
দেবীর পুতে ভুই জুড়িতে
ফুন্দা মেত্তি বেলরপাত
হিজা ছাড়ে আড়াই আত্ (হাত)
চইলতা পাতায় ধরছে কাড়ার
একই কিত্তায় নয় ন ভাড়ার।

উক্ত 'আই'-এ রাজা মহীপালের আমলে জঙ্গল আবাদ করে জনবসতি ও ফসল ফলানোর ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে এবং প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও তথ্য মিলে। এর পাশাপাশি আইনাথের দোহাইকারী অলৌকিক ক্ষমতাধারী রাখালদের সেবা যে মহীপাল দিয়েছেন তারও নিদর্শন মিলে। রসিকতামূলক, গৃহস্থবাড়ির বর্ণনামূলক ও বিভিন্ন রুচির 'আই'-এর সন্ধান পাওয়া যায়। যখন রাখালেরা হাতে লাঠি নিয়ে, মাথায় পাগড়ি পরে, প্রজ্বলিত মশাল ধরে ঘরে ঘরে আই বলে মাঙ্গন নিয়ে থাকে তখন অনেক গৃহস্থ রাখালদের হাতের 'লাঠির বয়ান' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে যাদের জানা আছে তারা বলে —

লাঠিরে বড় ভাই তরে লইয়া আগে যাই
বাঘ মারি বইস (মহিষ) মারি সায়বর বিবি বিয়া করি।

তৎকালীন জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বাঘ, ভালুক, বন্য মহিষাদির ভয় ছিল। তা প্রতিরোধ করার জন্যই লাঠি

অবলম্বন। এখানে 'লাঠির বয়ান' অর্থাৎ লাঠির তাৎপর্য। গৃহস্থগণ রাখালদের আরও নানা প্রশ্ন করতেন এবং এর উত্তর দিতে না পারলে বোকা সাজতে হত।

গৃহস্থের প্রশ্ন — ইটা মারি পালাইমু জাল/ কুনবায় যাইবায়, রাখাল পাল ?

রাখালদের উত্তর — ছুরি দি কাটিমু জাল/ অবায় যাইমু রাখাল পাল।

বরাকের লোকসমাজে জামাইবাবুকে নিয়ে শালা-শ্যালিকাদের কৌতুকপূর্ণ নানা ছড়া আছে। তা এরূপ —

জামাইবাবু কমলালেবু একলা খাইও না
দিদিমনি ছোট রইছইন কিচ্ছু বুঝইন না।

তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছড়ার শেষোক্ত পংক্তি এ স্মৃতি বহন করছে। অপর একটি ছড়ায় আছে —

ঝিঙ্গার ফুল ফুটিছে জামাই আইয়া (আসিয়া) আজিছে,
খাট দিলে বয়না, পা ধইবার পানি দিলে পা ধয়না
খেদাইলেও যায় না।

বড়শি দিয়ে মাছ ধরা নিয়েও ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। বড়শিতে টোপ লাগিয়ে মা-গঙ্গার কাছে শর্তসাপেক্ষ আবেদন করা হয়ে Fake —

মা গঙ্গা ভাগীরথী মাছ পাইলে আধাআধি।

বড়শির সূতা জলে ফেলে নাড়াচাড়া করতে করতে বলা হয় —

লছর-বছর বনি লাগ টন্‌টনি।

বড়শির বাঁশে সূতা বাঁধারও বিধি আছে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বলে গণনা করে বাঁশের যে গাঁটে রাম সে গাঁটে সূতা বাঁধলে বরাবর মাছ মিলে, যে গাঁটে লক্ষ্মণ সে গাঁটে বাঁধলে হঠাৎ একদিন আচমকা মাছ পাওয়া যায় এবং যে গাঁটে সীতা সে গাঁটে বাঁধলে মাছ মিলে না। ছড়াটি এরূপ —

রামে খাইন নিত্ নিত্ লক্ষনে খাইন অচম্বিৎ
সীতায় খাইন নিরামিষ।

কিছু কিছু প্রবাদ-প্রবচন আছে যেগুলো ছড়ার আকারে তৈরি। যেমন বর্তমান সামাজিক রীতিনীতির ওপর কিছু প্রবাদ আছে, তা হল —

মা বাপ ভেউয়া ডেফল তারা খাইলে কিয়র ফল
হউর হড়ি শালগরাম (শালগ্রাম) তারা খাইলে পুরর (বংশর) নাম।

নীতিকথামূলক কিছু প্রবাদ আছে যেগুলো ছড়ার আকারে তৈরি। যেমন —

বাপভালা যার বেটা ভালা তার মা ভালা তার ঝি
গাই ভালা যার বাছুর ভালা তার দুধ ভালা তার ঘি।

এভাবে নানাধরনের লোকছড়া বরাক উপত্যকার সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ভাষার সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য নেই। এসব ছড়া বরাক উপত্যকার লোকসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা এবং তাতে এখানকার বাঙালির জীবনচর্যা ও সমাজ প্রতিবেশের চিত্র বিধৃত।

প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজন : সম্পাদক : আকাদেমি পত্রিকা

***** ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্যের মতে 'দোহাই' থেকে 'আই' (হ > অ) শব্দটি এসেছে। (বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস, অক্ষরবৃত্ত, এপ্রিল ১৯৯৩, করিমগঞ্জ, পৃ. ৬)। 'আই' মূলত ছড়াধর্মী গান।

****** এখানে দু'টি ঐতিহাসিক চরিত্রের কীর্তিগাথা পাওয়া যাচ্ছে। মহীপাল সম্ভবত পালবংশীয় রাজা

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল (খ্রি. ৯৮৮-১০২৭), যিনি নানা জনহিতকর কাজকর্মের জন্য বৃহত্তর বঙ্গে যশস্বী হয়ে আছেন। ছড়াধর্মী 'আই' গানের মহীপাল যদি সেই মহীপাল হন তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, বাংলা ভাষা-সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের যুগে (খ্রিস্টিয় অষ্টম-দশম শতক) অর্থাৎ মহীপালের রাজত্বকালে অরণ্যময় কাছাড় তথা বরাক উপত্যকায় বাঙালি বসতি ছিল। এখানকার বাঙালির বন-জঙ্গল আবাদ ও মহীপালের কীর্তিগাথা এই 'আই'-এ স্পষ্ট। বাঙালির লোকস্মৃতি তথা লোকশ্রুতিতে মহীপাল বেঁচে আছেন। স্মর্তব্য প্রবাদে আছে- 'ধান ভান্তে মহীপালের গীত'। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থাননাম এখনও রাজা মহীপালের স্মৃতি বহন করছে। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ জেলার 'মহীশাসন' স্থাননামটিও তাৎপর্যপূর্ণ। আরও একটি ঐতিহাসিক চরিত্রও এখানে পাওয়া যাচ্ছে- গৌড়গোবিন্দ (গৌড়ের গোবিন)। এই গৌড়গোবিন্দ এবং শ্রীহট্টের ভাটেরা গ্রামে আবিষ্কৃত খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের তাম্রশাসনের গোবিন্দ-কেশবদেব অভিন্ন রাজা কিনা এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। যদি গৌড়গোবিন্দ ও গোবিন্দ-কেশবদেব অভিন্ন রাজা হন তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে তিনি কাছাড় অঞ্চলেরও রাজা ছিলেন। তাম্রশাসনে উল্লিখিত স্থাননাম ও নদীনামগুলোর সূত্র ধরে গোবিন্দ-কেশবদেবের রাজ্যসীমা সম্পর্কে কমলাকান্ত গুপ্ত লিখেছেন — 'Govinda Keshava's rule extended also over the southern part of the district of Sylhet, south of the river Kusiyara, portion of Cachar District (including Karimganj Sub-division) and possibly portions of Tripura also.' (Copper-plates of Sylhet, Sylhet, 1967, pp. 198). রাজা গৌড়গোবিন্দের রাজত্বকালে এই 'আই' গানটি রচিত হতে পারে, যে-গানে জনপ্রিয় দুই রাজার প্রতি (মহীপাল, গৌড়গোবিন্দ) কাছাড় তথা বরাক উপত্যকাবাসী প্রজারা তাঁদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন।

'চৈতন্যভাগবতে' উল্লিখিত যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল প্রমুখ পালরাজন্যবর্গের গাথা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন- 'মহীপাল প্রভৃতি পালরাজগণের গাথা এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।... যাঁহারা এদেশে ঐতিহাসিক চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহীপালের গান উদ্ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের একটা অন্ধকার দিক অনায়াসে উজ্জ্বল করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারেন।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৬০)। সুকুমার সেন লিখেছেন' 'যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত' প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৭)। সুকুমার সেন অন্যত্রও এ সম্পর্কে লিখেছেন — "যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত' নামেই শোনা গিয়েছে। তাহা কী বস্তু তাহা জানি না।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৭)। 'আই' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অমলেন্দু ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন — 'সম্ভবত এসব টুকরো ছড়াই 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লিখিত 'যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত'।' (বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস, অক্ষরবৃত্ত, এপ্রিল ১৯৯৩, করিমগঞ্জ, পৃ. ৬)। এছাড়া, 'আই'-এর ভাষা প্রসঙ্গে অমলেন্দু ভট্টাচার্য লিখেছেন — 'প্রচীনতার প্রসঙ্গে এসব ছড়ার ভাষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বহমান লোকজীবনে মৌখিক সাহিত্যের ভাষা বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে পাল্টে যায়। এমতাবস্থায় উদ্ভবের যুগের ভাষা এসব মৌখিক সাহিত্যে বজায় থাকবে এটা আশা করা যায় না। বিশেষ বিশেষ শব্দ, ব্যক্তি বা স্থাননাম, অথবা সংশ্লিষ্ট সংস্কারকে ভিত্তি করে মৌখিক সাহিত্যের জন্মকাল নির্ণয় করতে হয়। অতএব বলা যায় বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের যুগ অর্থাৎ চর্যাপদের যুগ থেকেই এখানে বাংলা সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। আজকের দেহতত্ত্বমূলক গান, তিননাথের আসর-এর গান চর্যাপদের ধারাপথ বেয়ে আমাদের হাতে এসেছে।' (বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬)।

বরাক উপত্যকার প্রবাদে সমাজমনস্কতা

সর্বজিৎ দাস

প্রবাদের সৃষ্টি যে-কালে বা যেভাবে হোক না কেন, তার আধার সমাজ। প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা। সাহিত্যের প্রধান শর্ত সমাজ সচেতনতা। ফলে প্রবাদের অন্তরালে সমাজের বিভিন্ন চিত্র প্রচ্ছন্ন থাকার কথা। কেননা প্রবাদ সামাজিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-অভিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞ মনস্কতার স্বর্ণফসল। ‘মানুষের প্রাত্যহিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মর্ম নির্যাস সঞ্চিত হয় যেসব সুসংগঠিত সরল অথচ বৈদগ্ধ্য ভরা ঐতিহ্যবাহী উক্তিগুলির মধ্যে, তারাই হল প্রবাদ।’’[১] জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় একদিন সামাজিক মানুষ আয়ত্ত করল তারই ফলশ্রুতি প্রবাদ। প্রবাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোটির মালমশলা সংগৃহীত হয় বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতা বাইরের আবরণ উন্মুক্ত করলে প্রবাদের অন্তরালে নিহিত সমাজ বাস্তবতার ছবি দৃষ্ট হয়।

বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে প্রবাদ রচিত হলেও তার সৃষ্টির মূলে রয়েছে সংহত সমাজ। বিচিত্র উপকরণ নিয়ে সমাজের দৈহিক কাঠামো রচিত। শোষণ-বঞ্চনা-লাঞ্ছনা যেমন আছে তেমনি তার বিরুদ্ধে রয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। জাত-পাত-বর্ণ-গোত্র নিয়ে বিভিন্ন বৈষম্য থাকলেও এসবের বিরুদ্ধে শোনা যায় প্রতিবাদ। বস্তুত সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনে কোনও না কোনও দ্বন্দ্ব নেপথ্য কাহিনি রচনা করে। বরাকের প্রবাদে তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। এখানকার প্রবাদে ব্যাপকস্থান দখল করে আছে ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ। সামাজিক পদমর্যাদা হিসেবে ব্রাহ্মণের স্থান উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত।

ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন, শাস্ত্রচর্চা, বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি যেমন তাদের সম্মান লাভের সহায়ক হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বরাক অঞ্চলে লাঙ্গল ভিত্তিক কৃষির প্রচলন ঘটেছে এই ব্রাহ্মণের নেতৃত্বেই।[২] ফলে পদমর্যাদার শীর্ষাসনে অবস্থান করাটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই শোনা যায় —

১। মুরর উপরে ব্রহ্মলুক
নিচে আমরা সাউলুক
মাইজে যত উল্লুক আর ভল্লুক

২। ঘরে বারে করে হিত
তারে বলি পুরোহিত

৩। অগ্নির ব্রাহ্মণ জাতি
মুখ তাকি উৎপত্তি
সাউ আইলা উরাত তাকি
শুদ্র আইলা চরণ তাকি।

সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান সবার উপরে থাকলেও এবং এই আসন দখলের কার্যকারণ সূত্র যতই অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, বাস্তব কিন্তু অন্যকথা বলে। সমাজ বিকাশ প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অন্য তথ্য আহৃত হয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমবিভাগের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্রাহ্মণের উচ্চাসন দখলের তথ্যটি এখানে

স্মর্তব্য — "একদিকে উৎপাদন কর্মের সংগঠক আর একদিকে যারা উৎপাদন করবে তারা। যারা সংগঠক তারা নিজেরা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হবে না, নিজেরা পরিশ্রম করবে না, গতর খাটাবে না। বদলে তারা মাথা খাটাবে —সংগঠনের জন্য শুধু মাথা খাটানোরই প্রয়োজন।... এই সংগঠক শ্রেণী থেকেই ক্রমশ দেখা দিলো পুরোহিত শ্রেণী।"[৩] আর এই শ্রেণির ভরণপোষণের ভার সমর্পিত হল সাধারণের উপর। "প্রাচীন ভারতে রাজা ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতীক। রাষ্ট্রকে সাহায্য করত পুরোহিত ও যোদ্ধারা। এই পুরোহিত ও যোদ্ধার দল কৃষকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং কারিগরদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে ছিল।"[৪] ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পরিশ্রমী শ্রেণি শ্রমবিমুখ শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝাড়বে। বরাকের প্রবাদের সেই চিত্র লক্ষণীয় —

যবনে আর চাড়ালে
বাঘে আর বিড়ালে।

লুলুপ ব্রাহ্মণের প্রতি কটাক্ষ করে বলা হচ্ছে —

বাবনে হুনলে হরাদর কথা
ছিড়িয়া আনে আল্‌দর মাথা।

ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা ও তার বিনিময়ে চাল-কড়ি আদায় করা —এটা ব্রাহ্মণের জীবিকা। তা সমাজ স্বীকৃত হলেও যে সর্বজনগ্রাহ্য নয় এবং কখনও কখনও তা পরিহাসতুল্য, একটি প্রবাদে এমনটা ধরা পড়ে —

বাবন বাদল বান
দক্ষিণা পাইলে যান।

ক্ষেত-কৃষির বিস্তারে অতীতে ব্রাহ্মণদেরকে ভূমিদানের কথা সকলের জানা। বরাক উপত্যকায়ও এই প্রথা চালু ছিল। হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বৃষ উৎসর্গ করা সে কথার সাক্ষ্য দেয়। কালক্রমে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের লাঙল ধরতে নিষেধ করেছে। [৫] কিন্তু বরাক উপত্যকার প্রবাদে ক্ষেতধারী ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। তবে অকর্মণ্য-অদক্ষ বলে ব্রাহ্মক্ষণকে পরিহাস করা হচ্ছে—

জানে না শুনে না বাবন
বাউশ খেত বানায় আমন।

পূজ্যকে উপেক্ষা করে পূজানুষ্ঠান মুখ্য হলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণের যাজনিকতা নিয়ে ঠাট্টা হবে। একটি প্রবাদে তা বিধৃত—

ঠাউকরর পেট ভুক নাই
বাবন চিড়া চাবাও।

বেশিরভাগ ভূমিশাসনে ব্রাহ্মণদের মূল বাসস্থান গর্বের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। গুপ্তযুগ থেকে একজন ব্রাহ্মণের পরিচয় দেওয়া হত তিনি যে গ্রামের বাসিন্দা সেই গ্রামের পরিচয়ে।[৬] কালক্রমে ব্রাহ্মণের মতো ব্রাহ্মণ পাড়াও জল অচল সম্পর্কে তিষ্ঠ হল। সেসব অঞ্চলে গমনাগমন সর্বোপরি উন্মুক্ত নয়। ফলে সাধারণ চিত্তে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হওয়া স্বাভাবিক। তাই ব্রাহ্মণদের উক্ত শুচিগ্রস্ততাকে স্পৃশ্য করার লক্ষ্যে নিঃসৃত হয় এমন প্রবাদ-

আনে পড়া বানে পড়া
পালাইদেনি বাবন পাড়া।

একজন শূদ্র বেদবাক্য শুনে ফেলায় রামচন্দ্র তার কর্ণাঘাত করেছিলেন। সেই সামাজিক কঠোরতা এখন শিথিল। সংস্কৃত পড়া ও শ্রবণ করার ক্ষেত্রে বর্ণবিভাজন নেই। তবে কোথাও কোথাও অবজ্ঞা লক্ষণীয়। একটি প্রবাদে এই তথ্য প্রাপ্ত হয়—

বাবনায় বাক্যি হুনায়
পাঠায় বেলপাতা চাবায়।

ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ রূপে আমাদের সমাজ স্বীকার করে আসছে। তবে একশ্রেণির ব্রাহ্মণের জীবিকাপন্থা, আচার-আচরণ, আদেশ-নির্দেশ সাধারণ চিত্তে প্রতিকূল ভাবনার সঞ্চার করেছে। তাই শোনা যায়—

১। আচারে বাবন ঠাকুর
বিচারে নাই।
২। নিজে ডুবিলায় বাবন
ডুবাইলায় যজমান।
৩। কলির বাবন ধুড়া সাপ
যে মারে তার পাপ।
৪। খাইছি বাড়ি খান
আর যাইতাম না বাবনার থান।

'বাবন', 'বাবনা', 'বাবনাকি' ইত্যাদি শব্দের অন্তরালে প্রতিবাদী শ্রেণির খেদোক্তি লক্ষ্য করা যায়। স্থুল বা হালকা কটূক্তি বোঝাতে উক্ত শব্দগুলোর প্রয়োগ বরাকবাসীর কথোপকথনে লক্ষ্য করা যায়। শুধু প্রবাদই নয়, বাংলা লোককথায়ও ব্রাহ্মণ চরিত্রকে তীর্যকভাবে বর্ণনা করা হয়। সমাজে উঁচু-নিচুর মধ্যে সংগঠিত দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের তথ্য ঐসবের মাধ্যমে লব্ধ হয়। বস্তুত আমাদের সমাজ কাঠামোর অন্তরালে বিভিন্ন দ্বান্দ্বিক সম্পর্কসূত্র কার্যকারণরহিত। বিদ্বানেরা বলেন এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই। একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হল,"সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের লব্ধফল হিসেবে জীবনচর্যার যে দ্বান্দ্িক বিকাশ অনিবার্য, তারই সঙ্গে মানানসই হয়েই লোকায়ত সংস্কৃতি এবং ওপরতলার সংস্কৃতি একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দু-সমন্বয়ের সুতোয় বাঁধা।"[৭] প্রবাদে বর্ণিত ব্রাহ্মণ চরিত্র আসলে ওপরিতলার প্রতিনিধি। তাকে ব্যঙ্গ, পরিহাস করা মূলত উক্ত শ্রেণির প্রতি বিষোদ্গার করা। প্রাত্যহিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শোষণ এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ সাধারণ চিত্তে পুঞ্জীভূত থেকেছে, তা-ই প্রচ্ছন্নভাবে বাঙ্ময় হয়েছে ঐসব প্রবাদের মাধ্যমে।

সামাজিক প্রতিকূলতার আরেক ছবি ধরা পড়ে নারীকে অবলম্বন করে রচিত বিভিন্ন প্রবাদে। নারীকে দাবিয়ে রাখা তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি না দেওয়া, কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ রাখা পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় তা-ই লক্ষ্য করা যায়। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীকে কোণঠাসা করে রাখার নেপথ্য কারণ পন্ডিতেরা উদ্ঘাটন করবেন। আমাদের বিবেচনায় নারী-পুরুষের সম্পর্কটি পুরুষশাসিত সমাজে দ্বন্দু নির্ভর আর এর প্রেক্ষাপট রচনা করেছে অর্থনৈতিক কার্যকারণ। "ঋগ্বেদে পর্যন্ত স্ত্রীকে স্বামীহত্যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছে 'অপতিঘ্ন এধি'। নির্দেশটা নিশ্চয়ই বস্তুভিত্তি বির্জত ছিল না। 'পুরুষ প্রাধান্যের যুগে' ঐ জাতীয় রীতির প্রতিরোধকল্পেই হয়তো সতীদাহ-প্রথার সূচনা হয়েছিল।"[৮] 'স্ত্রী প্রাধান্য' থেকে 'পুরুষ প্রাধান্য' — আসলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর। ঋগ্বেদে ধৃত স্ত্রীকর্তৃক স্বামীহত্যার তথ্য থেকে বোঝা যায় একদা 'স্ত্রী প্রাধান্য' অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতার দরুন নারীসমাজের শীর্ষাসনে স্থিত ছিল। তাছাড়া "নারীর সন্তানধারণের ক্ষমতা ও জমির শস্যউৎপাদনের ক্ষমতাকে একই ধরনের গুণের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হত।"[৯] ফলে উচ্চাসন দখল করাটাই স্বাভাবিক। কালক্রমে "লাঙ্গলের প্রচলনের ফলেই পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষপ্রাধান্য, নারীর অন্তঃপুরে নির্বাসন, সম্পদের উত্তরাধিকার, সে উত্তরাধিকারীর পিতৃপরিচয় সুনিশ্চিত করার জন্য সতীত্বের নিগড় নারীস্বার্থের পরিপন্থী ধ্যানধারণা বিধিনিষেধের জন্ম হল।"[১০] সে থেকেই পুরুষের চোখে নারীসত্তা প্রতীকূল ভাবনায় রচিত। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস যে দ্বন্দু নির্ভর, সেকথা বোঝাতে গিয়ে এত কথার অবতারণা করতে হল। বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে উক্ত বাক্যগুলো প্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা। যাই হোক পুরুষতন্ত্রের নিরিখে নারীর অবস্থান বিভিন্ন প্রবাদে ধৃত। মনুসংহিতায় নারীকে জোঁকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে জোঁকের মতো নারীও দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে, অর্থাৎ নারী প্রাণহন্তারক। বরাকের প্রবাদে তার আভাস লক্ষণীয়—

১। খান্ডা ঘোড়া নারী
এ তিন প্রাণের বৈরি।
২। নারী কাগজ নাও
তিনোর বৈরি বাও।

নারীকে জব্দ করতে দৈহিক অত্যাচারের শলা দেওয়া হচ্ছে—

ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে
আরিপরি জব্দ অয় চউখ আঙ্গুল দিলে।

নারী বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই সাবধানবাণী শোনাচ্ছে বরাকের প্রবাদ—

১। নদী নারী শৃঙ্খধারী
এ তিনে না বিশ্বাস করি।
২। বউর কাছে মর্ম কতা কয়
আটে চাইরে তার মরণ অয়।

নারী স্বাধীন নয়। নারীর পরনির্ভরতাকে বোঝাতে বলা হয়—-

নাও ঘোড়া নারী
যে চড়ে তারি।

পুরুষতন্ত্রে পুরুষালি প্রদর্শনে রচিত প্রবাদ—

১। বেটার গুসায় বাদশা
বেটির গুসায় বেশ্যা।
২। আত্তির দাত আর
মরদ বাত।

কন্যাসন্তানকে পাত্রস্থ করে দিলেই দায়গ্রস্ত পিতার ভারমুক্তি ঘটে। জাতের নামে ইজ্জত বাড়ানো সম্পর্কে যে সচেতনতা অন্যক্ষেত্রে দেখা যায়, তার ব্যতিক্রম ঘটে কন্যা সম্প্রদানে। পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে রচিত প্রবাদটি এরকম—

পুড়ির বিয়া ভাত দেখি
পুয়ার বিয়া জাত দেখি।

নারী পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল থাকবে— এই বাসনার মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্বগিরি ধরা পড়ে প্রাসঙ্গিক প্রবাদের মাধ্যমে—

১। পতি বিহন নারী
যেমন নায়ের নাই কান্ডারী।
২। গাছর বল লতাপাতা
মাছর বল পানি।
পুরুষর বল টেকা পয়সা
নারীর বল স্বামী।

বিশ্বের সমস্তকিছুর 'অর্ধেক নারী' আর 'অর্ধেক নর' সম্পাদন করলেও দেখা যায় কলঙ্কের দাগ নারীকেই মাখতে হয়। সমালোচক বলেন, "সীতাকে তো অন্যায়ভাবে সন্দেহ করা হয়েছে এবং প্রকাশ্যে কঠোর বাক্য বলে অপমান পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রতিবাদ না করে রামের সে ক্ষেত্রে নীরবতা পালন সীতাকে অগ্নিদাহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অযোধ্যায় তাঁকে নির্দয়ভাবে ঠকিয়ে অরণ্যে নির্বাসন দেওয়া হয়।"[১১] বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পন্ডিত-গবেষক উল্লেখ করেছেন যে উৎপাদনের মালিকানার উপর ব্যক্তির ভোগ দখলকে কেন্দ্র করে সমাজে একশ্রেণির মানুষ পর্যবসিত হয় শোষিতের স্তরে। শোষিত শ্রেণিতে নারীপুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। তবে নারী আবারও পুরুষের দ্বারা শোষিত। এই সমস্ত শোষণ কার্যকে চলমান রাখতে সমাজ প্রণেতা ও তার সহযোগী দ্বারা বিধিবদ্ধ শাস্ত্র প্রণীত হয়। প্রাসঙ্গিক তথ্যটি এরকম, "খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর লেখা তৈত্তরীয় সংহিতা জানাচ্ছে, নারীর শরীর তার নিজস্ব অধিকারে নয়, সুতরাং চিরটা কাল ধরে নারীদেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করা চলে। ইচ্ছে মতো তাঁর ওপর অত্যাচার করা চলে এবং

পুরুষ খুশি মতো তাঁকে ত্যাগও করতে পারে। খুব প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েদের মন ও অনুভূতির কথা সমাজ গ্রাহ্য করেনি। সুতরাং পুরুষের ধর্ষকামিতা যতক্ষণ না কিছুটা পরিতৃপ্ত হচ্ছে, ততক্ষণ মানসিক নিপীড়ন মেনে নেওয়া হয়েছে। যেটা আরও খারাপ এক্ষেত্রে পুরুষদের সচেতনতার ব্যাপারে সার্বিক ঔদাসীন্য কাজ করেছে। এইজন্যই নববিবাহিত স্ত্রীর সামনে বহুপত্নীর প্রার্থনা সম্ভব।"[১২] প্রবাদের মধ্য দিয়েও নারী সম্পর্কে পুরুষ মানসিকতার স্বরূপ চেনা যায়। পুরুষতন্ত্রের চোখে নারীর স্বরূপ বরাকের প্রবাদের ধরা আছে—

১। গরু জরু ধান
এ তিনে গিরস্থের মান।

২। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা
দীর্ঘল ঘুমটা নারী
পানার তলর শীতল জল
তিন মন্দকারী।

৩। দকদকাইয়া আটে নারী
কটমটাইয়া চায়।
মাস পুরতে সেই নারীর
সিথির সিন্দুর যায়।

৪। যে নারী গুয়া খাইয়া খুটাত মুছে চূণ
নিশ্চয় জানিবায় ই নারী জামাই কবর খুন।

৫। হিন্দুর দাড়ি মুসলমানর নারী
গাঙ্গর কুল বাড়ি, বনে চরা গাই
এই চাইরে বিশ্বাস নাই।

৬। ঘোড়ার চক্কর
আর বেটিনতর মক্কর।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই সমাজের যে শ্রেণিবিভাজন ঘটে আসছে, একটি শ্রেণি আর একটি শ্রেণির উপর যে শোষণ ও প্রভুত্ব করে আসছে, বৃহত্তর জনজীবনের শিল্প-সাহিত্য তার অভিক্ষেপ হয়নি, এমন কথা ইতিহাস বিরোধী। বরঞ্চ লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতি চেতনায় ঐ শ্রেণি শোষণের এবং দ্বন্দ্বের কথা অবিচ্ছিন্নভাবেই প্রবহমান হয়ে রয়েছে। প্রবাদ লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ বিভাগ। সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রতিফলন এতে যেমন ঘটে তেমনি বিভিন্ন অসংগতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজও শোনা যায়। 'বস্তুতপক্ষে সভ্যতার ইতিহাসই হল শ্রেণিসংঘর্ষের ইতিকথা; কখনও সেই সংঘর্ষ পশুপালনজীবীর সঙ্গে কৃষিজীবীর, কখনও কৃষিজীবীর সঙ্গে শিল্পজীবীর, কখনও সামগ্রিকভাবে শোষিত নির্বিত্ত শ্রমজীবীদের সঙ্গে বিত্তবান অবসরজীবীদের। পাপ-পুণ্য, ধর্ম, নিয়তি, কর্মফল ইত্যাদির ভয় এবং দোহাই দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সেই সংঘর্ষকে কখনও কখনও এড়াতে পেরেছে ক্ষমতাসীন শ্রেণি। যখন তা পেরেছে তখনও লোকজীবনের সংস্কৃতির মধ্যে ঐ দ্বন্দ্বের অভিক্ষেপটুকু মুছে যায়নি।"[১৩] বরাক উপত্যকার প্রবাদে প্রতিফলিত দ্বন্দ্ব-শোষণের চিত্র 'ব্রাহ্মণ' ও 'নারী' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। তবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদমূলক প্রবাদ দুর্লভ নয়।

গাঙ্গর মুরর কাপনা
হাই না অয় আপনা।

উক্ত প্রবাদে প্রতিবাদিনী নারীর কথা ব্যক্ত হয়েছে। স্বামীর প্রতি সতত শ্রদ্ধাশীলা, স্বামীর সেবিকা হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উপদেশবাণী শাস্ত্রেও আছে, লোকমুখেও আছে। কিন্তু সমানাধিকার থাকা সমাজে এই ব্যাপারটি যে বৈষম্যজাত, নারী তা জানে। ফলে স্বামীর প্রতি বিষোদ্গার নিক্ষেপ করে। তাছাড়া পতি বিহনে নারীর কোনও গতি নেই বলে পুরুষতন্ত্র তার পুরুষালি জাহির করলেও কার্যত নারী তার বিদ্রূপই করেছে। পরনির্ভরশীল পরমুখাপেক্ষী ইত্যাদি

অভিধার উপযুক্ত নারী দিয়েছে। যেমন—

ভাত দেয় না ভাতারে
ভাত দেয় গতরে।

বরাক উপত্যকার সমাজ সংগঠনে ব্রাহ্মণের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজদেহ সংগঠনে তারা নেতৃত্ব দিলেও উত্তর ভারতীয় আদর্শে বরাকে ব্রাহ্মণ্য প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যারজন্য এই অঞ্চলে চাতুর্বর্ণ প্রথা গড়ে উঠেনি।[১৪] তাই বলে জাত-পাত নিয়ে ভাগ বিভাজন নেই? আছে। আছে জাতের নামে বজ্জাতি।
উদাহরণ—

১। হুড়ির কুড়ি বুদ্ধি নাপিতের ছয়
আর জাতের অয় কিনা অয়।
২। কাইত মরে জলে ভাসে
কাক বলে ফিকিরে আছে।
৩। ফুরির কুড়ি বুদ্ধি
নাপিতের ছয়
তিনশ বিরাশি বুদ্ধি
কাইত মহাশয়।
৪। জাতর মাঝে সাউ
আনাজর মাঝে লাউ।
৫। হরু মানু বড় অইলা
তেলি অইলা পাল
নাপিত দারোগা অইলা
দেখাইলা বাল।
৬। ধন্য জীবন হাউদ সদাগর
উত্তম জীবন চাষা
অধম জীবন কুটি কামলা
নরক জীবন বেশ্যা।
৭। সাহা পাল বানিয়া
যা করে জানিয়া।
৮। ধূপার বাসি
নাপিতর আসি।

পেশা-বৃত্তিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত জাতপাতের পারস্পরিক ব্যঙ্গ-ঠাট্টার একটি রূপরেখা উপযুক্ত প্রবাদ থেকে পাওয়া যায়। তবে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে জাত-বর্ণ নিয়ে ভাগ বিভাজন আসলে যে অমূলক তার কথাও বরাকের প্রবাদে ধরা আছে। উদাহরণ—

১। জাতর ঘর মার লাথি
ভাতর ঘর ধর ছাতি।
২। জাতর ঘর মার লাত
বেজাতর ঘর দেও আত।
৩। যার নাই ভাত
তার কিবা জাত।

অন্যদিকে, মেকি-ভণ্ডদের চারিত্রিক অসংগতি খোলসা করে কিছু কিছু প্রবাদ—

১। মুকে কয় না হরি
আর তুলসীর তলে গড়াগড়ি।

২। কাজিয়ে তুকায় ঘর ঘর পুঙ্গা
কাজির ঘর আঠার পুঙ্গা

৩। ইচা খাইয়া নিরামিষ
তারে কয় হবিশ।

ভয়ে হোক আর ভক্তিতে হোক কিছু কিছু আচার-সংস্কার মানুষ পালন করে থাকে। তবে বেঁচে থাকার রসদ যে অন্যকিছু, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। ফলে শাস্ত্রাচারী অনুশাসনের বিপরীতে শোনা যায়—

জপ তপ মালা
ভা সবের আলা।

প্রবাদ জীবন-অভিজ্ঞতার নির্যাস। অনভিজ্ঞের পথচলাতে প্রবাদ আলো দেখায়। মুনাফালোভীর খপ্পরে যাতে অন্য কেউ না-পড়তে পারে তারই সর্তকবাণী শোনা যায় এভাবে—

গণকারে না চিনাইও বাড়ি
বদ্যিরে না দেখাইও নাড়ি।

শ্রেণিচেতনা থেকে সঞ্জাত বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনার উপলব্ধি প্রবাদে ধরা পড়ে। তবে সমস্ত প্রবাদের পিছনেই এ-রকম প্রত্যক্ষ শ্রেণি বৈষম্যের অভিজ্ঞতা যে থাকে, তা অবশ্য আদৌ বলা চলে না। মোট কথা, সামাজিক দ্বন্দ্ব কোনও না কোনও ভাবে প্রবাদে অন্তঃসলিলা হয়ে থাকে। বরাকের প্রবাদে তার সাক্ষ্য মেলে—

১। সবে মিলি খাইলা কাঠল
রবাইর গলাত দড়ি।

২। কেউ মরে বিল হিচিয়া
কেউ খায় কই।

৩। সারা রাইত সাপ মারি
বিয়ানে উঠি পুয়ার লেঙ্গি।

৪। সবার জাল রউ বাউ
অভাগীর জাল চান্দখিরা।

৫। সারা রাইত হিচিয়া
ভাগও এক কুচিয়া।

শ্রমজীবী মানুষ, শ্রমদানেই তার জীবন; ফলে অধিকার কেবল মালিকের, যিনি শ্রমবিমুখ। উপর্যুক্ত প্রবাদ সে কথার ইঙ্গিত দেয়। অন্যদিকে কেউ গতর খেটেও নিঃস্ব থাকে; পূর্ণ হয় বিশ্রামবিলাসী। যেমন—

কেউর ঘর পুড়া যায়
কেউ খই খায়।

উপলব্ধি জাত আর একটি প্রবাদ—

কামে ধরলে কাজি
কাম ফুরাইলে পাজি।

'ওপরতলার' মানুষের উপলব্ধিতে ধনহীনের স্থান ঠিক কোথায়। বরাকের প্রবাদ থেকে তার ধারণা লাভ হয়—

১। গরিব কাঙ্গাল গায়ে লাগে না
ভাঙ্গা খড়ম পায়ে লাগে না।

২। গবিরব বউ হকলর ভাউজ।

৩। গরিবে আহার খুজে
ধনী এ ভুখ খুজে।

৪। যার নাই পয়সা কড়ি
তার কপাল হুরইন বাড়ি।

'কাচা পয়সা দেখলে পাত্তরে আ করে'— এমন কথা বরাকের লোকমুখে প্রায়শই শোনা যায়। অর্থ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। সমাজজীবনের একটি চিত্র অর্থ সংক্রান্ত প্রবাদ দিয়ে চেনা যায়—

১। আইছিল জানর বায়
গেছেগি মালর বায়।

২। জানর উপরে আয়
মালর উপরে যায়।

৩ ।কড়ি অইলে কুড়ি (কুড়েমি) যায়

৪। টেকায় টেকা আনে।

পৃথিবীর সবভাষায়, সব জায়গায় প্রবাদ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্র যে সর্বদা প্রবাদে উঠে আসে এমন কথা ভাবা যায় না। তবে প্রবাদের প্রেক্ষিত রচনায় সমাজজীবন রসদ যোগায়। বস্তুত সমাজমন বিশ্বজনীন, প্রবাদ তার আরশি। একই কথা বরাকের প্রবাদ প্রসঙ্গেও।

তথ্যসূত্র :

১. পল্লব সেনগুপ্ত: লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ: কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৭১
২. সুজিৎ চৌধুরী: শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস: শিলচর, ২০০৬, পৃ. ১৫৮
৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: লোকায়ত দর্শন: কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮১
৪. রামশরণ শর্মা: আদিমধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭১
৫. তদেবঃ পৃ. ৭০
৬. তদেব: পৃ. ১৫৯
৭. পল্লব সেনগুপ্ত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৮. সুজিৎ চৌধুরী: ভারতে মাতৃপ্রাধান্য কিংবদন্তীর পুনবিচার: কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩৮
৯. তদেব: পৃ. ২১
১০. তদেব: পৃ. ২২
১১. সুকুমারী ভট্টাচার্য: প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১২৬
১২. তদেব: পৃ. ১২৮
১৩. পল্লব সেনগুপ্ত: প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৯
১৪. সুজিৎ চৌধুরী: শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস; শিলচর, ২০০৬, পৃ. ১৫৮

ঋণ স্বীকার ঃ

১. আবিদ রাজা মজুমদার। বরাক উপত্যকার প্রবাদ প্রবচন (২য় পর্যায়), শিলচর ২০০৭
২. দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (সম্পাদিত) ছিলটে প্রচলিত পই-প্রবাদ ডাক-ডিঠান: ঢাকা, ১৯৯৮

বরাক উপত্যকার লোকজীবনের লুপ্তপ্রায় কিছু লোক-উপাদান

আশিসরঞ্জন নাথ

বরাক উপত্যকার লোকজীবন তথা সমাজ-জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছুই। ইতোমধ্যে লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য অনেক উপাদান। ওইসব উপাদান বা সামগ্রী প্রাত্যহিক জীবনে কেবল অপরিহার্য ছিল এমন নয়, বরং আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীকও হয়ে উঠেছিল। ওইসব সামগ্রী ছাড়া জীবন-যাপন অকল্পনীয় মনে হত এক সময়। সেইসব হারিয়ে যাওয়া বা লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকগুলোর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। তালিকার প্রথম দিকে উল্লেখ করতে হয় ঢেঁকি, পিঁড়ি, ঘাইল-ছিয়া, জলচৌকি, নকশিকাঁথা, টঙ্গিঘর, মাটির হাঁড়ি-বাসন সহ ক্রমে আরও অনেক কিছু। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, আধুনিকতার সম্প্রসারণে আর ওইসব সামগ্রীর চিত্তাকর্ষক বিকল্পের সৃষ্টি ও প্রচলনের সুবাদে হালের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি অনেক কিছু। সময়ের পরিবর্তন বা বিবর্তন বুঝি একেই বলে।

বাড়িতে আগন্তুক বা পরিচিতজনের আগমনে আমরা এইতো সেদিনও সাদরে এগিয়ে দিতাম বসার পিঁড়ি। এতে আগন্তুকের প্রতি আন্তরিকতা বা সম্মান প্রদর্শনে কোনো খামতি ছিল না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পিঁড়ি আজ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে বসেছে। তার স্থান নিয়েছে চেয়ার বা টুল। শক্ত প্লাস্টিকের এসব আসবাব অধুনা প্রায় সব বাড়িতেই আদরের ও সম্মানের আসন লাভ করে নিচ্ছে। পিঁড়ি হয়েছে অপাঙক্তের, ব্রাত্য। 'কাঠের চারকোণা টুকরো যাহা আসন রূপে ব্যবহৃত হয়' তাকেই বলে পিঁড়ি। বাংলা ভাষার অভিধান 'আধুনিকী'তে পিঁড়ির অর্থ বা সংজ্ঞা এভাবেই বিধৃত হয়েছে। আমাদের সমাজ জীবনে কাঠের তৈরি এই আসবাবটির যখন বহুল ব্যবহার ছিল তখন তার সংজ্ঞা বা অর্থ জানতে অভিধানের ধারে কাছে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে এই আসবাবটির অস্তিত্ব-সংকট দেখা দেওয়ায় অভিধানের পাতা ওল্টানোর কৌতূহল দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই। অন্যান্য বাংলা অভিধানেও পিঁড়ির সংজ্ঞা বা অর্থ মোটামুটি এরকমই।

'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ' —এ সঞ্জীব নাথ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা-ও প্রায় একইরকম। তিনি লিখেছেন—'কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত আসন বিশেষ। দৈনন্দিন জীবনে বসার উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে পিঁড়ির বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত পিঁড়ি 'এক কাঠে' নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ এই পিঁড়িতে কোনো প্রকার জোড়া থাকে না। বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবিধ বর্ণবিভায় উজ্জ্বল মাছ, প্রজাপতি, লতা, ফুল প্রভৃতি চিত্রিত পিঁড়ি বর ও কনের উপবেশনের জন্য অপরিহার্য বলে গণ্য হয়'।[১]

জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান ও ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থে সরাসরি পিঁড়ি শব্দের অর্থ বা সংজ্ঞা যায় না। যেহেতু আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় পিঁড়ি শব্দের প্রচলন নেই, বরং 'পিঁড়া' বা খাট শব্দের প্রচলনই বেশি, তাই তার অভিধানে পিঁড়া শব্দটি পাওয়া যায়। তার সংজ্ঞা বা অর্থ হিসেবে বলেছেন- 'কাঠের

তৈরি বসবার নিচু আসন; পিঁড়ি।' আরও যে সব উদ্দেশ্যে শব্দটি বরাক উপত্যকায় ব্যবহৃত হয় তারও উল্লেখ করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী। গ্রাম বরাকের মানুষের কাছে পিঁড়ি শব্দের অপভ্রংশ 'পিড়া' শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও তাকে 'খাট'-ও বলা হত। পিঁড়ি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে তাঁর অভিধানে 'খাট' শব্দটির উপস্থিত অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু এই শব্দটি নেই। বোধহয় চৌপায়ার মান্য বাংলা হিসেবে খাট শব্দের প্রচলন থাকায় শব্দটির উল্লেখ প্রয়োজন মনে করেননি।

যাহোক, পিঁড়ির সংজ্ঞা ও তার বর্ণনা থেকে তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। বিয়ের অনুষ্ঠানে পিঁড়ির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মাহাত্ম্যও তাৎপর্যপূর্ণ। বর-কনের স্নানের সময় পিঁড়ি বা কুরশিতে বসিয়ে স্নান করানোর নিয়ম। ঐতিহ্যও বলা চলে। অবলুপ্তির সময়েও বিয়ের অনুষ্ঠানে কিন্তু পিঁড়ি আজও অপরিহার্য। একদা বিয়ের পিঁড়ি গামারি কাঠের তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা কাঠের মধ্যে গামারি 'শুদ্ধ' কাঠ বলে বিবেচিত। বিয়ের দধিমঙ্গল অনুষ্ঠানে বরকে পিঁড়ির উপর দাঁড় করানো নিয়ম। বিয়ের বাসরে কনের জন্য বরের আনা প্রসাধন ও প্রাসঙ্গিক উপাদানের বাক্সটি সম্মান-মর্যাদা সহ প্রথমে পিঁড়ির উপর রাখা হয়। পরে উলু দিয়ে কনের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিয়ের দানের সময় বর-কনেকে পিঁড়িতে বসানো হয়। বিয়েতে কনে পক্ষ থেকে অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে আসবারপত্রও দেওয়া হয়। পিঁড়িও আসবাব পত্রের এক অঙ্গ হয়ে আছে আজও।

একদা কুমারী কন্যার বিয়ের প্রচলন ছিল। সাত বছর বয়স থেকে নয় বছরের কুমারীদের বিয়ের সময় কন্যা-কুমারীকে পিঁড়ির উপর বসিয়ে বিয়ে দেওয়া হত। কুমারী কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসিয়ে ভগ্নিপতি বা দাদু-ঠাকুরদার বহন করে বরকে সপ্ত-প্রদক্ষিণ করানো হত। আজকের দিনে এমন বিয়ের রীতি অকল্পনীয় মনে হলেও তখনকার দিনে ছিল তা সামাজিক রীতি। এভাবে কন্যা-কুমারীকে নিয়ে সপ্ত-প্রদক্ষিণ করানোর সময় যদি কোনও কনে দুর্ঘটনাক্রমে পিঁড়ি থেকে পড়ে যেত তবে সেই কন্যা-কুমারীর দুর্ভাগ্য লেখা হয়ে যেত। সেই বরের সঙ্গে তার আর বিয়ে হত না। তখন নিম্নবর্গের কোনও বরের সঙ্গে হতভাগিনী কন্যা-কুমারীটির বিয়ে দেওয়া হত।

বিয়ের অনুষ্ঠানে পিঁড়ির উল্লেখযোগ্য ব্যবহার প্রসঙ্গে অতুল সুর তাঁর এক রচনায় উল্লেখ করেছেন— "কনের বাড়িতে কলাতলার কাজের পর, কনেকে স্নান, প্রসাধন ও সাজগোজ করনো হয়। তারপর তাকে একখানা লাল-রঙের শাড়ি পরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা পিঁড়ির ওপর বসিয়ে রাখা হয়। ইতিমধ্যে কনের বাড়িতে 'হাই-আমরা' বাটা হয়। একখানা বাটনা বাটবার শিলকে উলটো করে পেতে দুজন সধবা স্ত্রীলোক পরস্পরের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে সামনা সামনি হয়ে বসে হাই-আমলা (আমলকী ও অন্যান্য দ্রব্য বেনের দোকানে পাওয়া যায়) বাটে"।[২] আশুতোষ ভট্টাচার্যর এক রচনায়ও বিয়ের অনুষ্ঠানে পিঁড়ির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়— 'কলসী কিংবা ঘটগুলো জলে ভরে নিয়ে সকলে বরের বাড়ীতেই হোক কিংবা কনের বাড়ীতেই হোক, ফিরে আসে। তারপর বর কিংবা কনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে উঠোনে পিঁড়ির উপর বসায়, তার সর্বাঙ্গ হলুদ বাটা দিয়ে লেপে দেয়, তারপর তার মাথার উপর কলসী থেকে জল ঢেলে দেয়। এইভাবে আনুষ্ঠানিক স্নান সম্পন্ন হয়।' ওই একই রচনার অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন- 'তারপর আত্মীয়স্বজন কনেকে একটি পিঁড়ির উপর বসিয়ে উঠোনের যেখানে সম্প্রদান করা হয় সেখানে পিঁড়িশুদ্ধ তুলে নিয়ে আসে। তারা কনেকে নিয়ে পিঁড়িতেই বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের সময় প্রত্যেকবার যখনই কনে বরের সম্মুখীন হয় তখনই সে দু'হাতের আঙুলে বিচিত্র মুদ্রাভঙ্গি করে বরকে ফুল ছিটিয়ে দেয়।'[৩]

বিয়ের অনুষ্ঠানে সুশোভিত পিঁড়ির ব্যবহার সম্পর্কে তুষারকান্তি নাথের অভিমত প্রণিধানযোগ্য- "বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত পিঁড়িতে চিত্রিত হয় মাছ, কড়ি, পান, ফুল (পদ্ম) ইত্যাদি। বস্তুত এসবই উর্বরতা সূচক চিহ্ন। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য দুটি নর-নারীর মধ্যে চিরায়ত সম্পর্ক স্থাপন ও সন্তান-সন্ততি লাভ। অর্থাৎ সৃজনই হল বিবাহের প্রধান লক্ষ্য ও কামনা। সেই কামনা যাতে ফলবতী হয় তাই উর্বরতা ও জননকেন্দ্রিক মনন প্রভাব বিবাহের পিঁড়িতে চিত্রিত বস্তুগুলোর মধ্যে তীব্রভাবে প্রকট। আর বিয়ের পিঁড়ি যে 'এক কাঠে' তৈরি হয় বা এই পিঁড়িতে

কোনও জোড়া থাকে না, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও হল একধরনের জাদু-কল্পনা। দাম্পত্য জীবন যাতে সুখের হয়, বিবাহোত্তর জীবনে স্বামী-স্ত্রীর ঘর-সংসার যেন 'জোড়াতালি'র ঘর-সংসার না হয় তাই 'এক কাঠ'-এর পিঁড়ির ব্যবহার বিবাহের লোকাচারে জাদু-সংস্কার হিসেবে সক্রিয়।" —এরকমই অভিমত তুষারবাবুর।

বিয়ের গীতে পিঁড়ির উল্লেখ ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। গীতের মাহাত্ম্য প্রকাশ ও প্রয়োজনে কোনও কোনও গীতে পিঁড়ির প্রায় সমার্থক শব্দ 'কুটি চকি' (ছোট আকারের জলচৌকি), 'আসন', 'কুরশি' বা 'কুরশি পিঁড়ি' ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন একটি গীতে 'কুটি চকি'-র ব্যবহার লক্ষণীয়—

'আনগো সখি কুটি চকি বসাও নিয়া রাইয়ারে
মায়ের সোয়াগী ময়না আমার
স্নান করাও সকলে—'

বিয়ের কন্যাদানের গীতে 'আসন' ব্যবহার করা হয়েছে—

'আসনে বসিয়া রাজা গো ভাগ্যবান
অষ্টম বৎসরের উমা শিবকে করইন দান'।

'কুরশি পিঁড়ি'র ব্যবহারও লক্ষণীয়-

'দেখ যত সখীগণ স্বর্ণথালে জামাতার
পঞ্চামৃত ভোজন
আনিয়া কুরশি পিড়ি দিলা যে পাতিয়া
তার উপরে বসইন জামাই আসন করিয়া'

শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠীপুজোর অনুষ্ঠানেও পিঁড়ি ব্যবহার করা হয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর এক রচনায় উল্লেখ করেছেন— 'শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে রাত্রি প্রায় দশটার সময় আঁতুড় ঘরের ভিতরের দিকে রুদ্ধ দরজার মাঝখানে একটি ছোট কাঠের পিঁড়ি পাতা হয়। জলপূর্ণ একটি ছোট্ট ঘট ও একটি নতুন গামছা পিঁড়ির উপরে রাখা হয়। কলাগাছের বাকল দিয়ে তৈরি দুটি পাত্র, একটিতে চাল, আর একটিতে ধান পূর্ণ করে পাশাপাশি রেখে দেওয়া হয়। চাল দিয়ে যে পাত্রটি ভরে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি পাকা কলা, কিছু মিষ্ট দ্রব্য এবং অন্যান্য কিছু পুজোর খাদ্য সামগ্রী রাখা হয়। এক জোড়া বালা, রঙিন সুতোয় তৈরি এক টুকরো কোমর-বন্ধনী, সোনা এবং রুপোর কয়েকটি টুকরো, একটি কলম ও একটি দোয়াত সেই কাঠের পিঁড়ির উপর রাখা হয়। কাঠের আসনটির সামনে একখানি নূতন কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচটি সলতে ঘিয়ে ভিজিয়ে তা দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। মনে করা হয় যে, গভীর রাত্রে চিত্রগুপ্ত ঠাকুর সূতিকাগৃহে প্রবেশ করেন এবং কাঠের আসনটির উপর তিনি বসেন। তিনি পুজোর সামগ্রী সবই গ্রহণ করেন এবং তার বিনিময়ে নবজাত শিশুকে একটি বর দেন।"[৪]

ছোট শিশুদের ঘুমপাড়ানি ছড়াতেও পিঁড়ির উল্লেখ রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য আসবাবের মধ্যে পিঁড়ির যে কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান ছিল এ সব থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রচলিত ঘুমপাড়ানি ছড়া—

'ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই, পালঙ্ক নাই, চোখ পেতে বসো'

বসার মত আসবাবহীন বাড়িতে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিদের আমন্ত্রণ করে বসার জন্য খোকা-খুকিদের চোখের পাতা পেতে দেওয়া হয়। শিশুদের ঘুম পাড়াতে আসবাবে সমৃদ্ধ বাড়িতেও তাদের চোখের পাতা বসতে দেওয়া হয়। আসলে সুর করে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিদের বসার জন্য যে 'খাট' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে সেটি পিঁড়ির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয়, বরাক উপত্যকার গ্রামাঞ্চলে পিঁড়িকে 'খাট' বলা হয়।

পুজা-পার্বণের অনুষ্ঠানাদিতেও পিঁড়ির ব্যবহার অপরিহার্য প্রায়। পুজা-অর্চনায় মঙ্গলঘট বা ব্রহ্মঘট স্থাপনে পিঁড়ির প্রয়োজন হয়। ঘট বিগ্রহের প্রতীক। পুজায় ফলপ্রাপ্তির আশায় মঙ্গলঘট বা ব্রহ্মঘটে পঞ্চপল্লব, কলা বা নারিকেল দেওয়া হয়। এসঙ্গে একখানা গামছাও ব্যবহৃত হয়। এভাবে সাজানো মঙ্গলঘট বা ব্রহ্মঘট স্থাপন করা হয় পঞ্চগুড়ি দিয়ে আলপনা আঁকা পিঁড়ির উপর। এটাও এক প্রতীকী ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে তুষারকান্তি নাথের অভিমত— "লক্ষ্মীর পিঁড়িতে মহিলারা যে আলপনা দেন তাতে সাধারণত থাকে পদ্ম, পেঁচা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের শিস ও ধানের গোলা। বাঙালির কৃষি ও ধানকেন্দ্রিক সংস্কৃতির জাদু-সংস্কারের আভাস মেলে লক্ষ্মীর পিঁড়ির আলপনায়। কৃষিজীবী বাঙালির কাছে দেবী লক্ষ্মী হলেন ক্ষেত্রদেবী, ধান্যলক্ষ্মী, ধান্যজয়ী দেবী। লক্ষ্মীব্রতের প্রধান উপকরণও তাই ধান-চাল, ধানের ছড়া, ধান্যগুচ্ছ। লক্ষ্মীর আসন হিসেবে ব্যবহৃত পিঁড়ির আলপনায় নারীমনের কাম্যবস্তুর প্রতীক লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, ধানের শিস, ধানের গোলা ইত্যাদি এজন্যেই দেখি।"

হর-গৌরীর বিবাহের অনুষ্ঠানে পিঁড়ির ব্যবহার করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালায় (জোকা) যে পটচিত্র রয়েছে তাতে এরকমই এক ছবি রয়েছে। পটচিত্রে শিব দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সঙ্গে নারদ ও অন্যান্যরা, আর গৌরীকে পিঁড়িতে বসিয়ে বহন করে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে আসার দৃশ্য রয়েছে।

সামাজিক অন্যান্য অনুষ্ঠানেও পিঁড়ির ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে এখনও। শ্রাদ্ধকর্ম বা নামকীর্তনের শেষপর্বে দধিভাণ্ড ভাঙার সামাজিক প্রথা রয়েছে। এই দধিভাণ্ড ভাঙা হয় পিঁড়ির উপর আছাড় মেরে।

বিবাহ, পূজা-পার্বণ বা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত পিঁড়ি আর দৈনন্দিন জীবনে আসবাব হিসেবে ব্যবহৃত পিঁড়ির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য পিঁড়িতে সাধারণত তেমন কারুকাজ বা ছবি আঁকা থাকে না। অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত পিঁড়িতে নানা ছবি আঁকার কথা বলা হয়েছে। বিয়ের পিঁড়িতে একদা খোদাই করে কারুকাজ করা হত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই খোদাই করা কারুকাজ অনেক সরলীকরণ হয়ে ছবি আঁকার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তবে কোনও কোনও বাড়িতে নিত্য ব্যবহার্য পিঁড়িতেও খোদাই করা কারুকাজ দেখা যেত এক সময়। এজাতীয় পিঁড়ি ব্যবহার করা বাড়ি বনেদি বাড়ি বলে পরিচিত ছিল। সাধারণ বাড়িতে কারুকাজ করা পিঁড়ি ছিল অতি দুর্লভ।

এইতো সেদিন পর্যন্ত বাঙালি পরিবারে পিঁড়ি পেতে খাওয়া দাওয়া চলত। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কর্তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। আজকের কর্মব্যস্ত দিনে সে ঐতিহ্য উধাও হয়ে গিয়েছে। তখন রান্নাঘরের আসবাবের তালিকায় পিঁড়িই ছিল প্রধান উপকরণ।

পল্লীগীতি বা লোকগীতিতেও পিঁড়ির উল্লেখ রয়েছ। মাঝির উদ্দেশ্যে পল্লী রমণীর আবেগ মেশানো আমন্ত্রণে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সুন্দর‍্যা' নাওয়ের মাঝিকে নিজের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসার পিঁড়ি দিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর আবেদনও ব্যক্ত হয়েছে এক পল্লীগীতিতে—

"ওরে সুন্দর‍্যা নাওয়ের মাঝি
কোনদিন ছাড়িবায় নাও
আমি তো না জানি।
আমার বাড়ি যাইও মাঝি
বইতে দিমু পিড়া
তোমায় আমি খাইতে দিমু
শাইল ধানের চিড়া—"

বাড়িতে পড়শি কিংবা কুটুম্ব এলে প্রথমে পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বসতে দেওয়া হত। আপ্যায়নের এ ছিল প্রাথমিক পর্যায়। আজ কিন্তু তার বিপরীত ছবি বিদ্যমান। পিঁড়ি আজ ব্রাত্য। অস্তিত্ব সংকটের মুখে। অনুরূপভাবে বরাক উপত্যকার গ্রামীণ জনজীবন, এমনকী উপজাতিদের জনজীবনেও ঢেঁকি, ঘাইল-ছিয়া অপরিহার্য ছিল। পরবর্তী

সময়ে ধানভানা এবং মশলাপাতি গুঁড়ো করার মেশিনের বহুল প্রচলন হওয়ায় এসবই আজ বিলুপ্ত প্রায় হয়ে উঠেছে। আজ ঢেঁকিও নেই, ঢেকিআলও (ঢেঁকিশাল) নেই। আট-দশটি গ্রাম কিংবা বিস্তৃত অঞ্চলে খুঁজে পেতেও তার অস্তিত্বের দেখা মিলবে কিনা সন্দেহ। অথচ এক সময় অনেকের ধারণা ছিল ঢেঁকি ছাড়া জীবনই অচল হয়ে যাবে। একদা গ্রাম-বরাকের জনজীবনের অঙ্গ ছিল এই ঢেঁকি। ঢেঁকি নিয়ে নির্মলেন্দু চৌধুরীর প্রসিদ্ধ লোকসংগীত হয়তো অনেকের মনে আছে। "ও ধান ভানিরে/ঢেঁকিতে পাড় দিয়া। ঢেঁকি নাচে/আমি নাচি/ হেলিয়া দুলিয়া," ... এত সুন্দর গানও আজ লুপ্ত হতে চলেছে।

ঢেঁকি শুধু গ্রাম-বরাকেই প্রচলিত ছিল না, আসামের গ্রামাঞ্চলেও তার প্রচলন ছিল। শুধু বাঙালি সমাজেই নয়, অসমিয়া, মণিপুরি সহ নানা উপজাতি সমাজেও তার প্রচলন ও ব্যবহার ছিল। একদা গ্রামীণ জনজীবনে ঢেঁকির মিষ্টি-মধুর ছন্দ শোনা যেত। এখন আর ছন্দ শোনা যায় না। প্রত্যেকটি পরিবারেই ছিল এক একটি ঢেঁকি ও ঢেঁকিশাল। গেরস্থের কাছে ছিল অন্যতম পারিবারিক সম্পদের মত। কর্মব্যস্ত দিনের অন্যান্য কাজের অঙ্গ ছিল ধান ভানার কাজ। খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করে দিনের অন্য কাজ শুরু করার আগে ঢেঁকিশালে যেমন মধুর ছন্দের ঢেঁকি চালানো হত, তেমনি সন্ধ্যার পরও দিনের কাজের শেষে ঢেঁকি চালানোর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই নিবন্ধকারের। প্রধান খাদ্যশস্য চালের মজুত করে রাখা হত এই ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে। এক একটি পরিবার অন্তত দু-তিন মাসের চাল মজুত করে রাখত। এছাড়া, দুর্গাপুজা, ঈদ, পৌষপার্বণ ইত্যাদি উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে চালের মজুত গড়ে তুলতে ঢেঁকিশালে ব্যস্ততার অন্ত ছিল না এক একটি পরিবারের মা-কাকিমা-পিসি-মাসিদের। আজকের প্রক্ষিতে সে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

ঢেঁকি, "ধান ভানবার পা-চালিত কাঠের যন্ত্র বিশেষ"—এরকমই সংজ্ঞা রয়েছে জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক বাংলাভাষার অভিধান ও ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থটিতে (পৃঃ ১৮৮)। বাংলা অভিধান 'আধুনিকীতে'ও ঢেঁকির অনুরূপ সংজ্ঞা বা অর্থ রয়েছে। ধান ইত্যাদি কুটিবার বা ভানিবার এরকম কাঠের যন্ত্র বলে 'আধুনিকী'তে বলা হয়েছে। কিন্তু জগন্নাথ চক্রবর্তীর অভিধানে ঢেঁকির ছবিও রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় তার যন্ত্রাংশের নামও হয়েছে। এতে যারা ঢেঁকি কোনও দিন দেখেনি এবং আর দেখার মত তেমন সুযোগও নেই, বিশেষত আগামী কৌতূহলীদের কাছে এই দেশজ যন্ত্রটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে' বলা হয়েছে।

"ঢেঁকি (মু ডিংকি) বি-ধান ভানবার বা চিঁড়ে কোটবার দিশি যন্ত্র" (ঢেঁকিতে ধান ভেনে দেবে বামনদিদির ঘরে-রবীন্দ্রনাথ)। বিন-বোকা, অপরে চালালে চলে এমন বুদ্ধিহীন (হুঁকাটি বাড়ায় রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি-রবীন্দ্রনাথ)।

ঢেঁকিশালে—বি নিতৎ যে ঘরে ঢেঁকি থাকে ও ধান ভানা হয়, ঢেঁকিঘর (ঘরখানা ঢেঁকিশাল, গৃহস্থ বউ তখন পাড় দিচ্ছে-যোগেন্দ্রনাথ)

ধানের পেট থেকে সাদা ধবধবে চাল বের করতে তখন ঢেঁকির কোনও বিকল্প ছিল না। কিন্তু যখন ধান ভানার রাইস পত্তন হল তখন থেকেই ঢেঁকির ভাগ্য বিড়ম্বনার সূত্রপাত হল। ঢেঁকির পরিবর্তে দুর্গম এবং প্রান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলেও পাঁচ অশ্বশক্তির পাম্প মেশিন কারিগরি পদ্ধতিতে ছোট ছোট ধান ভানবার কল চলছে হাল আমলে। ফলে যে সব অঞ্চলে ঢেঁকির কদর থাকবার সম্ভাবনা ছিল সে সব অঞ্চল থেকেও ঢেঁকি বিদেয় হয়ে গেল।

অবশ্য বাংলা প্রবাদ-প্রবচন, উপমা প্রভৃতিতে ঢেঁকি স্বমহিমায় বিরাজ করছে। যেমন নীরেট বা মোটাবুদ্ধির মানুষকে নির্দ্বিধায় 'বুদ্ধির ঢেঁকি' বলে তাচ্ছিল্য বা উপহাস করার তুলনা হয় না। অকর্মণ্য লোককে, 'নিষ্কর্মার ঢেঁকি' বলে ওই লোকটির চরিত্র সহজে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। আবার 'আমড়া গাছের ঢেঁকি' বলেও এমন চরিত্রের লোককে অভিহিত করা হয়। আরেক শ্রেণির লোকের চরিত্র সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' বলাই যথেষ্ট। টেকির বা ধান ভানা সংক্রান্ত প্রচলিত প্রবাদও রয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বোঝাতে 'ধান ভানতে শিবের

গীত' এর তুলনা মেলা ভার। বরাক উপত্যকার গ্রামীণ প্রবাদে আজও শোনা যায় 'হারাদিন এলেমেলে/হাই আইতে বারা ভানে'। অর্থাৎ স্বামীর অবর্তমানে সারাদিন অকাজে সময় ব্যয় করে বাড়িতে স্বামীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়া। এই প্রবাদ ব্যবহার করে এক ধরনের নারী চরিত্র বোঝানো হয়ে থাকে। ছোটদের ছেলে-ভুলানো গল্পেও ঢেঁকি বা ঢেঁকিশালের কথা প্রচলিত ছিল একসময়। এখন ঢেঁকি দেখাও যায় না, বর্তমান প্রজন্ম ঢেঁকি কী জিনিস বুঝেও না। লোকজীবন থেকে যেমন ঢেঁকি বিদায় নিয়েছে তেমনি ছেলে-ভুলানো গল্প থেকেও তার বিদায় ঘন্টা বেজে গিয়েছে। বাংলা লোকসাহিত্য বা ধ্রুপদী সাহিত্যে ঢেঁকির উপস্থিতি পাওয়া যায়। স্কুল পাঠ্যেও এক সময় এ জাতীয় গল্প পড়ানো হত। তেজিমালা ও তার বিমাতার গল্প স্কুলে আর পড়ানো হয় না। তেজিমালা নামে এক সরল প্রকৃতির বালিকাকে তার বিমাতা প্রচণ্ড হিংসা করত। ব্যবসায়ী পিতা ব্যবসায়ের কাজে নানা স্থানে পরিভ্রমণে ব্যস্ত থাকতেন। এমন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিমাতা খুব অত্যাচার করত তেজিমালার উপর। ঢেঁকিতে ধান ভানবার সময় বালিকা তেজিমালাকে কৌশলে হত্যা করে বিমাতা। তারপর তার লাশ ঘরের পেছন দিকে মাটির নিচে সমাধিস্থ করে দেয়। সেখানে একটি লাউগাছ জন্মে। বেশ সুন্দরভাবে লাউগাছটি বাড়তে থাকে। ব্যবসায়ের কাজে পরিভ্রমণ শেষে বাড়িতে আসেন তেজিমালার পিতা। তিনি কন্যার খোঁজ করলে তেজিমালার বিমাতা সে মামার বাড়ি গিয়েছে বলে মিথ্যা কথা বলে। পরদিন লাউগাছটি তেজিমালার পিতার নজরে পড়ে। তিনি বেশ খুশি মনে লাউগাছটির কাছে গিয়ে কটি পাতা স্পর্শ করতেই লাউগাছ বলে ওঠে- ছুঁয়ো না, আমি তেজিমালা। বিমাতা আমাকে হত্যা করে এখানে কবর দিয়েছে।' তখনই তেজিমালার হত্যা রহস্য ব্যবসায়ী পিতার কাছে উন্মোচিত হয়। এমন মর্মস্পর্শী গল্প আজকের কিশোর-কিশোরীরা জানে না। সে সুযোগ নেই।

দেবর্ষি নারদের বাহন ছিল ঢেঁকি। ঢেঁকি চড়েই তিনি স্বর্গ, মর্ত্য ভ্রমণ করতেন-একথা বহুল প্রচলিত। কিন্তু লোকসংস্কৃতি গবেষক সনৎকুমার মিত্র তাঁর 'ঢেঁকি: বাহন নারদের' শীর্ষক এক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে বলেছেন অন্য কথা। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হল— "জন্মমাত্রেই বৃষ্টি হওয়া, (কান্যকুজে দ্রুমিল নামে এক গোপরাজের স্ত্রী কলাবতীর পুত্রের জন্মের সময় চরম অনাবৃষ্টি চলছিল, পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সুবর্ষণ আরম্ভ হয়। এজন্যে ওই পুত্রের নাম রাখা হয় নারদ) নামের অর্থ যিনি জলদান করেন। যাঁর গৃহ (শয্যা) জল সেই নারায়ণই যাঁর স্রষ্টা আশ্রয়দাতা ও পুজনীয় তিনি মূলত কৃষি উৎপাদক বা কৃষি অধিকর্তা ছাড়া কি-ই হতে পারেন। তাই নারদের মৌলিক পরিচয় কৃষি-ফসলের প্রধানত ধান চাল এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঋষিত্ব ও অপরাপর মহাত্মাসুলভ গুণ তাঁর ওপর পরবর্তীকালে আরোপিত। অধিকন্তু সেই অতি প্রাচীনকালে একান্তভাবে কৃষিনির্ভর সমাজে মুখ্য বা দক্ষ কৃষি উৎপাদক ব্যক্তি অবশ্যই শ্রদ্ধার আসন লাভ করবেন, এইটিই স্বাভাবিক। এমন যে মুনি বা ঋষি তিনি সঙ্গীতজ্ঞ তাই হাতে বীণা। কিন্তু তাঁর বাহন হলো ঢেঁকি, মুণ্ডারি ভাষার 'ডিংকি' বা 'ঢেঙ্কি' থেকে উদ্ভূত। মূল উচ্চারণ 'ঢেঁকি'- নাসিক্যভবনের ফলে ঢেঁকি। ধান থেকে চাল তৈরি করার সুপারিচিত 'গ্রামীণ-যন্ত্র' (Machine)। হিন্দীতে 'ঢেঁকি', মারাঠীতে 'ঢেঁকি', মৈথিলীতে 'চে (টে) কী', অসমিয়াতে 'ঢেঁকী' শব্দের ব্যবহার থাকলেও, এ কথা বলা যেতে পারে যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম প্রমুখ পূর্বভারতের গ্রামীণ এবং দেশজ husking machine ধানভানার একমাত্র কল। এমন কল যা নারদের বাহন সে কথা কিন্তু কোন শাস্ত্র বা পুরাণ কখনও কোথাও বলেনি।"[৫] ঢেঁকি ধানভানার একদা একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র ছিল। ঢেঁকি তৈরির ফর্মুলা ব্যাখ্যা করে সনৎকুমার মিত্র তাঁর প্রবন্ধটিতে লিখেছেন- 'নর-নারীর রতিক্রিয়ার আদি যে মুদ্রা তারই অনুরূপে ঐ যন্ত্রের সৃষ্টি। আদি মানুষ অনুধাবন করেছে যে ঐ পদ্ধতি করে তাঁর 'বাড়াও' কৃত্যটি সার্থক হয়েছে।... ঢেঁকির 'গড়' গহ্বর শায়িত স্ত্রী অঙ্গ আর অগ্রভাগটি 'ঢুসলি' (মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার ভাষার) তাতে উপগত পুরুষ — উভয়ের সহযোগে গড়ের গহ্বর থেকে জীবনদায়ী শস্যপ্রাপ্তি — যেমনভাবে মানবের জন্ম হয়। এইভাবে জমিকে শায়িত নারী এবং লাঙ্গলের ফলামুখ তাতে উপগত পুরুষ; — ফল শস্যপ্রাপ্তি। অতএব 'বাঁচো'-র মূল উপকরণ শস্যপ্রাপ্তি যার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে সেই জলের দেবতা নারদকে স্বাভাবিক কারণেই বাহন দিতে হয়েছে ঢেঁকি।' নারদ সমগ্র ভারতের পুরাণ

চেতনায় বর্তমান। কিন্তু সর্বত্র তাঁর বাহন ঢেঁকি নয়। পূর্ব ভারতের কিছু সীমিত অঞ্চলেই তাঁর বাহন ঢেঁকি। আর এজন্যেই বোধ হয় পূর্বভারত ছাড়া অন্যত্র বাঙালির জীবনে ঢেঁকির প্রচলন নেই। কেননা, লোকচেতনার অভিজ্ঞান সর্বত্র একইভাবে অনুসরণীয় নয়। এমন যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ঢেঁকি, হোকনা কেবল পূর্বভারতেই সীমিত প্রচলিত, সে ঐতিহ্য আজ আর নেই। পৌষ সংক্রান্তি, ঈদ বা বিহু যে সব সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ধান ভানা কিংবা পিঠে-পুলি তৈরির জন্য চাল গুঁড়ো করতে গ্রাম জীবনে শোনা যেত ঢেঁকির ঢেঁকুর-ঢেঁকুর মিষ্টি ছন্দের শব্দ তা আর শোনা যায় না। ঢেঁকি কিংবা ঢেঁকিশালের ঐতিহ্য হারিয়ে গিয়েছে। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' এই প্রবাদবাক্যের মধ্যেই বোধ হয় তার অস্তিত্ব জিইয়ে রাখতে সমর্থ হবে কেবল।

নৃতত্ত্বের উদ্যান (Anthropological garden) নামেও আখ্যায়িত শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চল। এই অঞ্চলের জনবিন্যাসের প্রেক্ষিতে এই নামাকরণের কারণ। ভারতীয় আর্য, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, প্রটো-অস্ট্রোলয়েড ইত্যাদি বিভিন্ন নরগোষ্ঠী পাশাপাশি বসবাস করছেন। তাই এই অঞ্চলের জনবিন্যাস ও জন-সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এমন বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঢেঁকি এবং ঘাইল-ছিয়া ব্যবহার করতেন প্রায় প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর মানুষ। কালের অমোঘ বিধানে প্রায় প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর জীবন-চর্চায় আমূল পরিবর্তন ঘটছে। আর ক্রমে লোকজীবনের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বহনের বিভিন্ন সামগ্রীর অবলুপ্তি ঘটছে। যেমন- ঢেঁকির কথা বলা হয়েছে। ঘাইল-ছিয়ার ভাগ্যেও অনুরূপ করুণ দশার ঘটনা অনেকটাই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ঢেঁকির মত ঘাইল-ছিয়ার ব্যবহারও কমে আসছে। বলা যায় দুর্লভ সামগ্রীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আগে যেভাবে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই ঘাইল-ছিয়া দেখা যেত এখন আর দেখা যায় না।

ঘাইল মানে উদ্‌খল। ডমরুর মতো দেখতে এক ফুট গভীর গর্ত বিশিষ্ট কাঠের পাত্র যাতে ধান, চিড়া বা মশলা কোটা হয়। এভাবে ঘাইল শব্দের অর্থ এবং সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী তাঁর 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান ও ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থে। মান্য বাংলার অভিধান, যেমন 'আধুনিকীতে' উদ্‌খল শব্দ রয়েছে। যার সংজ্ঞা বলা হয়েছে — চাল ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য কাঠের বৃহৎ পাত্র। শুধু চাল নয়, চাল গুঁড়ো করা, রান্নাঘরের মশলাপাতি গুঁড়ো করার কাজে ঘাইল-ছিয়া অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতির বহুল প্রচলন হওয়ার, এ সব কাজে বৌ-ঝিরা ঘাইল-ছিয়া ব্যবহার অধিক শ্রম সাপেক্ষ মন করছেন। ফলে ব্রাত্য হয়ে পড়েছে পুরানো দিনের ঘাইল-ছিয়া।

জগন্নাথ চক্রবর্তীর অভিধানে 'ছিয়া' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন 'উদ্‌খলে ধান কুটার কাঠের দণ্ড ; মুষল'। তাই ঘাইলের সঙ্গে ছিয়ার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শুধু সাংসারিক কাজেই নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানেও ঘাইল-ছিয়ার ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সংক্রান্ত বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন — 'নান্দীমুখের জন্য যে চালের গুঁড়ি ব্যবহার করা হয় তাহা অধিবাসের দিন রাত্রে পঞ্চ এয়ো মিলে হামান দিস্তা দিয়ে প্রথমে ধান থেকে চাল বের করে রাখেন। পরদিন অর্থাৎ বিয়ের দিন সেই চাল গুঁড়ো করে নান্দীমুখ হয়। তখন গীত হয়- নান্দীমুখের বারাভানার গীত। 'ঘাইল ছিয়া' অর্থাৎ হামান দিস্তা কুলো ডালাকেও চলের গুঁড়িগুলো সাজানো হয়। "দেখ অযইধ্যা ভুবন, নান্দীমুখের বারাবানইন যত নারীগণ। কৈকেয়ী, কশইল্যা রাণী, সহ সকিগণ, সুমিত্রা সুন্দরী আসি মিলিলা তখন। সোনার নির্মিত ছিয়া বিচিত্র গঠন, সোনার উখলী আনি করিলা স্থাপন। দুই অদিকে দুই অ নারী আনন্দিত মন, মনের হরিষে বারা বানিলা তখন। ঘুরি ঘুরি বারাবানইন বারা প্রফুল্ল অন্তরে, মধ্যে মধ্যে এক নারী কুলা দিয়া ঝারে......।"[৬]

অধ্যাপক-গবেষক ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্যের এক রচনায়ও পাওয়া যায় উদ্‌খল বা ঘাইল ছিয়া ব্যবহারের বর্ণনা। 'নান্দীমুখের জন্য চাল তৈরি করার সময় কিছু মেয়েলী আচার পালন করা হয়। অধিবাসের রাত্রিতে আলপনা দিয়ে চিত্রিত উদ্‌খলে ধান ভরে পাঁচটি সুপারী উপরে রেখে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর ধান দূর্বা দিয়ে বরণ করে সেই কাপড় ও সুপারী ধাইকে দেওয়া হয়। (ফল অর্থাৎ সন্তান লাভের জন্যই বিবাহ।

এজন্যই ফল অর্থাৎ সুপারী দেওয়া হয়।) দুজন সধবা মহিলা একই সঙ্গে সেই উদ্‌খলে চাল তৈরি করেন। তারপর মুষল দুটো কনে ও বরের বাড়ীতে যথাক্রমে সাত ও নয়বার সুতো পেঁচিয়ে জোড় করে রাখা হয়। জোড় করে বাঁধা সেই মুষল দুটোর মুখ একটি জলপূর্ণ মাটির পাতিলে চতুর্থ মঙ্গল না হওয়া পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়। এ অনুষ্ঠান "বারা আরঘা"।' 'বারা আরঘা' এবং 'নান্দীমুখের বারা'-র গীতও তিনি উল্লেখ করেছেন-

'বারা আরঘার' গান

দেখ মঙ্গলাচরণ, নান্দীমুখের তন্ডুল আরখে নারীগণ
সুমঙ্গল বাদ্য ধনি বাজে ঘনে ঘন
চর্তুদিকে জয়ের ধনি করে নারীগণ
কশল্যা সুমিত্রা কেকৈ হরষিত মন
সমাদরে আসিয়া সবে করিলা আরঘন
তারপরে সখীগণে আরঘে জনে জন
যতনে রাখিলা তন্ডুল যজ্ঞের কারণ

'নান্দীমুখের বারা'

বারা বান ল বান ল মুহন মুরারী
বৃন্দাবনে বানইন বারা রসের কামিনী
ঢেকিয়ে উঠিয়া বলে আমি উত্তম জাতি
আমার উপর নৃত্য করে রসের যুবতী
কেত্রায় উঠিয়ে বলে আমরা দুটি ভাই
যুবতীয়ে নৃত্য করে আমরা গান গাই
গাইলে উঠিয়া বলে আমার বুকে কুপ
আমার বুকে ধান ঢালিয়া দেয় নারী ছুব
ছিয়ায় উঠিয়া বলে আমার বুকে লুহা
আমায় লৈয়া নৃত্য করে যুবতীর মেলা
কুলায় উঠিয়া বলে ত্রিকুন মণ্ডল
উঠিতে নাচইন পড়তে নাচইন ঝারিয়া ফালায় তুষ
চালইনে উঠিয়া বলে আমার বুকে ফুল
রাধা চক্র ঘুরিয়া আইলে সকল ধাইন্য স্তূপ
পুরায় উঠিয়া বলে আমি উত্তম জাতি
বন্দরের বাজারের মাঝে আমার ডাকাডাকি।'[৭]

ঘাইল-ছিয়া স্ত্রী-চিহ্ন এবং পুরুষ-চিহ্নের দ্যোতক বলে মনে করেন গবেষক তুষারকান্তি নাথ। এ প্রসঙ্গে তার অভিমত— 'কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে ও সমাজ মননে 'ঘাইল-ছিয়া' শুধু কাষ্ঠনির্মিত নিষ্প্রাণ বস্তু নয়, এ দুটোর যেন রয়েছে প্রাণবন্ত অস্তিত্ব। তাই বিবাহের লোকাচারে অধিবাসের রাত্রে ঘাইল-ছিয়া দ্বারা গুঁড়ি কোটা একটি মাঙ্গলিক রীতি এবং এ দুটোর বিশেষ ব্যবহার লক্ষণীয়। 'গায়ে হলুদ' কোটার কর্মটি ঘাইল-ছিয়ার সাহায্যে হয়। বস্তুত, আকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্যই 'ঘাইল' ও 'ছিয়া' যথাক্রমে এবং পুরুষ-চিহ্নের দ্যোতক। আদিম জাদু কল্পনা প্রসূত ঘাইল-ছিয়া দু'টি বস্তুই উর্বরতাসূচক। এজন্যই বিবাহ অনুষ্ঠানের অধিবাসের রাত্রে ঘাইল-ছিয়া দু'টিকেই চালের গুঁড়ো দিয়ে চিত্রিত করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে তাই এদের উজ্জ্বল উপস্থিতি।'

নকশি কাঁথা : হারিয়ে গিয়েছে বলা যায় নকশি কাঁথা। শীত নিবারণের অবলম্বন তো ছিলই,

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একসময় নকশি কাঁথার আদর-কদর ছিল অনেক বেশি। বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যথেষ্ট মর্যাদা পেতো হালকা এই নকশি কাঁথা। সময়ের আর্বতে নকশি কাঁথা আজ ইতিহাস হয়ে পড়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও দেখা যায় না নকশি কাঁথা। চর্চা নেই বলেই অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছে। পুরানো পরিধানের অযোগ্য কাপড় দিয়ে হালকা পাতলা কাঁথার উপরে হরেক রঙের সুতোয় নানা ধরনের নকশা, ছবি এঁকে তৈরি করা হতো নকশি কাঁথা। আর এই কাঁথার চতুর্ধারে নকশা করা শাড়ির পাড় শৈল্পিকভাবে লাগানো হতো। এতে নকশি কাঁথার সৌন্দর্য বেড়ে যেতো অনেকগুণ। সেকালের মহিলাদের শিল্পরুচি আর শিল্পকলার পরিচয় বহন করতো এইসব নকশি কাঁথা। সাংসারিক কাজ গুছিয়ে নিয়ে অলস দুপুর বা বিকেলের সময়টুকু সেকালের অনেক মহিলা অবহেলায় বা গল্পগুজবে কাটাতেন না। আজকের মতো বিনোদন বা অবসর সময় কাটানোর ঢালাও ব্যবস্থা সেকালে ছিল না। মহিলারা তখন নিজেদের সাধ্যমতো নানা শিল্পরুচির হাতের কাজ করে অবসর সময় কাটাতেন। শুধু নকশি কাঁথা সেলাই করতেন না। সূচ-সুতো দিয়ে হাতপাখা, কাপড়ের উপর নানা নকশার টেবিলের ঢাকনা, রুমাল প্রভৃতি কত কিছু সেলাই করতেন। আজকের মহিলারা সে সব দিনের মহিলাদের কথা ভাবতেই পারবেন না। সেকালে বিয়ের পাত্রী পছন্দ করার মাপকাঠির এক অঙ্গ ছিল সূচিশিল্পে পারদর্শিতা।

কৃষি যেমন মহিলাদের আবিষ্কার তেমনি কাঁথাও তাদের সৃষ্টি। তবে তার ব্যবহার কবে শুরু হয়েছিল এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতি গবেষক আশরাফ সিদ্দিকী তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'কোন সুদূর অতীতে কাঁথার ব্যবহার শুরু হয়েছিল, তা ঠিক মত বলা না গেলেও নৃতত্ত্ববিদদের মতে, কাঁথা জাতীয় কোন বস্তু আদিম মানুষ গুহা জীবনেও সম্ভবত ব্যবহার করতো। গুহা মানবগণ নিদারুণ শীতের দিনে কোন গুল্ম বা বৃক্ষের তন্তুময় বাকল রোদে শুকিয়ে, পাথর তা পিটিয়ে কিছুটা নরম করে কোন বৃক্ষ বা গুল্মের আঁশ বা জীবজন্তুর অতি চিকন শিরা-উপশিরা দিয়ে কোন ধাতব বা বাঁশ-কাঠের সুঁচে সেলাই করে নিত।

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বন্য কোন কার্পাস গাছ বা প্রাকৃতিক শিমূল গাছের ফল থেকে তারা তুলার ব্যবহার শিখলো এবং পরবর্তী সভ্যতা বা সমান্তরাল কোন সভ্য জাতির কাছ থেকে জিনিসপত্রের আদান প্রদান বা বার্টার (বিনিময়ের) মাধ্যমে শীত নিবারণের জন্য কাঁথা জাতীয় কোন গাত্রাবরণ বা পরিধানের জন্য বস্ত্রের ব্যবহার জেনে থাকবে। আর্যসভ্যতা আগমনের পূর্বেও আর্যেতর জাতি এবং দ্রাবিড়গণ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেও বস্ত্রের ব্যবহার জানতো, তাদের গাথা, কথা ও উপকথায়ও তার বিবরণ পাওয়া যায়। রূপকথায় কাঁথার বিবরণ বহু পাওয়া যায়। আবহমান বাংলাদেশ বহু জাতির সংস্কৃতি ও সংস্কারের মিলনভূমি, বহু রিচুয়্যাল-ব্রত-পালা-পার্বণ অনুষ্ঠানেরও জন্মদাত্রী। অনার্যগণ যেমন আর্যদের কাছে ঋণী, আর্যগণও নিয়েছে তাদের কাছ থেকে প্রচুর। সাধারণ শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনে যার উদ্ভাবন, পরবর্তীকালে কন্যার জন্ম, বিবাহ, ধর্মানুষ্ঠান, টাবু, উৎসব ইত্যাদি সব কিছুকে ঘিরে নকশি কাঁথার মোটিফ প্রসারিত ও ফুলে-ফসলে পল্লবিত হয়েছে। এমনও দেখা যায়, মা কন্যার জন্মের পর কাঁথাটি হয়তো শুরু করেছিলেন, শেষ হয়েছে কন্যার বিবাহ উৎসবের পূর্বে। এর মধ্যে এসেছে নানা দৈব-দুর্বিপাক, অজন্মা খরা, বন্যা-এমনকি মৃত্যুর শোক তাও প্রাণ পেয়েছে কাঁথায়। প্রাচীন খেলাধূলা, উৎসবের উপাচার-এমনকি কারবালার শোকাবহ ময়দান, দুলদুল ঘোড়া, ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা, পরীবালা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, সংসারের কুলো, ফুল-ফসল, গৃহ, কখনও চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ, গোলাকার, সমান্তরাল বা লম্বমান-কত ছাঁচে রঙে-ঢঙে অঙ্কিত। অথচ উপকরণ সেই পুরাতন কাপড়, পাড়ের সূতো, যা ছিল পরিত্যাজ্য, নগণ্য-তাই হল আবহমান। মাতৃস্নেহের করুণ রসের যাদু স্পর্শে ধন্য, গণ্য ও পবিত্র আর্ট। জন্মসূত্রে যার সঙ্গে পরিচয় মৃত্যুসূত্রেও সেই তো শেষ সঙ্গী।'[১]

নকশি কাঁথা যে ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে পড়েছিল তা বিভিন্ন লোককথা, ছড়া ও গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নবজাতকের জন্মের পর এক ছড়ায় পাই ঃ

'আধপৃষ্ঠ খাইছিল মায়ের গুয়ে আর মুতে।
আধপৃষ্ঠ খাইছিল মায়ের মাঘ মাইস্যা শীতে।।

নিজের অঙ্গের কথা খানি যাদুর অঙ্গে দিয়া।
সারানিশি পোহাইল মায় জাগিয়া বসিয়া।''

নকশি কাঁথায় সূচ-সুতোয় লেখা লোক ছড়ায় দিদি-ভাইয়ের অগাধ স্নেহ-ভালবাসার প্রতিফলনও পাওয়া যায়—

'সোনামণি ভাই আমার সুখে নিদ্রা যাইও।
অভাগিনী দিদির কথা নিরলে ভাবিও।।'[১০]

'আরেকটি লোকছড়া—
কাঁথা না বিছাইয়া
কাঁথা না খুলিয়া
ছবি না তুলিতে গো
ঘুমে কাতর হইলাম রে।'[১১]

বিয়ের গানেও নকশি কাঁথার প্রসঙ্গ—

'ঢোল করতালের তালে তালে।
কন্যা সাজাই আমরা বালিরে সাজাই গো।।
পঞ্চকুলা লইয়া আমরা বালিরে বসাই গো।
সেই না মায়ের ঝিলমিল নকশি না কাথায় গো।।'[১২]

পল্লীকবি জসিমউদ্দিনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' বিখ্যাত এক কাব্য। এই কাব্য থেকে কয়েক ছত্র—

'এই কাঁথা যবে আরম্ভ করে তখন সে একদিন।
কৃষাণীর ঘরে আদরিণী মেয়ে সারা গায়ে সুখ চিন।।
স্বামী বসে তার বাঁশী বাজায়েছে সেলাই করেছে সে-যে।
গুন গুন করে গান কভু রাঙা ঠোঁটেতে উঠেছে বেজে।।'

নকশি কাঁথা প্রসঙ্গে শিবতপন বসু লিখেছেন— 'শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই কাঁথার প্রাচীন নাম ছিল ননকা কাঁথা। সুরমা-বরাক উপত্যকায় আমরা প্রধানত দু ধরনের কাঁথা প্রচলন দেখতে পাই ঃ ১। তলপানি কাঁথা, ২। পাড়ির কাঁথা, এর মধ্যে পাড়ির কাঁথা সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।'[১৩] একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি নকশি কাঁথা শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন- 'যদিও সংস্কৃত 'কন্থা' শব্দের অপভ্রংশ কাঁথা, তথাপি 'নক্সি কন্থা' নামে কোন শব্দ আমরা বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডারে পাইনি। সুতরাং নকশি কাঁথা নামটি অর্বাচীন কালের বলেই মনে হয়।'

ফারসি শব্দ ভাণ্ডারে 'নককাশি' শব্দটি মজুত রয়েছে। এর অর্থে, ধাতু পাত্রাদিতে চিত্রণের বা খোদাইয়ের কাজ। নককাশি শব্দ থেকেই প্রথমে নকাশি ও পরে নকশি শব্দের সৃষ্টি। সুতরাং ফারসি 'নককাশি' ও সংস্কৃত 'কস্থা' শব্দ দুটি যুক্ত হয়ে নকশি কাঁথা নামটি সৃষ্টি হতে যে বহু সময় লেগেছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।[১৪]

নকশি কাঁথার প্রসার লাভ ঘটেছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী সময়কালে। নকশি কাঁথা নামটিও এই সময়কার সৃষ্টি বলে মনে করেন শিবতপনবাবু তার ওই প্রবন্ধে। তিনি আরও লিখেছেন— ''নকশি কাঁথার শিল্পকর্মে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বিদ্যমান। একদিকে মুসলমান রমণীর হাতে নকশি কাঁথায় অঙ্কিত হয় দুলদুল ঘোড়া, কারবালায় প্রান্তর, অন্যদিকে হিন্দু রমণীরা আঁকেন উচ্চৈঃশ্রবা, শ্রীসম্পদদাত্রী লক্ষ্মী। অথচ দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের শিল্পীরা লোকায়ত সামাজিক জীবনের রূপাঙ্কনে এক ও অভিন্ন।''[১৫]

নকশি কাঁথা সেলাই যে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তা আশরাফ সিদ্দিকীর প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি। পুরানো ধুতি বা সাদা জমিনের শাড়ির উপর কাঠকয়লা বা কাঠপেন্সিল দিয়ে স্কেচ বা আউটলাইন এঁকে তাতে নানা রঙের সুতো সূঁচের ফোঁড় দিয়ে যদি দৈনিক পাঁচ ছয় ঘন্টা সেলাই করা হয় তাহলেও ছয় মাস সময় লাগতে পারে। বাংলার জনৈকা অধ্যাপিকাকে আমি এরকম এক নকশি কাঁথা সেলাই করতে দেখেছি। তিনি অবশ্য সাদা জমিনের কাপড়ের উপর

হাল্কা রঙের সুতো দিয়ে সেলাই করেছেন নকশি কাঁথা। পুরানো ঐতিহ্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে একজন অধ্যাপিকা কতটুকু যে আন্তরিক তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তার নকশি কাঁথায় নানা ফুল-লতা-পাতা এঁকেছেন সূঁচ দিয়ে। অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি অনুরাগ না থাকলে নকশি কাঁথা সেলাই করা সম্ভব নয়, একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ থেকে সেকালের মহিলাদের এসব গুণাবলী সহজেই অনুমান করা যায়। শিল্পের প্রতি তাদের রসবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

'কাঁথা স্টিচ' শাড়ির আদর-কদরই আলাদা। যেন শাড়ির মাহাত্ম্যই বাড়িয়ে দেয়। এই নামে শাড়ির যে নকশি কাঁথার শিল্পাদর্শের প্রভাব তা বুঝে নিতে বিলম্ব হয় না। নকশি কাঁথার নানান নকশার নানান নাম। যেমন— কাঁথার জমিনের কাজের ভেতর চইলতা ফুল, শঙ্খলতা, বাঁশপাতা, তেজবি ফোঁড়, বিছা ফোঁড়, সাপবেড়, তিনকোণা, পানলতা, মাছ, লক্ষ্মীরপাড়া, ধানছড়া, ভরাট ফোঁড়, ক্রস সেলাই, বোতাম ফোঁড় ইত্যাদি। আবার কাঁথার পাড়ের হরেক রকম নাম। যেমন তাস পাইড়, ঝুমকালতা পাইড়, নয়নলতা, লক্ষ্মীর পাড়া, লতাবেড়, নৌকাবিলাস, নারিকেল পাতা পাইড় ইত্যাদি। বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, লালমনিরহাট, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুষ্টিয়া, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, নরসিংদী প্রভৃতি অঞ্চল নকশি কাঁথার জন্য বিখ্যাত। মহিলাদের সূচিকর্মে বৈচিত্র্যময় বুনন ও নকশারীতিতে গড়ে তুলেছেন গ্রাম জীবনের অবিস্মরণীয় নকশি কাঁথা আখ্যান। কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাব্যে আমরা নকশি কাঁথা সেলাইয়ের বর্ণনা পাই। চন্দ্রাবতী সীতার নকশি কাঁথা সেলাই করার বর্ণনা দিয়েছেন তার রামায়ণ কাব্যে—

'সীতার গুণের কথা কহিব আর
কাঁথায় আঁকিল কন্যা চান সুরুজ পাহাড়
আরও যে আকিল কন্যা হাঁসা আর হাঁসি
চাইরো পাড়ে আঁকে কন্যা পুষ্প রাশি রাশি'

আশা ও আনন্দের কথা, মেধাস্বত্ব তালিকায় নকশি কাঁথা তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধকরণ আইনের' সেকশন টু (এক) ধারার মাধ্যমে ২০০৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ভারতের ভৌগোলিক পণ্য নিবন্ধের জন্য নকশি কাঁথাকে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলি নকশি কাঁথাকে নিজেদের পণ্য হিসেবে আইনগত নিবন্ধের জন্য জোর চেষ্টা চালায়। এভাবে নকশি কাঁথা, জামদানি শাড়ি ও ফজলি আমের উপর রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার উন্নাদা কোথাপল্লী মণ্ডলের বেশ কিছু গ্রামের তাঁতি সমাজ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে 'উল্লাদা জামদানি' নামে জামদানি শাড়িকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধিত করেছে। প্রতিবছর ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাস্বত্ব সম্পদ দিবস বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পালিত হয়। একজনের আবিষ্কার বা সৃষ্টিশীল মেধাসম্পন্ন কাজকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সৃজনশীলতাকে বজায় রাখতে আলোচনা, প্রচার ও ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার জন্যই দিনটি উদযাপনের অন্যতম কারণ। এব্যাপারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইন-কানুনও তৈরি হয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে কোনও আইন সমঝোতা স্মারক সম্মেলন বা চুক্তিতে একের মেধাজাত সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার না করা মেধাস্বত্বের লক্ষণ। ট্রিপস চুক্তির ২৭.৩ (খ) ধারায় দুনিয়ার সব প্রাণ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার উপর প্যাটেন্ট করার বৈধ অধিকার রাখা হয়েছে, আবার ২২ ও ২৩ ধারায় ভৌগোলিকভাবে নির্দেশিত পণ্যের জন্য কিছু আইনগত স্বীকৃতির কথাও বলা হয়েছে। ট্রিপস চুক্তির ধারাকে মেনে ভারত নিজস্ব এই জেনেরিস আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যকে নিজস্ব ভৌগোলিক নির্দেশনা হিসেবে নিবন্ধিত করেছে। নকশি কাঁথাকে মেধাস্বত্বের তালিকায় এইসূত্রে তালিকাভুক্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গ।

মেধাস্বত্ব বা প্যাটেন্ট আইনের দৌলতে নকশি কাঁথার মালিকানা আমাদের বহাল থাকলেও প্রচলন-ব্যবহার

ও আমাদের আধুনিকতা মনস্ক মানসিকতার অবহেলায় যদি তার অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে তবে এ দায় তো আমাদেরই। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু বাঙালি নৃতত্ত্বের গৌরবজনক ও ঐতিহ্যসম্পন্ন নকশি কাঁথা অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে।

উল্লেখপঞ্জি :

১. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ. ২৪০।

২. ড. অতুল সুর, বাঙালি জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ, ১৯৯২, কলকাতা-৯, পৃ. ৮৩।

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, পৃ. ৬০-৬১।

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

৫. সনৎকুমার মিত্র, 'ঢেঁকি: বাহন নারদের' (প্রবন্ধ), লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কার্তিক-পৌষ ১৪০৬, কলকাতা, পৃ. ৫০৯-৫১০।

৬. অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাক উপত্যকার বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহের চালচিত্র, লালা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬-১৭।

৭. অমলেন্দু ভট্টাচার্য, বরাক উপত্যকার বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিয়ের গীত (প্রবন্ধ), স্মরণিকা, সমকাল, বার্ষিক উৎসব ১৯৯০, শিলচর, পৃ. ২৪-২৫।

৮. আশরাফ সিদ্দিকী, নকশি কাঁথা (প্রবন্ধ), জাতিঙ্গা, আশ্বিন ১৪০২, হাফলং-শিলচর, পৃ. ৩।

৯. আশরাফ সিদ্দিকী, নকশি কাঁথা (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

১০. আশরাফ সিদ্দিকী, নকশি কাঁথা (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

১১. আশরাফ সিদ্দিকী, নকশি কাঁথা (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

১২. আশরাফ সিদ্দিকী, নকশি কাঁথা (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪।

১৩. শিবতপন বসু, নকশি কাঁথা: সুপ্রাচীন এক লোকশিল্প (প্রবন্ধ), লোকচিত্র, নভেম্বর ২০০৬, হাফলং, পৃ. ৪২।

১৪. শিবতপন বসু, নকশি কাঁথা: সুপ্রাচীন এক লোকশিল্প (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

১৫. শিবতপন বসু, নকশি কাঁথা: সুপ্রাচীন এক লোকশিল্প (প্রবন্ধ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

নিবন্ধটির রচনাকাল ২০১০ সালের জুলাই মাস। নিবন্ধটি লিখতে গিয়ে এমন কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হই যে এসবের সমাধান চেয়ে লিখিত আকারে প্রশ্নগুলো ডাকযোগে প্রেরণ করি তুষারকান্তি নাথের কাছে। তিনিও সেসব প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে আমার কাছে পাঠান। নিবন্ধে তাঁর বক্তব্যগুলো ব্যবহার করার প্রসঙ্গটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

বিবাহের লোকাচার ও লোকগান : শিল্পীর নকশিকাঁথায় নিপুণ গাথা

অনামিকা চক্রবর্তী

'বাসি ফুল, মৃতশোক, স্খলিত কণ্ঠের গীতগান,
কে তুমি কুড়িয়ে নিয়ে হৃদয়ে করেছ পরিধান।'

(প্রেম, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী)

আমাদের জীবন থেকে নীরবে খসে যেতে থাকে সময়, ডুবে যায় সময়েরই পশ্চিম আকাশে, প্রাত্যহিকতার অভ্যাসবশ জীবনে লোকসংস্কৃতি জিয়নকাঠির মতো পরাগ-ভাঙা মেঘে ভোরের স্নিগ্ধ আলোর আভা নিয়ে আসে। সে অর্থে প্রত্যেক লোকসংস্কৃতিবিদ একনিষ্ঠ খননকর্মীর মতো কাজ করে যান অন্তরের আন্তরিকতা দিয়ে। তাঁদের থাকে গ্রাম্যজীবন ও লোকসমাজকে চেনার এক নিবিড় চোখ। সময়ের অতন্দ্র প্রহরীর মতো সেই সেনানীদেরই সম্মান জানিয়েছিলেন কবিগুরু গ্রাম্য প্রবাদ, লোককথা, রূপকথা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করার মধ্য দিয়ে।

লোকসংস্কৃতির গভীরে মিশে থাকে একটি জাতির সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড ও সামাজিক গঠনশৈলী। ক্রমবিবর্তন ও ক্রমউন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে জীবন পল্লবিত হয়ে ওঠে কালের নিয়মে— সেই রূপান্তরের ব্যাকরণ অনেকটাই অনুধাবন করা যায় লোকসংস্কৃতির অধ্যয়নে। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ অ্যালেন ডাণ্ডেস জাতির সমাজতত্ত্ব জানার জন্য লোকসংস্কৃতিকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যক্ত করেছেন, 'Folklore is clearly one of the most important, perhaps the most important sources for the articulation and perpetuation of a group's symbols.'[১] যে কোন জাতির উন্নতির সঙ্গে স্থানিক পরিবেশের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তাই উপত্যকার ভৌগোলিক পরিবেশে বিকশিত হয়ে ওঠেছে বরাকের লোকজীবন ও সংস্কৃতি। চারদিকে পাহাড়ঘেরা, বরাক-কুশিয়ারা আর কাটাখাল নদীর তীরে বসবাসকারী অজস্র মানুষ জাতি আর ভাষার ত্রিস্রোতী ধারার এক পবিত্র মিলনভূমি আমাদের বরাক উপত্যকা। বৃহত্তর সুরমা-বরাক উপত্যকায় বারবার আছড়ে পড়েছে রাজনৈতিক আঘাত, ফলে ভৌগোলিক সীমা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত হলেও স্থানিক বিভাজন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করতে পারেনি জনমানসকে এই অনুভূতি আরো গভীর হয়ে ওঠে লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণে।

বরাক উপত্যকার বিবাহ সংক্রান্ত আচারের আছে দুটি দিক,

এক. বৈদিক ক্রিয়া এবং বিধি অনুযায়ী পূজা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেবদেবী, পিতৃপুরুষদের স্মরণ ও তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা। জীবনের নবতর ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন যে মানব ও মানবী তাদের দাম্পত্যজীবন যেন মধুর আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে এই উদ্দেশ্য নিয়েই পূজা, হোম-যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা।

দুই. বিয়ের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে স্ত্রীআচার ও লোকগান। বিয়ের অনুষ্ঠান পারিবারিক হলেও এর সামাজিক বিস্তৃতি অনেক। আজকের নাগরিক জীবনশৈলীর বৃত্ত থেকে সরে গিয়ে পল্লীসংস্কৃতির আলোকে দেখলে আমরা লক্ষ্য করি, বিয়ের গীত কেবল বিয়ের অনুষ্ঠানেই গান করা হয়।

এই স্ত্রীআচারের রয়েছে একের পর এক পর্যায়, নাটকের পট বিবর্তনের মতো — এ যেন এক নিপুণ গীতিনাট্য। বিয়েবাড়িতে সানাই-এর করুণ খাম্বাজ রাগিণীর সঙ্গে মিশে যায় গীতের সুর। আনন্দ ও ব্যস্ততায় পূর্ণ হয়ে থাকে বিয়ের দিনগুলো, সবাই সেখানে মুক্তমনে মিশে যান। এই লোকগানগুলি বিশ্লেষণ করলে কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

ক. এর বিষয়গত মৌলিকতা।

খ. বক্তব্যের উপস্থাপনা।

গ. রীতিগত বৈচিত্র্য।

ঘ. গীতের সঙ্গে বাদ্যসহ নৃত্য, যা এই অঞ্চলে 'ধামাইল' নামে পরিচিত।

বরাক উপত্যকার বিবাহের লোকাচার ও লোকগান :

'এ যেন ভাঙে নারে এমনি থাকে যুগল'— এই কামনা দিয়ে বিবাহের লোকগানের শুরু, সমাপ্তিও এই কামনার মাধ্যমেই। বিয়ে হল দুটি জীবনের আমরণ মিলন, বন্ধুরপথে আসবেই ঝড়ো হাওয়া, তবু বাইতে হবে তরী, তাই মঙ্গলকামনা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা এই গীতগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিবাহের পাত্র-পাত্রী স্থির হয়ে গেলে প্রথম মঙ্গল অনুষ্ঠান করা হয় কন্যার বাড়িতে, 'মঙ্গলাচরণ'। এর অপর নাম 'তেলসিন্দুর' 'দিনসুস্থির'- যেখানে উভয়পক্ষের অভিভাবকরা মিলে বিয়ের শুভদিন স্থির করেন। কন্যার শৃঙ্গারদ্রব্য, আভরণ, বস্ত্রাদি সঙ্গে দই, মিষ্টি, বড় মাছ, পান-সুপারি নিয়ে বরের বাড়ি থেকে আত্মীয়স্বজনেরা কন্যাকে আশীর্বাদ করতে আসেন। পুরোহিত পঞ্জিকাতে বিয়ের দিনটিতে পাঁচটি সিন্দুরের ফোঁটা দেন। প্রথমে কন্যার কপালে সিন্দুর দিয়ে, শাঁখা ছুঁইয়ে দেন, ধান-দূর্বা-খৈ দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কপালে দই-এর ফোঁটা দেবার পর সব অভিভাবকরা কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। 'পাত্রপক্ষ' ও 'কন্যাপক্ষ' মিলে হাসি-মস্করাতে যেমন মিলন মধুর দিনের আগমনী শঙ্খ বেজে ওঠে, ঠিক তেমনি মায়ের মনে বাজতে থাকে বিদায়ের সুর। মায়ের কোলের উষ্ণতায় যার শৈশব কেটেছে আজ সে পরের বাড়ির গৃহবধূ হতে চলেছে। কন্যার ভাল-মন্দ আচার-আচরণ আগামীদিনের ভবিষ্যৎ সব যুক্ত হয়ে যায় পাত্রপক্ষের সঙ্গে। আনন্দের সঙ্গে আশঙ্কাময় বিষাদে তিরতির করে কাপতে থাকে মায়ের মন। মঙ্গলাচরণের বিশেষ কিছু রীতি আছে,

ক. কন্যাগৃহের দ্বারে দুপাশে দুটি কলাগাছ জলপূর্ণ ঘট ও পাঁচটা আমপাতার উপর নারকেল বা ডাব রাখা হয়। লোকসংস্কৃতিতে কলাগাছ, নারকেল, আমপাতা শুভফলদায়ক হিসেবে বিচার করা হয়। তাছাড়া বংশবৃদ্ধির প্রতীকী ব্যঞ্জনাও এর মধ্যে নিহিত আছে।

খ. নারীরা আল্পনা আঁকেন, তাতে থাকে শঙ্খ, পদ্ম, মাছ, ধানছড়ার প্রতীকী ছবির কারুকাজ। এ এক নিপুণ শিল্পসৃষ্টি। পরে সেই আল্পনার উপর মঙ্গলঘট বসানো হয়।

গ. আশীর্বাদের সময় কন্যাকে বসানো হয় শীতলপাটির উপর। শীতলপাটি আমাদের দেশজ হস্তশিল্প। পাত্রপক্ষও ডালার মধ্যে ক্ষীর বা নারকেলের সন্দেশ বানিয়ে রঙিন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসেন। পানের ঝাঁপিতে পান-সাজা, সন্দেশ বাঁধা এগুলির মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শিল্পপটীয়সী নারীর কর্মকুশলতা। মিষ্টিমুখের জন্য বরের বাড়িতে পাঠানো হয় মিষ্টি ও পান।

লোকাচারের দ্বিতীয় অঙ্গ হল গীত, মঙ্গলাচরণের দিন থেকে গীত গাওয়া শুরু হয়, একে বলা হয় 'জুড়নীর গীত'। গীত করেন নারীরা, এগুলি সম্পূর্ণ' শ্রুতিগীত', এর লিখিত রূপ প্রায় নেই বললেই চলে। গীত শুরু করার

পূর্বে কন্যার মা ও এয়োতিরা পাঁচজন মিলে উলুধ্বনি দিয়ে, আস্তপান-সুপারী দিয়ে গীতিকারদের আমন্ত্রণ জানান।

গীতের শুরুতে গণেশ বন্দনা, সরস্বতী মায়ের বন্দনা, নাথ নিরঞ্জন ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করা হয়। বিষ্ণু জগৎপতি ও লক্ষ্মী মাতার বন্দনার পর হয় 'ঝাঁপি সাজানোর' গীত। প্রাচীন পল্লীজীবনচর্যা হল এই গীতগুলির উৎসস্থল, তাই ঝাঁপি সাজানোর গীতই হয় প্রথম। বর্তমান সময়ে ভাবী বধূর বস্ত্রাদি, আভরণ সুটকেসে করে পাঠানো হয়, যে সময় গীতগুলির উৎস তখন মুখঢাকা ঝাঁপিই ছিল সম্বল। ঝাঁপির কারুকাজে মনমোহিত করে তুলতেন প্রসিদ্ধ হস্তশিল্পীরা। 'ঝাঁপি সাজানোর' গীত এরকম,

'কি আনন্দ অইল আজি চম্পক নগরে।
সুনুকায়ে ঝাঁপি সাজায় মনের অভিলাসে।।'

বরাক উপত্যকার সবচেয়ে জনপ্রিয় যে পারিবারিক পূজা, তা হল মনসাপূজা। তাই বণিকরাজা চাঁদসদাগরের রাণী সনকা, তার ছয়পুত্রকে হারিয়ে সপ্তম পুত্র লক্ষ্মীন্দরের ভাবী বধূ কেহুলার জন্য মঙ্গলাচরণের ঝাঁপি সাজাচ্ছে এই ঘটনাই গীতের বিষয়বস্তু। 'মনসামঙ্গল' বরাক উপত্যকার প্রতিটি নর-নারীর জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই গীতের উপস্থাপনা এমনি যে শ্রোতার মনে ভেসে ওঠে এমন এক প্রতিচ্ছবি, যেখানে মায়ের মনের স্নিগ্ধ আকুলতা বৃষ্টিভেজা বাতাসের মতো আজো আমাদের প্রাণকে দোলা দিয়ে যায়।

'বাক্যদান পর্বের' গীত এরকম,

'রাজা বাইক্য কর দান, সীতার যগ্য বর আজি আইছইন রাম।'

এই কথা শুনে চমকে ওঠেন রানি, রাজাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন বরের যোগ্যতা,

'রাণী বলে শুন রাজা বচন আমার।
সুপাত্র পাইলে বর বাইক্য কর দান।।'

এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে মায়ের চিন্তা, ভাবী জামাই যেন 'সুপাত্র' হয়। এখানে যে সুপাত্রের কথা বলেছেন মা, এর প্রতিধ্বনি আমরা আর একটি গীতে পাই, কেননা একটি নারীজীবনের কষ্ট অনুভব করেন আর একটি নারীই। পল্লীজীবনে 'পৌষসংক্রান্তি' উৎসবে চাল চাইতে আসা গ্রাম্য-বালকদের গীতে আছে — চাল যে গৃহিণী দেবে যেরকম, তার ফলও তেমনি পাবে,

'যে দেবে কাঠা কাঠা।
তার হবে সাত বেটা।।
যে দেবে বাটী বাটী।
তার হবে সাত বেটী।।'

—এতে মায়ের মনে কন্যা সন্তানের জন্ম নিয়ে আশঙ্কা দেখা দেয়, কেননা, 'বেয়ান মাগীর মন তো কিছুতেই পাওয়া যায় না, তাছাড়া জামাইগুলির কেহ মদ খায়, কেহ গাঁজা, কেহ বা গুলিতে ভোর হইয়া সমস্ত জীবনটা ভাজা ভাজা করিয়া মারে। হাত ঠুটো হইলে এত যন্ত্রণা সইতে হয় না।'[২]

যে কোনো লোকগীত গড়ে ওঠে সামাজিক বাস্তবতার দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়, কেবল আনন্দ প্রকাশের জন্য নয়। লোকসমাজ কোনোদিনই অর্থহীন অসম্পূর্ণ কোনো গান বা লোককথা সৃষ্টি করে না। বিয়ের গীতও এই নিবিড় প্রক্রিয়ার ফসল, তাই এগুলিতে রাম-সীতা, শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী, লক্ষীন্দর-বেহুলা এদের বিয়েকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে, যেগুলি সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিবাহ।

বিয়ের পর্যায়ে এর পরের অনুষ্ঠান 'পানখিলি', কন্যা বা বরের মা আরো পাঁচ বা সাত বা নয় জন এয়োতিকে নিয়ে গীত ও বাদ্য বাজিয়ে দেবমন্দিরে যান পানের খিলি নিয়ে। এর রীতি হচ্ছে এরকম,

ক. পানের খিলি বানাতে হয় পাঁচটা, তাতে দিতে হয় সিঁদুরের ফোঁটা, সঙ্গে থাকবে মিষ্টি।

খ. লোকসংস্কৃতিতে পাঁচ, সাত, নয় সংখ্যাকে শুভ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন পঞ্চনদ, সাতসমুদ্র, নবগ্রহ। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে স্থানিক ঐশ্বর্য এমনি করে মিশে যায়।

গ. একটা থালা বা রেকাবিতে করে পান, মিষ্টি নিয়ে নতুন গামছা দিয়ে ঢাকা দিয়ে মা মাথায় করে নিয়ে যাবেন নির্মাল্য।

ঘ. এ আচারের মূলকথা হল দেবতাকে নিমন্ত্রণ জানানো ও শুভকাজের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা। দেবর্ষি নারদকে প্রার্থনা জানানো হয় বিয়ের পান-সুপারি স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য।

আমাদের সমাজে একটি দেশজ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বিয়ের পান মিষ্টি হয় না কেন না, দেবর্ষি নারদ ঢেকি করে স্বর্গে যাবার পথে নিমন্ত্রণের পান রেখে দেন হাতের বগলে, বগলের ঘাম লেগে পানের মিষ্টিস্বাদ চলে গিয়ে নোন্‌তা হয়ে যায়। এ বিশ্বাস শুধু বরাক উপত্যকায় নয়, বরপেটা, রঙিয়া, নলবাড়ি, পাঠশালা এসব স্থানেও প্রচলিত আছে।

বিয়ের উৎসবে যে গীত গাওয়া হয় এর বিষয়বস্তু হল পৌরাণিক কাহিনি। সহজ বাচনভঙ্গিতে এগুলি গাওয়া হয় গীতের সুরে, এগুলি লোকশিক্ষার এক বিশেষ মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা যায়। কাহিনির মধ্যে থাকে পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের বনবাস যাত্রা, রাবণের সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতার বনবাস, লবকুশের জন্ম, অশ্বমেধ যজ্ঞে সোনার সীতার নির্মাণ, পঞ্চপাণ্ডবের পাশা খেলায় হার, অজ্ঞাতবাস, রাজ্যোদ্ধার, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি কাহিনি ছাড়াও থাকে রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমকাহিনি, বেহুলার পতিপ্রাণ ফিরিয়ে আনার কঠিন সংগ্রামের কথা গীতে ফিরে ফিরে আসে।

রূপসী পূজা, কালীপূজা করা হয় বৈদিক প্রথায়, তারপর কন্যার 'আদ্যস্নান' অনুষ্ঠান, 'আদৃসিনান' হিসেবে প্রচলিত। এই অনুষ্ঠানে মা ও এয়োতিরা মিলে পাঁচটি ঘট ভর্তি করে আনেন জল, এই জল দিয়ে কন্যাকে বা বরকে স্নান করানো হয়। জল ভর্তি করার আগে কিছু আচার পালন করতে হয়, সেগুলি এরকম —

ক. প্রথমে নদীর জলে তেল, সিঁদূর, ধানদূর্বা দিয়ে মা গঙ্গাকে প্রণাম জানান এয়োতিরা।

খ. ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করেন কন্যা বা বরের মা, তারপর জল ভর্তি করা হয়।

গ. বর বা কন্যাকে প্রথমে তেল-হলুদ, দুধের সর মাখানো হয় গালে, হাতে, পায়ে। মা লোহার কাটারি দিয়ে মুখের চারপাশে ঘোরান, একে বলা হয় 'শ্রী' তোলা, পরে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

ঘ. যে কাটারি দিয়ে মা আশীর্বাদ করেন, সেই কাটারি মাথার উপর সাতবার ঘুরিয়ে পেছনের দিকে ছুঁড়ে ফেলেন, তখন বর বা কন্যাকে স্নান করানো হয়।

'শ্রী'-তোলা অনুষ্ঠানে যে লোহার কাটারির ব্যবহার করা হয় একে বলা হয় 'নজরকাটান' অর্থাৎ কুদৃষ্টি সরিয়ে শুভদৃষ্টির সূচনা করা হয়। জল ভরতে যাবার সময় গীত করা হয়, 'সকি চল যাইগ জলে, আদৃস্নানের জল আজি ভরিমু সকলে', মা-গঙ্গাকে প্রার্থনা জানানো হয় এই গীতে—

'গঙ্গা দেওগ দরশন, সীতাধনের আদৃস্নানের ভরিয়া নিতাম জল।' কন্যা স্নানের সময় গীত হয়, 'আজি হিমালয় পুরী, আদৃস্নানে বসিলেন গিরিবালা গৌরী...।'

তারপর হয় কন্যাকে সাজানোর অনুষ্ঠান— হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা পরিয়ে সমস্ত অলংকার দিয়ে কন্যাকে সাজানো হয়। প্রায় সমস্ত রাত ধরে চলে অধিবাসের অনুষ্ঠান। গীতের সঙ্গে সঙ্গে চলে ধামাইল, যা বরাক উপত্যকার এক বিশেষ আনন্দনৃত্য বা লোকনৃত্য। উঠোনের মাঝখানে এয়োতিরা, মেয়েরা গোল হয়ে এই নৃত্য পরিবেশন করেন, সঙ্গে গানের গীত ও দোহার দেন সবাই মিলে। পায়ের তালে তালে এক পা আগে, এক পা পিছে ফেলেন, সঙ্গে হাতে তালি দিয়ে যখন অনেক এয়োতিরা সুন্দর পোশাক পরে নাচেন তখন ভীষণ ভালো লাগে দেখতে। নৃত্যের ঝংকার, নূপুরের রিনিঝিনি, হাতের কঙ্কনের সঙ্গে গীতের বাহার আর ঢোলের সঙ্গত চমৎকার আনুষ্ঠানিক সৌষ্ঠব নিয়ে আসে।

বিয়ের দিনের প্রথম অনুষ্ঠান নান্দীমুখ- এ অনুষ্ঠানে চালের গুড়ো ব্যবহার করা হয়। এই চাল মায়েরা নিজে গুড়ো করেন, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত চালের গুড়ো বাজার থেকে কিনলে হবে না। এই চাল গুড়ো করার রীতি এরকম,

ক. প্রথম কন্যা বা বরের মা ও এয়োতিরা মিলে শুদ্ধবস্ত্র পরে ধান থেকে চাল বের করে রেকাবিতে রাখেন।
খ. ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে তেল, সিদুর, ধান-দূর্বা ও খৈ দিয়ে, ঘাইল-ছিয়ার সামনে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করেন।
গ. সেই চালগুলি ঘাইলে পাঁচজন এয়োতি (মা, জেঠিমা, কাকিমা, মামিমা, মাসিমারা) মিলে পাঁচটি ছিয়া দিয়ে গুড়ো করেন। পাঁচ ছিয়া একসঙ্গে পড়বে না, ঠিক তালে তালে পড়তে হবে। ছিয়ায় ছিয়ায় ঠকাঠকি হলে বর ও কন্যার দাম্পত্যজীবনে কলহ হবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। বোঝা যায় এ কাজে তীব্র মনসংযোগের প্রয়োজন রয়েছে।

কন্যার বাড়ির অধিবাসের রাত আর বরের বাড়ির অধিবাসের রাতে ভাবের দিক থেকে পার্থক্য থাকে। বরের বাড়িতে চলে আগামী দিনের আনন্দ, হাসি-হট্টগোল। বরের মা-এয়োতিরা মিলে একে অপরের সঙ্গে ব্যঙ্গ, রঙ্গ তামাশা করেন। কন্যার বাড়িতে আনন্দের সঙ্গে কিছুটা হলেও আসন্ন বিদায়ের সুর এক হয়ে মিশে যায়। কন্যার মা অশ্রু বুকে চেপে রেখে সন্তানের ভবিষ্যতের মঙ্গলকামনা করেন। যে শীতলপাটির উপর বসিয়ে কন্যাকে সাজানো সেখানে কন্যার মা ও মেয়ে একসঙ্গে রাত কাটান। বিদায়ী কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা ও কন্যা পরস্পর কাঁদতে থাকেন। মায়ের মনের নিরুদ্ধ আকুলতা এমনভাবে নাড়া দিতে থাকে অধিবাসের গীতে যেন মনে হয় গীতগুলি চিরন্তন বাঙালি মনকে ছুঁয়ে যায়। অধিবাসের ফোঁটা দেবার সময় গীত হয়, ‘কান্দি কান্দি সীতার মায় লয়ে সকি সমুদায়। মার কপালে ফুটা দিলা স্মরি বিধির শ্রীচরণ।’

বরের বাড়িতে আল্পনা দেবার সময় গীত করা হয় —

‘জামাইর মায়ে লেট্টাৎ খাইলা আলিপনার মাঝে গ
দেইখতে ছুরৎ লাগে।
জামাইর বাপে ডাকি ঝিকাইন তান কমরখান নি আছে গ,
দেইখতে ছুরৎ লাগে।।’

বিয়ের ‘নান্দীমুখ’-এর পর ‘বসুধারা’, ‘কামানি’, ‘স্নান’, ‘সোহাগ মাগা’, ‘হতরকীর তলে নেওয়া’, ‘দধিমঙ্গল’, ‘বিবাহ সম্প্রদান’- ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। প্রতিটি আচারের বিধি ও গীত প্রচলিত আছে। নান্দীমুখের গীতে রামের নান্দীমুখ করার কথা আছে, পূর্বদিকে মুখ করে কুশাসন পেতে জলদান, অন্নদান, পিণ্ডিদান ঠিক বিধিমতো করার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন—

‘নান্দীমুখ করইন রাম অরষিত মন,
নান্দীমুখ করইন রাম বিষ্ণু অবতার।
ইষ্টপদে দণ্ডবত্ করইন বারে বারে।।
জলদান, অন্নদান করইন বিধিমতে।
অন্নদান পিণ্ডিদান করইন রঘুনাথে।।’

‘বসুধারা’ হল বসুমাতাকে প্রণাম করেন কন্যা বা বর, ‘কামানি’তে নাপিত কন্যার নখ কামিয়ে পায়ে আলতা পরিয়ে দেয়। প্রথমে নাপিত পানপাতার উপর আলতা দিয়ে সতীন আঁকে, কন্যা সেই সতীনের ছবি পা দিয়ে মুছে দেন অর্থাৎ বহুবিবাহ প্রথার রিরোধিতা স্ত্রী আচারের মধ্যে অনেক আগে থেকেই ছিল। সতীন নিয়ে সংসারের দুঃখ ও যন্ত্রণা কোনো নারীই চায় না, তাই মায়েরা এই প্রথার প্রচলন করেছেন। কামানির পর কন্যাকে স্নান করিয়ে ঘরে তোলা হয়, এরপর কন্যা বা বরের মা মাথায় ডালা নিয়ে প্রতিবেশীর ঘরে সোহাগ মাগতে যান। মুখে মিষ্টি নিয়ে যাবেন, কোনো কথা বলা যাবে না— প্রতিবেশীরা কন্যার মাকে বসিয়ে ধান-দূর্বা-খৈ দিয়ে আশীর্বাদ করেন, মিষ্টি-পান দেন— পরে এই মিষ্টি মেয়েকে খাওয়ানো হয়। অনেকে কন্যার মার শাড়ির আঁচলের সঙ্গে কলাপাতা বেঁধে দেন রসিকতা করে।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে বিয়ের রাত, বরের বাড়িতে চলে বরযাত্রীর তৈরি হওয়া আর কন্যার বাড়িতে চলে আসন্ন বিয়ের আয়োজন। কন্যার বাড়িতে 'কুঞ্জ সাজানো' এক বিশেষ শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। সাতটা কলাগাছ (আঠিকলার গাছ হলে ভালো হয়) দিয়ে কুঞ্জ বানিয়ে রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। কুঞ্জের ভিতরে চালের গুড়ি, আবির দিয়ে আল্পনা আঁকা হয় নিখুঁতভাবে। আজকাল কলাগাছের অভাবে বাঁশ-কাঠ দিয়ে কুঞ্জ বানানো হয়। বিয়ের কুঞ্জ হয় খোলা উঠোনে, বিয়ের সময় কুঞ্জের উপর থেকে সামিয়ানা একটু হলেও সরিয়ে দিতে হয়, কেননা চন্দ্র-সূর্য লক্ষতারা সাক্ষী করে, দেবদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে বর-বধূর বিয়ে হবে এই বিশ্বাস প্রচলিত, মাথার উপর থাকবে খোলা আকাশ। আজকের 'বিবাহভবনের' ব্যবস্থাপনায় এসব প্রায় লুপ্ত হয়ে আসছে।

বর-বরযাত্রীদের নিয়ে বিয়ে করতে এলে ফুল, খৈ গোলাপজল, শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সঙ্গে বাদ্য বাজতে থাকে। কন্যাগৃহে বর পর শ্যালিকারা, বৌদিরা বরকে নিয়ে রঙ্গ-কৌতুক করেন, এর পর্যায়গুলি হল—

ক. গেটধরা। এটি বেশ মজার, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে মধুর ঝগড়ার সূচনা হয় এখানে। গেটধরা আসলে দরকষাকষি, পরে পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে 'গেটপাস' হয়।

খ. বরকে একটু সাবধানে চলতে হয়, প্রতিপদে থাকে বিপদের সম্ভাবনা। শালি-বউদিরা বরকে কখন, কিভাবে যে উপহাসের পাত্র বানাবে এর কোনো ঠিক থাকে না।

তারপর দধিমঙ্গল, কুঞ্জে সাতপাকের মধ্য দিয়ে মাল্যদান, কুঞ্জের মধ্যেই যজ্ঞ-হোমের ব্যবস্থা করা হয়, অগ্নিসাক্ষী করে কন্যাদান করেন পিতা বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। কন্যার বাড়ির পুরোহিত ও বরের বাড়ির পুরোহিত দুজনে মিলে এই বৈদিক কার্য সম্পন্ন করেন। বিবাহের যে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়, সেখানে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারবদ্ধতার কথাই থাকে যেমন—

'অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবা পৃথিবী উভেইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্ত দুপ্তরাদধরাদভয়ং নো অস্ত্র।।'

(অর্থববেদ, সূত্র ১৫)

প্রাণ ও আত্মার পরিপূর্ণ মিলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় মানব-মানবী, 'যদত্ত্বং হৃদয়ং তব, তদস্তং হৃদয়ং মম।'

বিয়ের সময় অধিক ব্যবহৃত হয় যে জিনিসপত্র তা গ্রামীণ হস্তশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন, যেমন—

ক. শীতলপাটি, নিখুঁত ও আরামদায়ক লৌকিক শিল্প।

খ. মাটির ঘট, প্রদীপ, ডালা-কুলা, ঝাঁপি, পিঁড়ি- সবগুলিকে শৈল্পিক কারুকাজে সাজিয়ে তোলা হয়।

গ. বিয়ের সাজি, কড়ি বা পাশা খেলার কড়ি রাখার বটুয়া, একে 'সরা পাতিল' বলা হয়-এগুলি তো চিরদিনের জন্য সৌন্দর্যসম্পদ হয়ে থাকে।

একটি বিয়ের আসরে এভাবে জড়িয়ে যায় গ্রামীণ শিল্প সংস্কৃতি, যেমন সামাজিকভাবে, তেমনি মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে এর শিকড় আনুষ্ঠানিকতার অনেক গভীরে যুক্ত হয়ে যায়।

একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায় : বরাক উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিয়াগীতের মিলন সুর

যে কোনো একটি ভৌগোলিক পরিসীমার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষাভাষী আর বিভিন্ন ধর্মীয় আদর্শের অনুগামী লোকজাতির সুসংমিশ্রণ আর সুসমন্বয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়া হল লোকাচার ও লোকগান। পৃথিবীর প্রায় সবখানেই বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান বিচিত্র ও চমকপ্রদ, ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশের বিয়ের যে বৈদিক রীতি-নীতি তা প্রায় এক, বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় লোকাচার ও লোকগান। এই লোকাচার স্থান-কালের ওপর অনেকটা নির্ভর করে, স্থানের পারিপার্শ্বিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ লোকাচারকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মূলত অসমিয়া, বাঙালি, বোড়ো ও অপরাপর জাতিরা সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করেন। দুটি উপত্যকার বিবাহরীতির যে বৈদিক নীতি তা প্রায় একই। লোকাচারের মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। 'দরা কইনা' ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমিয়া সমাজে বিয়ের পাত্র-পাত্রী। বিয়ে স্থির হলে শুভদিন দেখে কন্যার বাড়িতে 'খাটার ভার' বা 'ফোঁটপ্রদান' করা হয়। সেদিন পাত্রের থেকে অভিভাবকরা তাম্বুল-পান, মাছ, দই-দুধ, কলা-মিষ্টি নিয়ে আসেন অনেকটা বাঙালি সমাজের 'মঙ্গলাচরণে'র মতো। পুরোহিত দুটা কাগজে পাত্র-পাত্রীর পিতা-মাতা ও পাত্র-পাত্রীর নাম লিপিবদ্ধ করে বিয়ের তারিখ স্থির করেন, এটি হল 'খাটাং' বা পত্রকরণ, আসলে এটি বাক্দান প্রথা। একবার 'খাটাং' হয়ে গেলে এই বাক্দত্তা কন্যাকে অন্য কেউ বিয়ে করতে পারে না। এরপর বরের জন্য পাত্রীপক্ষ থেকে পাঠানো হয় 'তেল গামোছা' আর পাত্রীর জন্য পাত্রদের ওখান থেকে আসে 'তেলপাটনী'। বাঙালি সমাজে যেমন তত্ত্ব পাঠানোর নিয়ম আছে, এখানেও তেমনি এই রীতি প্রচলিত।

বিয়ের দুদিন আগে বা সুবিধামতো ভাবী বধূর জন্য নতুন তসরের মেখলা-চাদর, গয়না-অলংকার, শৃঙ্গারদ্রব্য, মিষ্টি-মাছ, চাল-তেল, পান-তাম্বুল নিয়ে যাওয়া হয় পাত্রীর বাড়িতে। একে বলা হয় 'জারোন' বা 'তেলর ভার' তখন গীত করা হয়—-

'পক্ষী পরিছে সাগরে
তোর পিতে কইনা চাইছে নগরে নগরে'-

বরের পিতা খুঁজে চলেছেন মনের মতন 'কইনা', ছেলের চিন্তা হয় যদি কন্যা তার মনের মতো না হয়, সে এ বিয়ে না করে চাকরিতে চলে যাবে—

'কইনাক ন ধরে বাবুই ভাবিছে অন্তরে....
বৌ মই চাকরিক যাওঁ।' (বৌদি আমি চাকরিতে যাই)

এই লোকগানে পাত্রের মানসিক চিন্তা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'জারোন' অনুষ্ঠানে গাওয়া গীতের মতো বাঙালি সমাজেও গাওয়া হয় 'জুড়নী'র গীত।

'জারোন অনুষ্ঠান খুব সুন্দর ও চমকপ্রদ। বরপক্ষ থেকে বরের পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীরা যান কন্যার বাড়িতে। সেখানে কন্যার মা বিয়ের অনুষ্ঠানে সাজানো সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন গামোছা দিয়ে 'সরাই'কে সাজিয়ে, তাঁর সঙ্গে থাকেন কন্যাপক্ষের আত্মীয়ারা হাতে প্রদীপ, ফুল, গোলাপঝারি নিয়ে। বরের মা ও আত্মীয়ারা সামনে এসে দাঁড়ান, কন্যার মা তাঁকে প্রদীপের আলো দেখিয়ে পেছন পা হয়ে যেতে থাকেন আসরের স্থানে, তারপর দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করেন। গীত-বাদ্য-সানাই এর জমকে পূর্ণ হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। মূল আসরে সাজানো থাকে 'সরাই'-এর উপর সুন্দর কারুকাজে পূর্ণ গামোছা, এর উপর থাকে 'ভাগবত গীতা' দেবতার নিবেদিত ভোগ, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে তাম্বুল-পান দিয়ে দেবতাকে আবাহন জানানো হয়। দেবস্থানে সাজানো পিঁড়ি রাখা থাকে, সেখানে এনে 'কন্যা'কে বসানো হয়। তখন ভাবী পুত্রবধূকে চুল আঁচড়ে, গয়না পরিয়ে, শৃঙ্গার দ্রব্য দিয়ে মনের মতো সাজিয়ে তোলেন শাশুড়ী মা। তারপর বধূর লজ্জানত মুখ তুলে ধরে দর্পণ দেখান ও আদর করে মিষ্টি খাইয়ে দেন। এ দৃশ্য বড়ো মনোরম, আমাদের মনে পড়ে যায় বণিকরানি সনকা যেমন ভাবী পুত্রবধূ বেহুলার জন্য মঙ্গলাচরণের ঝাঁপি নিজের হাতে সাজিয়ে তুলেছিল ঠিক তেমনি অসমিয়া সমাজের বিবাহে জারোন অনুষ্ঠানও একই অনুভূতি নিয়ে আসে মনের গভীরে। সেজন্য প্রত্যেক মা-বাবাই তাই ভাবী পুত্রবধূ হিসেবে চান এমন কন্যা, যে নিজের পছন্দ থেকে মা-বাবার স্থির করা বরকে পতি হিসেবে গ্রহণ করে, একটি গীতে আমরা পাই,

'না বাছু মই বর পিতা নাবাছু মুই ঘর।
আইপিতাই যতে দেই সেই বরঘর।।'

বিয়ের আগেরদিন অধিবাসের তত্ত্ব পাঠানো দুটি সমাজেই প্রচলিত। অধিবাসের অনুষ্ঠানে দরা-কইনার গানের জন্য জল ভরতে যাওয়ার রীতি প্রায় এক, কন্যার মা ও এয়োতিরা মিলে বাদ্যসহ জলভরতে যান। প্রথমে গঙ্গা প্রণাম করে নজর কাটান হয়, সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলকামনা করে মা জল ভরেন। তখন গীত করা হয়,

'ও আই যমুনা, যমুনারে জল
হৈ আছে নিরমল, হরি মোর দৈবকী আহিব বুলি'।

... ...

আনিলু গঙ্গার জল, পানী তুলি আনিলু
কাষতে কলচী লৈ, খোলর বাজনা।'

জলে ভরে আনা কলস, ঘট রাখা হবে আঙিনার দক্ষিণ প্রান্তে,

'দুয়ার মেলা, দুয়ার মেলা
আনিছো গঙ্গারে জল নিয়া আগবাঢ়ি।
আনিছো গঙ্গারে জল
থোয়া দক্ষিণ ফালে।।'

নদী বা জলাশয় দূরে হলে প্রতীকীব্যঞ্জনায় গঙ্গা মাতাকে আবাহন জানানো হয় এভাবে, উঠোনে মাটি একটু খুঁড়ে জল ভর্তি করে তেল-সিদুর দেওয়া হয়, সামনে রাখা হয় ধূপ-দীপ, পান-মিষ্টি দিয়ে প্রণাম করেন মা ও এয়োতিরা, তারপর সূর্যপ্রণাম করেন।

অধিবাসের দিন রাতেই হয় সুহাগের ধান বান্ধা, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধর ধান বান্ধা অর্থাৎ মাঙ্গলিক চাল বের করার অনুষ্ঠান। আই-এয়োতিরা সবাই মিলে ঢেঁকির সামনে 'চাকি' জ্বালান, তেল-সিদুর দিয়ে প্রণাম করেন, তারপর শুরু হয় ধানভানা। তখন গীত করা হয়,

'সুহাগর ধান মুঠি বান্ধাহো আয়তী
ঢেঁকীতে তেল সিন্দুর দিয়া হে।
সোনারে চালনি চালিবা লাগিছে
প্রথম পুতেকর বিয়া হে।।'

অসমিয়া সমাজেও বাঙালি সমাজের মতো কন্যা-বরের মার সঙ্গে বিভিন্ন মাঙ্গলিক কাজে জড়িত এয়োতির সংখ্যা হতে হয় পাঁচ, সাত বা নয়। মা ও এয়োতিরা মিলে যখন ধান ভানতে থাকেন, তখন ছেলেমেয়েরা নাচে বিহু নাচ, ভীষণ সুন্দর হয় এই অনুষ্ঠান। আনন্দে, হাস্যকলরোলে মেতে উঠেন সব আত্মীয়স্বজনরা।

একটি তথ্য লক্ষণীয়, দুটি সমাজেই বিয়ের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিচার করা হয় ঘাইল-ছিয়া ও ঢেঁকিকে। দেবর্ষি নারদের বাহন ঢেঁকি সবথেকে বেশি প্রয়োজনীয়, তাই দেবর্ষি বাহন হিসেবে ঢেঁকি বেছে নেওয়ায় কৃষিজীবী সমাজকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। এভাবেই লোকসমাজ ও লোকভাবনার ক্রমবিবর্তন থেকে বৃহত্তর অর্থে গড়ে ওঠে জনমানসে দেবকল্পনা।

বিয়ের দিনের প্রথম অনুষ্ঠান 'নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ'। এই অনুষ্ঠানে যে গীত করা হয় তা এরকম,

'ও লয়ো বিষ্ণু নারায়ণ বোলি
ছায়েনার তলতে কুন্দকাটা পীরা,
ও লয়ো বাপুই বহি শ্রাদ্ধ করে
ছায়েনার তলতে রাম কলর পোলি
পিতেকর আদরর মায়েকর চেনেহর,
ও লয়ো নাজতে নেমেলে হাত'

বিয়ের দিন কন্যাকে স্নান করানোর পর মা ও মেয়ে বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হয়ে ওঠেন। আসন্ন বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে একটি গীতে, এই গীত গাওয়া হয় কন্যাকে ঘিরে, মা ও এয়োতিরা মিলে গেয়ে থাকেন—

'মোর বুকর আই তুমি কোতে ঘুচি যোয়া।
এরাবলৈ আমার ফালে চকু মেলি চোয়া।।
আই বুলি মাতিছিলো আদরুবা মাতে।
দাউর মারি বহিছিলো পিতারে কোলাতে।।
সরুর পরা করলু ডাঙর তোরে ভাত খাই।
এখেন আই গুচি যোয়া বুকে ঘাও দেই।।'

বাঙালি সমাজে যেমন 'চোরাপানি' ভরার প্রথা আছে অধিবাসের রাতে, অসমিয়া সমাজেও সেটি প্রচলিত। বিয়ের পর দুটি সমাজেই বিশেষ পাত্রে বিভিন্ন উপচারে সাজিয়ে বরভোজন করানো হয়, অসমিয়া সমাজে এই রীতিকে বলা হয় 'নেওতা'।

বিয়ের পর আসে কন্যা বিদায়ের পালা, সবচেয়ে করুণ এই বিচ্ছেদময় মুহূর্ত। দুটি সমাজেই বিদায়কালীন কন্যার 'কণকাঞ্জলি' প্রথা প্রচলিত আছে। এই সময়ে কন্যা কাঁদতে কাঁদতে বরের সঙ্গে এগিয়ে যায়, মা পিছনে শাড়ির আঁচলে ধরে থাকেন। কন্যা তখন হাতমুঠো ভরে ধান বা চাল, পয়সা পেছনের দিকে ঢেলে দেয়। বাপের বাড়ির দিকে পেছন ফিরে না তাকিয়ে পালকি বা গাড়িতে গিয়ে ওঠে। কন্যার মা সেই চাল বা ধান আর্চলে ভরে নিয়ে ভাঁড়ারে মিশিয়ে রাখেন, পয়সা রেখে দেন লক্ষ্মীর কৌটোয়।

শাস্ত্রমতে কন্যাকে মা-বাবার 'ঘরের লক্ষ্মী' হিসেবে বর্ণনা করা হয়, তাই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে কন্যা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়ির সম্পত্তিও কন্যার সঙ্গে চলে যায়। এখানে 'সম্পত্তি' বলতে বুঝানো হয়েছে কন্যার স্মৃতিভরা শৈশব, সবার স্নেহে বেড়ে ওঠা শিশু থেকে যুবতী হয়ে ওঠা কন্যার মনে গেঁথে থাকে সে দিনগুলি। কন্যা বিদায়ের পর পুরো বাড়িটা শূন্য হয়ে যায়, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বরের বাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে বরের মা-এয়োতিরা মিলে প্রদীপ জ্বালিয়ে নববধূর মুখ দর্শন করেন। আনন্দমুখর পরিবেশে দুরুদুরু করতে থাকে নববধূর মন — নতুন বাড়ি, নতুন আত্মীয়স্বজন, পরিবেশ-পরিজনকে আপন করে নেবার পালা শুরু হয় বধুর জীবনে। স্বপ্নের নীল আকাশে পাখি যেন উড়ে আনন্দে নীড় গড়ার সঙ্গীকে নিয়ে, নববিবাহিত দম্পতিকে ঘিরে এই কামনাই দোলায়িত হতে থাকে সবার মনে। কন্যার মা, বরের মা দুজনের মনেই আগামী দিনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কথায়—

'দরা কইনার কাপোরত গিঁট বান্ধি সপোন দেখে নারী...'

'যেটুকু পেয়েছ রোদ, সেইটুকু ছড়াও দুহাতে' : আজকের সময় ও কিছু শব্দহীন যন্ত্রণা

'আধুনিককালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হু হু করে কাজ, হুড়মুড় করে আমোদ-প্রমোদ।'
(আধুনিক কাব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের পথে', পৃ. ১০৪) আজকের সময়ের মানসিকতাকে ক্রান্তদর্শী কবি অনুভব করেছিলেন মনের গভীরে। জীবন আর জীবিকার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হারিয়ে গেছে মন, তাই মনের সঙ্গে মিল হল কি না সে তাগিদ তলিয়ে দেখার সময়ই আমরা পাই না।

মানবজীবনের মন (Intellect), ইচ্ছা (will) আর অনুভূতি (emotion) নিবিড় মুক্তাবিন্দুর মতো দানা বেঁধে ওঠে লোকসংস্কৃতির বুকে। তাই লোকসংস্কৃতির মধ্যে জনজীবনের সৌন্দর্যবোধ, আনন্দবোধ যেমন থাকে তেমনি থাকে নীতিবোধ নতুন প্রজন্মের এই কুকুরদৌড়ের জীবনে কিছুটা হলেও অবকাশের ডানা মেলে দিতে পারে লোকগান। অনেক সময়ই মনে হয় আমাদের অবহেলার অন্ধকার যেন ভবিষ্যতের ক্ষতি না করে। শহরের অট্টালিকা মুখর দাবদাহের তপ্ত বাতাসের মাঝে আমাদের মনের কোণে বাসা বাঁধে ঝিল্লীমুখরিত হেমন্তের শীতল সন্ধ্যায় ভেসে আসা রাখালের মেঠো সুর, এই সুরই তো লোকগান বা লোকগীত। আজকের বিয়েবাড়িতে লোকাচার বা

লোকগীতের থেকে অধিক গুরুত্ব পায় বিয়েপার্টির কৃত্রিম আদবকায়দা। সময়ের চলায় যে বাঁক তাকে আমরা কেউ এড়িয়ে যেতে পারি না, এই বাঁক বদলে দেয় সমাজকাঠামোকে। আজকের সময়কাঠামোর যে মুখ্য প্রবণতা একে আমরা এভাবে স্বতন্ত্রীকরণ করতে পারি,

ক. আধুনিকতার নামে পশ্চিমী আদবকায়দার অন্ধ অনুকরণ।

খ. বিশ্বায়নের প্রভাব জীবন ও জীবিকাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

গ. দেশের অর্থনীতির গতিপথ সামাজিক পরিকাঠামোয় এক নিঃশব্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা করেছে।

ঘ. অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক বিন্যাসে চিন্তাভাবনার নতুন সমীকরণে অনেকসময়ই অতীত ঐতিহ্য ও পরম্পরা অবহেলিত হয়ে যায়।

'লোকসঙ্গীতে মেলে জীবনের ভাষা
মানুষের কথা গুনি লোকসঙ্গীতে—
নির্ভীক কোনো কবিকণ্ঠের গান
ম্রিয়মাণ মন জাগায় আচম্বিতে।'

কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর এই কবিতায় লোকসংগীতের চিরন্তন মুগ্ধতা পাঠকের মনের সুরে মিশে যায়। লোকগানের ভাষা যতটা না জ্ঞানের তার চেয়ে বেশি হৃদয়ের, কল্পনার ভাষা। এধরনের ভাষায় থাকে রহস্যময়তা — যার কিছু অর্থ আছে, কিছু আছে সুর। ভাষার এই সুরই অন্তরের নাড়ির যোগ ঘটায়। সে যোগ একবার বিচ্ছিন্ন হলে মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়।

মানুষের মধ্যে আছে বহু মানুষ, লোকসংস্কৃতি সেই বহুত্বের গভীরে ছড়িয়ে থাকা দূরব্যাপী শিকড়ের মধ্যে রসসঞ্চার করে। নিজের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সে সংস্কৃতি খণ্ডিত হয়ে যাবে এটি একটি বিপদের সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা পরিবর্তনের পথে যতোদূর এগিয়ে যাই না কেন, বিয়ের সময় যে সুর মনের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায় তা হল, 'আমের তলায় ঝুপুর ঝাপুর/ কলার তলায় বিয়া। আইলা গো সুন্দর জামাই/ মুকুট মাথাত দিয়া।।' ভালোলাগার এই অনুভব থেকে মনে আশা রাখি আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি,

'যেটুকু পেয়েছ রোদ, সেইটুকু ছড়াও দু'হাতে
ক্রোধ নয়, সূর্যের ভালবাসা তোমার শরীর পেয়ে
কতখানি বাড়ে দেখ লতায় পাতায়।'

(বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, কবিতাগুচ্ছ, সাহিত্য, পৃ. ৭৭, ৩৪ বর্ষ)

উল্লেখসূত্র :

১. Alan Dundes, 'Defining Identity through Folklore', Folklore Matters, 1984, P. 8.

২. শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'পল্লীবৈচিত্র্য,' আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫৮।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'লোকসংস্কৃতিবিদ্যা,' অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬।

২. সৌমেন সেন, 'লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব ও পদ্ধতি', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮।

৩. ফুলকুমারী কলিতা, 'লোকসংস্কৃতির দাপোণ,' পূর্বশ্রী, বরপেটা, ২০০০।

৪. শ্রী দিপালী দাস (সংগ্রাহিকা) 'পৌরাণিক বিয়ার গীত', জনসেবা প্রেস, কুমারহাটি, ১৯৯০।

৫. অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বরাক উপত্যকার বাঙালি-হিন্দু সমাজের বিবাহের চালচিত্র', বিজয় প্রিন্টার্স, লালা, ১৯৯৫।

৬. অনুরূপা বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ বরাকের সাহিত্য', প্রাসঙ্গিক প্রিন্টার, শিলচর, ২০০১।

৭. গীতসংগ্রহ: মায়া দাস, লতিকা বর্মণ, বরপেটা রোড, আসাম।

বরাক উপত্যকার বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিয়ের গান

মহবুবুল বারী

বিয়ে হল মানবজীবনের এক চরম-পরম সন্ধিক্ষণ। শৈশবের অনুভূতির জীবন পেরিয়ে কৈশোরের শেষলগ্নে ঘটে মানবজীবনে যৌবনের আবাহন। যৌবনের দুর্বার আকর্ষণে প্রতিটি তরুণ-তরুণীর মনে রাগ-অনুরাগের উন্মেষ ঘটে। দুরন্ত যৌবন একে অন্যের কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে চায়। দিগ্‌ভ্রান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত পাগলপারা দু'টি মন গড়তে চায় এক স্বপ্নময় নীড়।

প্রকৃতির এই চিরন্তন ও শাশ্বত সত্য প্রাণী তথা জীবজগতের জৈবিক ধর্ম হলেও সভ্যসমাজ নর-নারীর এই চিরাচরিত কামনা-বাসনাকে সামাজিক অঙ্গনে আবদ্ধ করে এই মিলনোৎসবকে আরও মহিমামণ্ডিত, বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। ফলস্বরূপ এই বিয়ের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র দু'টি হৃদয়ের পারস্পরিক মিলনে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি সার্বজনীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। নানাধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ের উৎসবকে স্বীকৃতি জানিয়ে মানবজীবনের এই চরম মুহূর্তকে করে তুলে আরও আনন্দঘন, মধুময়, উৎসবমুখর।

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানের বেশকিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হলেও এই উৎসবকে আরও আনন্দময়, রসঘন, মিলনমধুর করে তোলার প্রয়াস সমাজ জীবনে কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি সমাজ এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে নানাভাবে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে। বিয়ে পর্বে নানা আচার-অনুষ্ঠান, উপকরণ ব্যতীত সমস্ত পরিবেশকে নানাভাবে উৎসবমুখর ও আনন্দময় করে তোলার প্রয়াস নেই — এমন বিয়ে হাতের কড়ে আঙুলে গুনে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে এই আনন্দ-উৎসবের কিছুটা খামতি ঘটে বর-কনের অভিভাবকের আর্থিক সঙ্গতির উপর। তবে মোদ্দা কথা বিয়ে মাত্রেই তো উৎসব আর উৎসব মানেই আনন্দ।

বাঙালি হিন্দুসমাজে নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান বিয়েকে অত্যন্ত সার্থক-সুন্দর করে তোলে। মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে বিয়েপর্বের সূচনা আর মন্ত্রপাঠ, হোম-যজ্ঞ, কালরাত্রি, শুভদৃষ্টি, দধিমঙ্গল, কুঞ্জসজ্জা, বাসরসজ্জা ইত্যাদি বহুধরনের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল, সানাই-নহবতের সুর সমগ্র পরিবেশকে করে তুলে প্রাণবন্ত।

অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে মুসলমান সমাজের বিয়ে, বিশেষ করে আমাদের এই তিন জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকায় সেটি বেশকিছু সরল, সংক্ষিপ্ত। তবুও বর-কনে উভয়ের বাড়িতে বিয়ের অন্তত তিন-চার দিন আগে থেকে উৎসবের ব্যাপক (সাধ্যানুসারে) তোড়জোড় শুরু হয়। দু'বাড়ির আবাল-বৃদ্ধবণিতা সবাই মিলে জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে 'বিয়ে' নামক উৎসবকে পূর্ণরূপ দেবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। বলাবাহুল্য অন্যান্য প্রতিটি সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও অতিথি আপ্যায়ন, আমোদস্ফূর্তি ছাড়াও বিয়ের অনুষ্ঠানকে আনন্দমুখর ও রসঘন করে তুলতে নানা ধরনের বিয়ের গান প্রচলিত। যদিও আজকের 'হাইটেক্' তথা অণু-পরমাণু

পরিবারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে পরিবারের সদস্যদের কাছে 'সেকেলে ন্যাকামি' ছাড়া কিছুই নয়। ফলশ্রুতিতে এসব বিয়ের গান আজ লুপ্তপ্রায়। তবুও আশার কথা বরাক উপত্যকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও এগুলো কমবেশি প্রচলিত।

বর-কনে উভয়ের বাড়িতে বৌদি, ছোট বোন, কনের সমবয়স্কা সখীরা এমনকি সময়ে সময়ে কনের দাদি-নানিরা বিভিন্ন লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানা সুরে, নানা ছন্দে, নানা অঙ্গভঙ্গিমায় গলা ছেড়ে গান গেয়ে বিয়ে বাড়ির অন্দরমহলকে মাতিয়ে তুলেন। বর-কনে যখন এই ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের প্রধান উপলক্ষ, তাই তাদের কেন্দ্র করেই এসব গান।

বিয়ের প্রাথমিক অনুষ্ঠান বর-কনেকে নিজেদের বাড়িতে 'মেহেদি' পরানো। উপত্যকার প্রায় বাড়িতে কমবেশি দু-চারটি মেহেদি (আঞ্চলিক ভাষায় মন্দি) গাছ থাকেই। এই মেহেদি গাছের পাতা সংগ্রহ করে শিল-নোড়ায় বেটে বর-কনের হাতের তালুতে, পৃষ্ঠদেশে, কনুই অবধি এবং পা সহ দেহের অন্যান্য অংশে আলপনার আকারে এঁকে দিতে গিয়ে মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠেন—

উজান গাংগে মন্দিয়ে খুশ্‌বয় খুশ্‌বয় করে
ভাটিয়ল গাংগেতে আইজ সাউদে হিনান করে।
কইবায় মন্দি কইবায়রে আমার
অউজেন মাইজীর খবরও নারে।।
মাইজী মরিলে কিনা অইব
বইনারী মরিলে কিনা অইব নারে;
সুন্দরী মরিলে অইমু দেশান্তরী নারে,
উজান গাংগে মন্দিয়ে খুশবয়...।

সখীরা নববধূকে মেহেদি রঙে রাঙিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আজন্ম মধুর স্মৃতিবিজড়িত পিতৃগৃহ থেকে সখীর (কনে) আসন্ন বিদায়ের করুণ স্মৃতি রোমন্থন করছে তেমনি অপরদিকে ভাবী বরের কাল্পনিক রূপলাবণ্য ও দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা দিয়ে যুবতী-হৃদয়ে পূর্বরাগ-অনুরাগের সঞ্চার করছে। সখী, বৌদি, দাদি, নানি, বোন পরিবেষ্টিতা নববধূ লজ্জায় অধোবদন হয়ে এসব মেয়েলি গান শুনছে আর কল্পনায় ভাবী বরকে আবাহন জানাচ্ছে। সখীরা বলছে, আমরা তো তোমায় মেহেদি রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমার ভাবী বরের সন্ধান এখনো তো পাচ্ছিনা। হয়ত হৃদয়চোরা বর চন্দ্রমুখীর জন্যে ব্যাকুল হয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন। মেহেদি পরার কথা ওর স্মরণে আছে কি? সখী, হৃদয়-বৃন্দাবনে তোমার বরকে জিজ্ঞেস কর তো দেখি—

গৌড়র সুনারাজা রউদরে যে ঘামিত্‌রা,
ডাক দিয়া জিগার করো মন্দি নি তুলিত্‌রা...।

বর যাই হোন না কেন, কল্পনায় তাঁকে 'গৌড়ের সোনারাজা' ভাবতে আপত্তি কীসের? অন্তত আজকের এই শুভ পুণ্যলগ্নে তিনি তো গৌড়রাজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

অপরদিকে, কনেকে স্নান করানোর জন্য সখীদের জল সংগ্রহের পালা। কলসী কাঁখে কুলবালা ও সখীরা অপরূপ ঢঙে গীত ও নৃত্য সহযোগে পাশের কোন জলাশয় থেকে জল আনতে যায়, গান ধরে—

নাইরল ধরে বিড়ে বিড়ে চুঁইয়া পড়ে পানি,
তারি তলে গোছল করইন কমলা সুন্দরী
সাক্ষী থাইকো আল্লা রছুল সাক্ষী থাইকো তুমি,
আজি তনে খেড়ির কমলার বিয়ার গোছল দিলাম।
মাইজী মাতাইতে কইনায় গলাত ধরি কান্দইন,
চাচীমাই মাতাইতে কইনায় পাও পড়ি কান্দইন।

মাইজীর পিয়রা কমলা মাথাত ডালো পানি,
এতেকো যউবন দেখিয়া মাইজী দুরই দিছইন বিয়া,
পরোর টেকো খাইছি মাইগো না দিছি দুরই বিয়া।।
নাইরল ধরে বিড়ে বিড়ে...।

স্নানের জন্য সখীরা এইভাবে গান গেয়ে কনেকে নিতে যাচ্ছে, কিন্তু অবলা কিশোরী মা, মাসি, পিসি, জেঠি প্রমুখ গুরুস্থানীয়াদের প্রণাম করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছে —

মাইজী মাতাইতে কইনায় বুকুত পড়ি কান্দইন,
ফুফুজী মাতাইতে কইনায় পাও পড়ি কান্দইন...।

অভিমানে সখীরা গাইছে —

পরর টেকা খাইয়া বাবুজীয়ে কমলারে
দুরই দিছইন বিয়া...।

কিন্তু এটাতো প্রকৃতির সহজাত নিয়ম একদিন না একদিন তাকে পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে যেতেই হবে। তাই অভিমান ভুলে আবারও গান ধরে —

বাড়ীর শোভা তাল-নাইরকল
গাংগর শোভা তরী
দুলাভাইর অঙ্গর শোভা কমলা সুন্দরী...।

এদিকে কনের মা-বাবা এবং অভিভাবকরা বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত। সাধ্যমত অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে হিমশিম খাচ্ছেন। সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। কনের মাতৃস্থানীয়ারা মাসি, পিসি, মামিরা হয়তো বা পর্যাপ্ত পানসুপারি বা পানের খিলি দিতে পারেননি; সুতরাং এই সুযোগে কনের মাকে একটু জব্দ করতে আপত্তি কীসের? তাই কনের মাকে উদ্দেশ করে বলেন — খুব সাধাসাধি করে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছো অথচ —

কাইল তুমি বর্তয়া আইছো ইনাইয়া বিনাইয়া,
কুনবায় গেলায় কইনার মা পান দেওছাইন আইয়া...।

মা নাকাল হয়ে চা-মিষ্টি আর পান-সুপারি পরিবেশন করে তবেই নিস্তার পান। বিয়ের আসরে, বিশেষ করে আমাদের এই বরাক উপত্যকায় ভোগ্যবস্তু অপেক্ষা পান-সুপারির কদর খুবই বেশি। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কনেপক্ষের সম্ভ্রম। সুতরাং এই রাজসিক খিলিপান, পানের বাটা তৈরি করার দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধা দাদি-নানিদের উপর বর্তায়। বৃদ্ধারা যতটা খিলি প্রস্তুত করেন তার চেয়ে অধিক সময় ব্যয় করেন খিলিপান নিজ নিজ মুখে পুরে নিতে। খিলি মুখে বৃদ্ধারা নাতনি জামাইয়ের নিন্দা ও প্রশস্তিসূচক নানা গান গাইতে থাকেন —

বাটা ঝিলমিল, বাটা ঝিলমিল বাটা ভরা পান,
নাতিন দামান্দ খাইবা আইয়া বাটা ভরা পান...।

এদিকে বরের বাড়িও উৎসবমুখর হয়ে ওঠে গানে গানে। বরকে বিয়ের আনুষঙ্গিক কেনাকাটা করতে বাজার-হাটে যেতে হচ্ছে অথচ সবসময় লাজুকভাব তার চেহারা-ছবিতে। এই বুঝিবা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গোপনে তাকে অনুসরণ করছে। বরের এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা মেয়েলি গানে যথার্থ ফুটে উঠেছে —

যাইন দামান্দ কাবুগঞ্জর বাজারো
দামান্দ রঙ্গে বিরঙ্গে।।
দাড়াইয়া আছইন তোমার শ্বশুর সদাগর
দামান্দ রঙ্গে বিরঙ্গে।।

যইন দামান্দ বালিঘাটর বাজারো
দাড়াইয়া আছইন চাচা শ্বশুর সদাগর
দামান্দ রঙ্গে বিরঙ্গে।।
কিনিয়া আনছইন নীলাম্বরী শাড়ীরে
দামান্দ রঙ্গে বিরঙ্গে...।।

বরের বাড়িতে পানসুপারি তৈরির রাজসিক আয়োজন চলছে। মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গীত গেয়ে পানখিলি তৈরি করছে —

ডুলিল গুয়া লইলা দাম্দে ছাঁচিয়া পানের বিড়ারে
সাহেব সুলতান দামান্দ সাজো নারে...।

অথবা

কাইল যে বর্তিয়া আইলাম অল্লাপুরর জারো,
বাবা যাইতা, চাচা যাইতা নবীন শ্বশুরদেশে নারে...।

বরকে মেহেদি পরানো ও স্নান করানোর সময় বৌদি ও বন্ধুবান্ধবরা নানারূপ টিপ্পনী কেটে গান ধরেন —

নবীন যউবতী কইন্যা গগনের শশী,
লাগাইয়া অভুলার গলায় প্রেম রসের ফাঁসী...।

ক্রমে ক্রমে বরযাত্রার লগ্ন এসে পড়ে। বরকে নানা জরির পোশাকে, নানা সাজসজ্জায় রাজপুত্রের বেশে সাজানো হয়। পরিবেশকে রসঘন করে তুলতে মেয়েরা গান ধরে —

দুতারা বাজে আকাশে সিতারা বাজে দাম্‌দের বাসরে,
মৃদঙ্গ বাজে দাম্‌দের নবীন শ্বশুরদেশে নারে...।

বরের রুচির তারিফ করতে হয়। কারণ ভাবী বধূর সাজসজ্জার অলংকার উপকরণ, কাপড়-জামা, বেশভূষা ক্রয়ে কোনরূপ কার্পণ্য না করে সাধ্যমতো মুন্সিয়ানার সঙ্গে ক্রয় করেছেন —

দামান্দ বড় হাউসিয়া
কানের বেশর আনছইন দাম্মেদ বাছিয়া।
দামান্দ বড় হাউসিয়া
বালুচরী শাড়ী আনছইন সুন্দরীর লাগিয়া নারে...।

এইভাবে কনের যাবতীয় বেশভূষা ও অলংকারাদির সুদীর্ঘ বর্ণনা দিতে গিয়ে জবাকুসুম তেল, আল্লা, সিঁদুর, চন্দন, সুগন্ধী সাবান ইত্যাদির সুখ্যাতি করতে এসব মেয়েলি গানে একটুও ভুল হয়না। শুধু নববধূর সাজপোশাক নিলেই স্ত্রীভাগ্য কপালে জুটবে না। তাই কনের নানি, দাদি, ভ্রাতৃবধূ ও ছোট ছোট ভাইবোনদেরও ঘুষ দিতে হয়। মেয়েলি গানে এর অপরূপ বর্ণনা শোনা যায়। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এসব গানের উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম।

বাইরে বরযাত্রার ব্যাপক আয়োজন। হাতি কিংবা ঘোড়ার হাওদা প্রস্তুত। পোশাক-পরিচ্ছদ পরে বরযাত্রীরা অপেক্ষমান। বরকে নিয়ে ভগ্নীপতিরা অন্দরমহলে গেলেন মা-জননীর অনুমতি ভিক্ষা করতে। একদিকে শুরু হল বিলাপ আর অপরদিকে মেয়েলি কোরাস গান—

করিমগঞ্জর রঙ্গিলা দামান্দ যইতা শ্বশুরদেশে,
রঙ্গিলা দাম্মেদ মাইজীরে ডাকইন মাইজীনি আছইন ঘরে।
খুশীর বিদায় দেও গো মাইজী যাইতাম শ্বশুরদেশে
. . . .

যাও যাও ওরে বাজান যাও শ্বশুরদেশে,
বেইলের দুইপর উদয় অইলে আইও মাইজীর কোলে।

এইভাবে মা, মাসি, পিসি, জেঠি, মামি, চাচি সবার কাছ থেকে বিদায় আর অনুমতি নিয়ে রাজপুত্রবেশী বর হাতি কিংবা ঘোড়ার পিঠে চেপে নবীন শ্বশুরদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। পৌঁছতে নিশ্চয়ই বেশকিছু বিলম্ব হবে।

বর এসে পড়বে, তাই কনের বাড়িতে মহা হুলুস্থুল। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের আনাগোনায়, ছোট ছেলেমেয়েদের কলরবে বিয়েবাড়ি গমগম করছে। ঘরে-বাইরে সবাই দারুণ ব্যস্ত। কনের সাজের শেষ তুলির টান টানতে সখীরা ব্যস্ত। সামনে বাটাভরা পান আর সেই সঙ্গে মেয়েলি কণ্ঠে সুরেলা গান —

সাজ সুন্দরী কন্যা সাজ বিয়ার সাজে,
নবীন যউবতী কইনা বড় ভালো লাগে।
কালো কেশে নিম-টগরের ঢেউ দিব তুলয়া,
রঙ্গ রজ দিব তাতে স্বর্ণ আদল দিয়া।
নাকে দিব নোলক বেশর কানে ঝুমকা দুল,
দামান্দ মিয়া দেখলে তোমায় হইবে ব্যাকুল।
গলায় দিব চন্দ্রহার, হাতে কাংকন বালা,
রূপবতীর রূপের চ্ছটায় আন্দাইর হয় উজালা।
তাড়াতাড়ি আনো দেখি সুহাগ ফুলের ডালা,
বিনা সুতায় গাথিয়া দিব প্রেম-পীরিতের মালা।
সেই মালাতে বদল হবে দুইজনারই মন,
পালং আর পলাশে দেখ কি মধুর মিলন।

ইতিমধ্যে নতুন জামাই এসে পড়েছেন। যথাসময়ে বিয়ের সার্বিক অনুষ্ঠান শেষ হল। এবার ভুরি ভোজনের পালা, তাই বরকে নিয়ে শুরু হল গান —

আইসা বইছইন নয়া দামান্দ মুখো নাই তান রাও,
ভাবে সাবে বুঝা যায় মাংস বুঝি খাও,
মাংস খাইয়া নয়া জামাই করইন হায়রে হায়,
দুই আতে পেটো কিলাইন ডিট লাগছে গলায়।

বিদায় লগ্ন এবার আসন্ন। কনের বাড়িতে বিদায়ের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। মা-মাসি-পিসি সবার চোখ কন্যার বিদায় মুহূর্তে অশ্রুভারাক্রান্ত। জন্মদাত্রী মায়ের কথা তো আলাদা। দশমাস দশদিন গর্ভধারিণী মায়ের অবস্থা তো পাগলিনীসম—

এতদিন পালিলাম বেটি দুধকলা দিয়া,
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনু বানমু হিয়া...।

জননীর বুকফাটা আর্তনাদ, মাসি-পিসি, মামি-চাচিদের চোখের জলে স্নাত হয়ে বহুস্মৃতি বিজড়িত পিতৃগৃহ থেকে অজানা-অচেনা এক নতুন পরিবেশের উদ্দেশে কনে পাড়ি জমায়। ময়ূরপংখি নাও নববধূকে নিয়ে পাড়ি দেয় অজানার পথে — শ্বশুরালয়ে, নতুন ঘর বাঁধার তাগিদে —

পালের টানে নৌকা যায়
　　ঘুরলো নৌকা বাঁকের মাথায়।
ছইয়ার ভিতর বইয়া কন্যায়
　　কান্দিয়া কূল ভাসায় রে

আকাদেমি পত্রিকা
লইয়া যায় লইয়া যায় রে।
পাগলিনী হইয়া মায়,
বস্ত্রহারা বেহুঁশ প্রায় গাংগের ঘাটে যায়।
পাড়ার লোকে দেখিয়া কান্দে হায় হায় হায় রে,
লইয়া যায় লইয়া যায় রে...।

একবিংশ শতকের প্রথম দশক পার হয়ে আমরা এসেছি। তথাকথিত আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ছাপ আজ বরাক উপত্যকার সুদূর পাড়াগাঁয়েও এসে লেগেছে। ফলস্বরূপ বিয়েকে কেন্দ্র করে নানা লোকাচার, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদও আজ আমরা হারাতে বসেছি। সহজাত অনুভূতি, সুর, ছন্দ আর কথায় ভরপুর বরাক উপত্যকার অসংখ্য বিয়ের গান স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। লুপ্তপ্রায় এই অমূল্য সম্পদ বিয়ের গান সংরক্ষণ না করলে আগামী প্রজন্মের কাছে তা শুধুমাত্র ইতিহাস হয়ে থাকবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

গানগুলি বর্তমান অগ্রজ ফজলুল বারী কর্তৃক কাছাড় জেলার সোনাই এলাকা থেকে বিশ শতকের পাঁচের দশকে সংগৃহীত।

মণিপুরি লোকসংস্কৃতি

মণিধন সিংহ

ইংরেজি অভিধা Folklore-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় আমরা লোকসংস্কৃতি ব্যবহার করে থাকি। তবে Folklore কথাটির সর্বস্বীকৃত প্রতিশব্দ আজও বাংলায় নেই বললে ভুল হবে না। কারণ 'লোকযান', 'লোকচর্চা', 'লোকশ্রুতি', 'লোকায়ত', 'লোকবৃত্ত' ইত্যাদি শব্দের দাবি খারিজ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। একইভাবে মণিপুরি শব্দকোষেও এ সমস্যা। Folklore শব্দটির মণিপুরি অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে যেমন লোকসংস্কৃতি, 'খুল্লোল', 'খুনুংলোন' ইত্যাদি। মণিপুরি লোকসংস্কৃতি নিয়ে কিছু বলার আগে মনে হয় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে একটু বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন। লোকসংস্কৃতির পরিধি বা জগৎ সুদূর প্রসারিত। এর আলোচনা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন লোকায়ত সংহত সমাজের পটভূমিতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের জীবনবৃত্তে লোকসংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। লোকসংস্কৃতি কোন এককের সৃষ্টি নয়। এ হলো সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। এক কথায়, একই ভৌগোলিক পরিসরে বসবাসকারী যাদের জীবন-জীবিকা, ভাষা, আচার-বিশ্বাস তথা একই ঐতিহ্যের অবলম্বনে একই সূত্রে গ্রথিত পুরুষানুক্রমে চলে আসা পরম্পরাকে সম্মিলিতভাবে লোকসংস্কৃতি বলা যায়। আবার লোকসংস্কৃতিকে একটি জীবন্ত জীবাশ্মও (Living Fossil) বলা হয়। কারণ এটি অতীতের সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত গাথা নয়। এটি হলো সজীব, সচল প্রাণবন্ত পুরুষানুক্রমে নিত্যবহমান একটি জনগোষ্ঠীর জীবন্ত সংস্কৃতি। এটি একটি জনগোষ্ঠীর জাতীয় সম্পদ। তাই এ কথা বলা যায়, একটি জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের দ্বারাই জাতিটির প্রকৃত শেকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

জীবনের চলচ্ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষাকারী লোকসংস্কৃতির প্রাণবন্ত অবিনাশী চলিত ধারাকে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ রিচার্ড ডর্সন দুভাগে ভাগ করেছেন। (Dorson - Folklore and folklife, Introduction, 1972, pp. 2-6) তা হলো ভার্বেল ফোকলোর আর নন-ভার্বেল ফোকলোর। আবার তিনি সেগুলিকে অনেক শ্রেণিতে বিভাজিত করে লোকসংস্কৃতির জগৎকে পর্যায়ক্রমে সুসজ্জিত এক বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

নীচে এর চিত্রায়িত রূপ দেওয়া হলো —

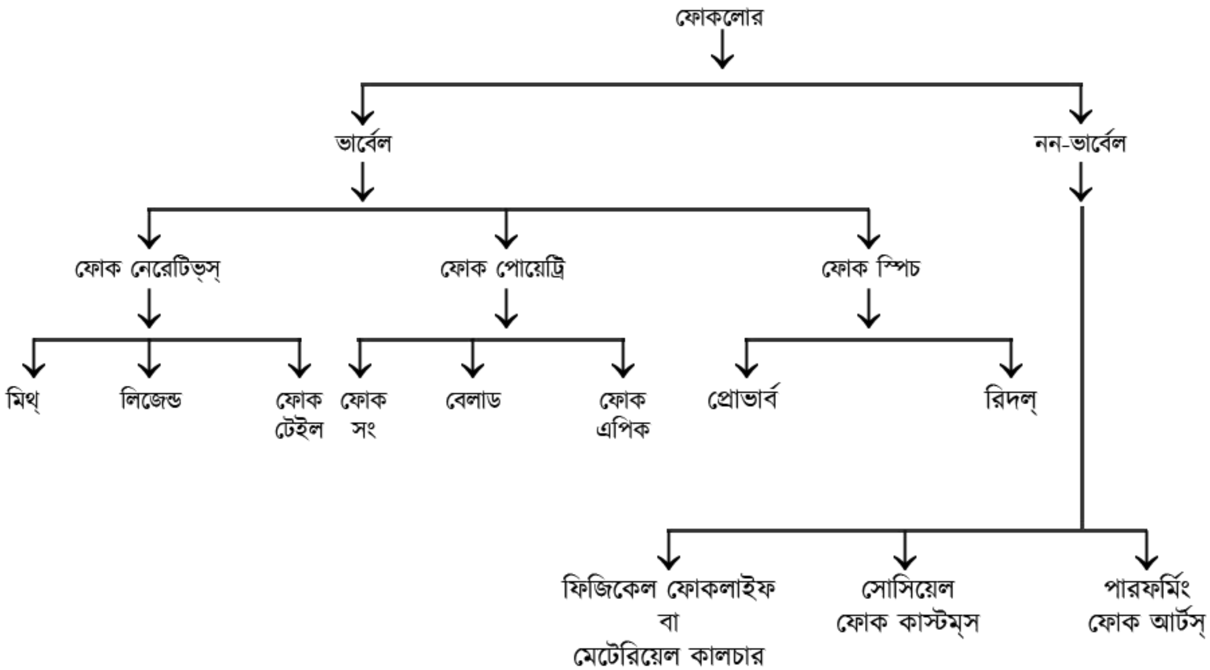

রিচার্ড ডর্সন প্রদত্ত সংজ্ঞা তথা লোকসংস্কৃতির শ্রেণি বিভাজনের আলোকে লোকসংস্কৃতিকে বিচার করলে লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা একদিকে যেমন জনগণের পরিশীলিত সৃষ্টি বা ঐতিহ্যকে বুঝি অন্যদিকে তেমনি জনজীবনের ব্যাপক পরিধিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করি।

দুই.

লোকসংস্কৃতির বিষয় পরিধি এবং তার শ্রেণি বিভাজনের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা মণিপুরি লোকসংস্কৃতিকে দেখি তাহলে তার বিশালতা ও সমৃদ্ধি সহজেই অনুমেয়। আলোচনার সুবিধার্থে মণিপুরি লোকসংস্কৃতিকে শ্রেণিবিভাগ অনুসারে এক এক করে আলোচনা করব:

(১) ভার্বেল ফোকলোর (মৌখিক লোকবিদ্যা) —

ভার্বেল ফোকলোরকে লোকসংস্কৃতিবিদরা Folk literature বা Oral literature বলার প্রয়াসী। মণিপুরি ভাষায় অবশ্য এটা 'চীনবুং সাহিত্য' নামে স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে যে-সাহিত্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে পুরুষানুক্রমে জনমুখে প্রচলিত এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সেগুলোই লোকসাহিত্য। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. মযহারুল ইসলামের মতে সুদূর অতীতকাল থেকেই লোকসাহিত্যের প্রেরণা থেকেই লিখিত সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে। তাই লিখিত সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তি হিসেবে লোকসাহিত্যকে নেওয়া হয়। স্বভাবত লোকসাহিত্যের বর্ণনশৈলীর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে লিখিত সাহিত্যে। মণিপুর ইউনিভার্সিটির Folklore Department-এর তত্ত্বাবধানে ইদানীং মণিপুরি লোকসমাজের প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে চলিত মৌখিক লোকবিদ্যার অসংখ্য উপাদানকে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে গবেষণার কাজ খুব ভালই অগ্রগতি লাভ করছে। যার ফলে আমরা আজ মণিপুরি লোকসাহিত্য ভাণ্ডারে অসংখ্য লোককাহিনি (Folk Narratives), লোকসংগীত (Folk Song), Folk Speach যেমন

প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ, লোকনিরুক্তি (Folk Etymology) ইত্যাদি অনেক কিছুই জানতে পেরেছি।

(ক) ফোক পোয়েট্রি :— বাংলা লোকসাহিত্যের অসংখ্য লোকসংগীত যেমন ভাটিয়ালি, জারিগান, বারমাসীগান, বাউলগান ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা জানি। এগুলো সবই ফোক পোয়েট্রি। এটাকে পণ্ডিতেরা ওর‍্যাল পোয়েট্রিও বলে থাকেন। তাছাড়া, Ballad (লোকগীতিকা), লোকমহাকাব্য (Folk Epic) ইত্যাদিকেও এই শ্রেণিভুক্ত করা যায়। যাইহোক মণিপুরি লোকসংগীতের পরিধি কিন্তু খুবই ব্যাপক। মণিপুরি লোকসংগীতকে 'খুনুং ঈশৈ' বলে। অনেক প্রকারের লোকসংগীত মণিপুরি সমাজে প্রচলিত আছে। তবে সাধারণত বর্তমানে প্রচলিত মণিপুরি লোকসংগীতকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল — Retualistic folk song, Emotional folk song, Worker folk song, Lullabies and Playing songs ইত্যাদি। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন তা হল মণিপুরি লোকসংগীতগুলো গান হিসেবে গাওয়ার একটি নিজস্ব প্রণালী রয়েছে। এগুলি হচ্ছে যেমন — জাত, লমইন, শিকপলোন, শুইকপলোন, নহৈরোল, হিরিপাবোৎ, হিরিথাংগৈ ইত্যাদি।

মণিপুরি সমাজে প্রচলিত এরকম একটি Emotional folk song —

চীংদা শাৎপা ইঙৌল্লে
চিংনদনা শেনখিবা
কল্লকইদা, কল্লকই
ঐনা কেনগে কেনদেদো
মালংবনা হুম্বগী কেনবনি
মালংবা ঐসু কৈদৌদে
লৈরাংনা লৈখোক লোইবগী
কেনবনি!

বাংলা অনুবাদ —

পাহাড়ী ফুল ইঙৌল্লে
অজান্তেই ঝরে গেলে
হায় আফসোস্
ইচ্ছে করে তো ঝরিনি
ঝড়ো হাওয়া যে আমাকে
ঝরিয়ে দিয়েছে।
বাতাস আমারই বা কী দোষ
ফুলের জীবন যে শেষ হয়েছে
তাই তো ঝরে গেছে।

মণিপুরি সমাজে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করে। মাঠে দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় সাধারণত যুবকেরা যুবতীদের বা যুবতীরা যুবকদের উদ্দেশ্য করে পরিবেশন করে থাকে একধরনের লোকসংগীত যাকে 'খুল্লং ঈশৈ' বলা হয়। এধরনের অসংখ্য গান আছে যা বর্তমানে সম্পাদিত বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও মণিপুরি লোকসংগীতের ভুবনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ঘুমপাড়ানি গান (Lullabies), (মণিপুরি নাউথেম ঈশৈ), শিশুতোষ গান, খেলাধূলার গানও পাওয়া যায়।

উদাহরণ :	ঘুমপাড়ানি গান-		
মণিপুরি—	থা থা থাবুংতোন	(বাংলা)	ও চাঁদ ও চাঁদ ও পূর্ণ চাঁদ
	নচা মোরস্বী পোবিগে		তোমার সন্তানকে আমি
	পোবী শনম নম্বীগে		কোলে নেবো
	থৈবোং মচাতং থাদরকউ		আমার জন্যে একটি কাঁঠাল ফেলে দাও।
শিশুতোষ গান —			
মণিপুরি—	হা ইমা, ইমা ও	(বাংলা)	ও মা ও মা
	ঐসু লাকে ইমাও		আমিও আসবো তোমার সাথে
	নোং চুই লাক্কনু		বৃষ্টি পড়ে এসোনা
	য়েম্পাক তুণ্ডুনা মরাকে		ছাতা মাথায় আসবো
	লম্বী নাল্লি লাক্কনু		পিচ্ছিল রাস্তা এসোনা
	চৌশু পাইদুনা মরাক্কে।		লাঠি ভরে আসবো।
খেলাধূলার গান —			
মণিপুরি—	তে তে তেনরা	(বাংলা)	তে তে টিয়া পাখি
	কৈশামপাৎকী তেনরা		কৈশামপাৎ এর টিয়া পাখি
	হৈনৌনা মুল্লগা		আম পাকলে
	তেনরা না হরাওই।		টিয়ার খুশি।

(২) ব্যালাড (Ballad) — বাংলায় লোকগীতিকা :

প্রখ্যাত ফোকলোরিস্ট মযহারুল ইসলামের মতে সংগীতাকারে বর্ণিত কাহিনিকেই এক কথায় লোকগীতিকা বলা হয়। তাই বলা যায় কিংবদন্তীকে (Legend) যখন সংগীতাকারে পরিবেশন করা হয় তখন তাকে Ballad বা লোকগীতিকা বলা হয়ে থাকে। মণিপুরি লোকসাহিত্যে আমরা কয়েক ধরনের লোকগীতিকা পাই, যেগুলোকে মণিপুরিতে 'ঈশৈবারী' বলা হয়। ড. এইচ. বিহারী মণিপুরি লোকগীতিকাকে গাওয়ার ধরন ও বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন: (1) Mythological Ballad, (লাইতানগী ঈশৈরারী) (2) Legendary Ballad (থাগবারীগী ঈশৈবারী), (3) Ballad on Flora and Fuana (মহৌগী থাজবরী), (4) Historical Ballad, (5) Cosmogony Ballad ইত্যাদি। এই লোকগীতিকাগুলি গাওয়ার সময় 'পেনা' নামের এক বিশেষ তারযন্ত্র বা ঢোলক ব্যবহার করা হয়।

(৩) ফোক্ এপিক বা লোকমহাকাব্য :

লোকমহাকাব্যের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন সেগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা মণিপুরি লোকসাহিত্যে কয়েকটি কাব্য পাওয়া যায়। যেগুলোর মধ্যে 'ফৌওইবী অকোংজাম্বা', 'তনুলাইজীংনেম্বী', 'খম্বা-খোইবী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, খম্বা-থোইবীর মৌখিক লোককাব্যকে হিজম অঙাংহল লিখিত সাহিত্যে পরিবেশন করেছেন যা আজ আধুনিক মণিপুরি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

(খ) ফোক্ স্পিচ :— পুরুষানুক্রমে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ ও লোকনিরুক্তিকে এক কথায় ফোক্ স্পিচ বলা যায়। বাংলা প্রবাদ-প্রবচনকে মণিপুরিতে 'পাউরৌ' আর ধাঁধাঁকে 'পাউখোং' বলা হয়। অনেক সময় ফোক্ স্পিচগুলো একটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরেকটি জনগোষ্ঠীর ফোক্-স্পিচের হুবহু মিল আছে এমনও অনেক কিছু পাওয়া যায়। বাংলা ও মণিপুরি ভাষার প্রবাদ ও প্রবচনের বিষয়গত মিল থাকা কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

মণিপুরি **বাংলা:**

(১)	শামু ময়া থিন্দোবকপা মঙ্গে থেঙ্গুনা য়েশিনবা য়াদবনি।	হাতির দাঁত বেরুলে মুগুরের আঘাতেও আটকানো যায় না।
(২)	চেঙ পুরা চেংশিং ফৌ পুরা ফৌ শিং।	যেমন কর্ম তেমন ফল।
(৩)	হুইনা নুমিৎকীদমক রাই।	আদার বেপারীর জাহাজের খবর।
(৪)	চেংপোৎত্তা মায়রেন তোপ্পা।	বোঝার উপর শাকের আঁটি।
(৫)	উ লৈতবা লম্দা কেগেনা যুম্বী ওই।	নাই দেশে এরেণ্ডা বৃক্ষ।

(গ) ফোক-নেরেটিভস্ বা লোককাহিনি :— ফোক নেরেটিভস্ বলতে লোকসাহিত্য সম্ভারের লোককাহিনিগুলোকে বোঝায়। তাহলে লোককাহিনি মানে কী? অধ্যাপক মযহারুল ইসলামের ভাষায় — "যে লোকসাহিত্যের মধ্যে কাহিনী আছে, যা মুখ্যত বর্ণনাত্মক, যার মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা পাশাপাশি বিদ্যমান, আকাশ, মাটি, চন্দ্র-সূর্য, স্বর্গ-নরক, জল-স্থল, মহাশূন্য, পাতাল এক সহজ নৈকট্যে আবদ্ধ, দুস্তর ও সুদূরের ব্যবধান যেখানে সহজেই অতিক্রমনীয়, যে কাহিনীতে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ভাষার বোধগম্যতা যেখানে কোন সমস্যা নয়, জাদুশক্তির প্রভাব, দৈত্য দানবের কার্যকলাপ, খল চরিত্রের প্রয়াস, নায়ক চরিত্রের উত্থান-পতন, নায়কের সাহায্যকারী শক্তির ভূমিকা ইত্যাদি উপস্থিত থাকে সেগুলোই লোককাহিনী।" অতএব লোককাহিনির পরিধি যে কত বিশাল তা সহজেই অনুমেয়। মণিপুরি সাহিত্যে লোককাহিনি 'চীনুবং বারেং' হিসেবে পরিচিত। ফোক-নেরেটিভস্ বা লোককাহিনিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন: (১) Myths - বাংলায় পুরাকাহিনি, মণিপুরিতে 'লাইতীনগী বারী', (২) Legends বাংলায় কিংবদন্তী, মণিপুরিতে 'থাজবারী', (৩) Folktales বাংলায় রূপকথা, মণিপুরিতে ফুংগারারী ইত্যাদি।

(১) পুরাকাহিনি (Myths) — মণিপুরি লোকসমাজে সংস্কৃতায়ন এবং প্রাগ্-সংস্কৃতায়ন সংস্কৃতির দুটি ধারার অনেক লোককাহিনি প্রচলিত। মণিপুরি জনসাধারণ্যে বা বহুলভাবে প্রচলিত কিছু Myth বা পুরাকাহিনিগুলো হল সৃষ্টির কাহিনি ব্রহ্মাণ্ড, মানবজাতি, নক্ষত্র ইত্যাদি। তাছাড়া পূজিত দেবদেবীর ইহলোকে আগমনের কাহিনিও বহুলভাবে প্রচলিত। উদাহরণস্বরূপ 'মালেম লৈশেমলোন' (Cosmogomy), লাইরোল (দেবদেবীর কাহিনি) বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে ইহলোকের মানব জাতির লেনদেন আদান-প্রদান ইত্যাদি। লাইরেম্বী (অসংখ্য ধরনের দেবী), নোংপোক নিংথৌ, সনামহী, অপোকপা ইত্যাদি দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ইত্যাদি। তাছাড়া মণিপুরি লোকসাহিত্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিবর্তনের দিন, সপ্তাহ, মাসগুলোর উদ্ভবের কাহিনি এবং অনেক কিছু গাথা মণিপুরি পুরাকাহিনিতে প্রচলিত আছে।

(২) কিংবদন্তি (Legend) — ইংরেজিতে যাকে Legend বলা হয় মণিপুরিতে তাকে 'থাজরারী' বলা হয়ে থাকে। আসলে যে পুরাকাহিনিগুলোতে অতীতকালের কোন বীরপুরুষ বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা সে-ধরনের চরিত্রের এক বা একাধিক কাহিনি বর্ণিত হয় সেগুলোই কিংবদন্তি। তাছাড়া কোন স্থান, নদ-নদী, পাহাড়, বিল ইত্যাদিকে নিয়েও কিংবদন্তি থাকতে পারে। এখানে ভুললে চলবে না, কিংবদন্তি ইতিহাস নয়, কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হতে পারে। আসলে কিংবদন্তির কাহিনি কোন এক ঘটনাকে করে গড়ে ওঠে, তবে সে ঘটনার সঙ্গে জনশ্রুতি, লোককল্পনা, বিবরণীয় কলা-কৌশল যুক্ত হয়ে এক একটি কাহিনি গড়ে ওঠে। মণিপুরি লোকসমাজে এ ধরনের অসংখ্য কিংবদন্তির প্রচলন পাওয়া যায়। যেমন: খম্বা-থোইবী, য়াইথীংকন, ফৌওইবী অকোংজাম্বা ইত্যাদির

জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য কাহিনি। তাছাড়া উত্তর সংস্কৃতায়নের যুগে আরও অনেক কিংবদন্তি মণিপুরি লোকসাহিত্যের আঙিনায় আত্মপ্রকাশ করেছে যেমন অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ঔরসে বভ্রুবাহনের জন্মবৃত্তান্ত ইত্যাদি।

(৩) রূপকথা (Folktale) — ইংরেজি ভাষায় যাকে Folktale বলা হয় তাকে আমরা বাংলায় রূপকথা বা লোককথা বলি। রূপকথা মণিপুরি লোকসাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রূপকথাকে মণিপুরিতে ফুংগাবারী বলা হয়। ফোকলোরিস্টরা রূপকথাকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করেছেন। বিশেষভাবে বিশিষ্ট ফোকলোরিস্ট স্টিথ থোমসন প্রদত্ত Folktale-এর বিভিন্ন প্রকারের প্রায় প্রতিটি রূপকথা মণিপুরি লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। যেমন - Fairy Tales মণিপুরিতে 'হেলোয়গীবারী', Animals Tales - শা-ভাগীবারী, Witch Tales - লাই খুৎশাংবীগীরারী ইত্যাদি।

Non Verbal Folklore — মণিপুরি লোকসংস্কৃতির আরেকটি বিস্তর প্রসারিত সাম্রাজ্য হচ্ছে তার সামাজিক লোকপ্রথা বা লোক আচরণ (Social Folk Customs), ভৌতিক সংস্কৃতি (Material Culture), লোক-পরিবেশ্যকলা (Performing Folk Arts)। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদরা এগুলোকে একত্রে Non Verbal Folklore বলতে আগ্রহী। এখানে একটি কথা বলে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি যে মণিপুরি Non Verbal Folklore খুব বিশাল একটা পরিসর যার কারণে এই সীমিত পাতায় সবকিছু আলোচনা করা সম্ভব হবে না। তাই আমি আমার আলোচনাকে বিশেষ করে (Performing Arts) মণিপুরি লোক-পরিবেশ্যকলা বা উপস্থাপনীয় লোকশিল্প এবং লোকউৎসব নিয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস করব।

(ক) লাইহারাওবা — লাইহারাওবা মণিপুরি লোকসমাজের এক বিচিত্র অনুষ্ঠান। প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত Faubion Bowers-এর মতে বিভিন্ন বৈচিত্র্যে সম্মিলিত মণিপুরিদের একটি ধর্মীয়, লোকাচার, লোকবিশ্বাসের লোকনৃত্যকলা সজ্জিত গ্রাম্য লোকউৎসব যার মধ্যে প্রাক্-সংস্কৃতায়ন মণিপুরি সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়। তিনি 'The Dances in India' গ্রন্থে বলেছেন মণিপুরিদের সমস্ত রকমের নৃত্যকলার মুদ্রাগুলোর অংকুরস্থল হচ্ছে এই লাইহারাওবা উৎসব। আসলে, লাইহারাওবা হচ্ছে পরম পিতা সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিক্রিয়ার অনুকরণে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত এক ধর্মীয় তথা সামাজিক উৎসব। মণিপুরিতে 'লাই' শব্দের অর্থ একত্রে দেব-দেবী আর 'হারাওবা' শব্দের অর্থ হল 'আনন্দ'। এই দুটি শব্দের যুক্তার্থ যে একটি অর্থবহ শব্দ তা সহজেই অনুমেয়। মণিপুরি পুরাকাহিনি (Myths) অনুসারে 'য়াইবীরেল শিদবা' (যার কোন জন্ম মৃত্যু নেই) 'অসিবা লাই'কে (একজন দেবতা) যখন 'কোরৌ নোংশেম্বা' (স্বর্গদেশ) তৈরির পর 'মালেম লৈশেম্বা' অর্থাৎ পৃথিবী বা ইহলোক সৃষ্টির আদেশ দেওয়াতে তিনি কীভাবে তৈরি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তখন থাইবীরেল শিদবা তার মুখগহ্বরের ভিতরে মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ সমবেত এক অপরূপ সংসার দৃষ্টিগোচর করালেন তখন বিস্মিত হয়ে পড়লেন এবং দেবতাগণকে ডেকে এই দৃশ্য দেখালেন। তখন যে অভূতপূর্ব ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে 'লাই হোই লাওবা' বলা হয়। তা থেকে 'লাইহারাওবা' শব্দের উৎপত্তি। মণিপুরি লোকসমাজে প্রতিবৎসর এই উৎসব বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হয়। মূলত এই উৎসব পালনে সমাজে শান্তি ও উর্বরতা বৃদ্ধি হয় বলে মণিপুরিরা বিশ্বাস করে থাকেন। লাইহারাওবা উৎসবে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টিক্রিয়ার বিভিন্ন কার্যকলাপকে বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায় প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। তাতে মানবজাতির সৃষ্টি ও তৎসম্পর্কিত সংসারের প্রয়োজনীয় উৎপাদন সামগ্রী তৈরি, কৃষিকাজের ভূমি তৈরি (পাময়ামরোল), রোপণ কার্যের কলাকৌশল (লৌতারোল) গৃহনির্মাণের কৌশল (ঘুমশারোল), বুননকার্যের কৌশল (ফিশারোল), তথা সংসারে সন্তান জন্মপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপকে বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায় প্রদর্শন করা হয়।

(খ) চৈরাওবা — মণিপুরিদের নিজস্ব পঞ্জিকা রয়েছে। এতে বৎসরের বারোটি মাস আছে আর প্রতিটি মাসের নামকরণের পেছনে এক একটি লোককাহিনি রয়েছে। সে অনুসারে বৎসরের প্রথমদিনে একটি সামাজিক উৎসব পালন করা হয়। আদিকাল থেকে প্রচলিত এই প্রথা আজও চলছে। এটাকে বাংলা নববর্ষের বর্ষবরণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এইদিন প্রত্যেক বাড়িতে নিজ নিজ গৃহদেবতার (Sanamahi) আরাধনা করা হয়,

অন্যান্য অনেক লৌকিক দেবদেবী পূজার প্রথাও প্রচলিত আছে। তার সঙ্গে ওইদিন সকালে সমস্ত বাড়িঘর ধোয়া-মোছা করার পর দুপুরে শুদ্ধগৃহ, রান্নাঘর ও শুদ্ধ নতুন কাপড় পরিধান করে রান্না করা ভাত ও তরি-তরকারি বাড়ির এলাকার বাইরে মুক্তস্থানে 'লমলাই' নামের লৌকিক দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।

পরিশেষে মণিপুরি সংস্কৃতিতে কয়েকটি লৌকিক ক্রীড়ার কথা বলেই সমাপ্তি টানব। মণিপুরি লোকখেলায় শিশু, যুবক-যুবতী, পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা ধরনের খেলা আছে। অনেকক্ষেত্রে খেলার সময় সমবেত গান ও সংগীতের প্রচলনও আছে, যেগুলোকে আমরা মণিপুরি লোকসংগীতের অমূল্য সম্পদ বলতে পারি। শিশুদের অনেক খেলা আছে যেগুলোতে গান গাওয়া হয়।

যেমন —

তোং তোং তোংদ্রুম্বান
চকুক নাকৃক চাকরায়বা
লাইমরোল মচিন থি,
থাদোই কোইনা
তেমু তেমু মতোন সনা
চি চৌ। (খেলার নাম তোংদুম্বাল)

এ হল মা তার শিশুকে নিয়ে খেলা, এটা এক ধরনের লোকখেলা। কিশোর-কিশোরীদের নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের খেলা আছে তার মধ্যে কাক কাক, সেবোতি যেগুলো কিশোরীরা খেলে থাকে। যার মধ্যে লোকছড়া বা গান গাওয়া হয়। আর ছেলেরা খেলে চৈতেক কোৎপী, উরাউবী, খুলোৎপী, ফীবুল হাবী, কৈয়েন ইত্যাদি।

মণিপুরি লোকখেলায় ছোট কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন ধরনের খেলা ছাড়াও প্রাপ্তবয়স্কদের অনেক ধরনের খেলার প্রচলন আছে। Outdoor খেলাগুলোর মধ্যে শরিৎ শরাক (খালি হাতে আত্মরক্ষার কলাকৌশল), যুবী লাকপী (রাগ্বী খেলার মতো একধরনের খেলা), থাংখা (তরোয়াল বর্শার যুদ্ধকলাকৌশল), মুকনা (মল্লযুদ্ধ), মুকনা কাংজৈ (মল্লযুদ্ধ সহ হকি খেলা, শগোল কাংঙৈ (পোলো)। কাং শান্নবা মহিলা ও পুরুষ দল হিসেবে খেলা হয়, তাছাড়া মহিলা বনাম পুরুষ বা একটি দলে মহিলা-পুরুষ উভয়ই থাকতে পারে। এই খেলাগুলো সাধারণত নববর্ষে অথবা 'য়াওশং' অর্থাৎ দোলের সময় হয়ে থাকে।

মণিপুরিদের আরও অনেক ধরনের লোক-পরিবেশ্যকলা বা উপস্থাপনীয় লোকশিল্প প্রচলিত আছে। আর অনেক কিছু তো পরিবর্তনের প্রখর স্রোতে বিলীন হয়ে আজকের মণিপুরি সংস্কৃতিতে খুব একটা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, মণিপুরি লোকসংস্কৃতির জগৎ যতটা বিচিত্র ও বহুবর্ণিত ততটাই জটিল। সংগত কারণে এই সীমিত পরিসরে তার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় মোটেই সম্ভব নয়। তবে সংক্ষিপ্ত রূপরেখার দৌলতে মণিপুরি লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধি নিয়ে আর সন্দেহ রইল না। একথা সত্য যে বর্তমান দৃষ্টিতে মণিপুরি লোকসংস্কৃতির সার্বিক রূপরেখায়ও পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। যা খুবই স্বাভাবিক। মণিপুরি লোকসংস্কৃতির Motif গুলো যদি আধুনিক মানস ও প্রজ্ঞার আলোকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই পরিবর্তনের স্বকীয় ধারায় বহমান স্রোতের রূপ নিতে দেওয়া যায় তাহলে আধুনিক বা আধুনিকতর সভ্যতার অঙ্গে তা জীবনের পরিবর্তন ও উন্নয়নের মাধ্যম হতে পারে।

তথ্যপঞ্জি :

১. R. Dorson - Folklore and Folklife.
২. Maria Leach (ed), 1950, Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, New York.
৩. S. K. Chatterjee - Kirata-Jana-Kirti, Calcutta.
৪. ও. ভোগেশ্বর সিংহ মণিপুরি লোকসাহিত্য, 'ঋতু' হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৮৫।

ডিমাছাদের পূজা-পার্বণ : ঐতিহ্যের মূল্যায়ন

সুদীপ্তা খেরসা

বিশ্বাস মানুষকে শক্তি প্রদান করে। প্রকৃতির নিত্য খেলা-তান্ডব এসবকিছু আদিম মানুষের মনে বিস্ময় ও ত্রাসের জন্ম দেয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সরলীকরণ সম্বন্ধে সহস্র যোজন দূরে থাকা আদিম মানব ভয় ও বিস্ময় নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে চেয়েছে। প্রকৃতির এই 'বিরাট শিশু আনমনে' পুতুলখেলার মতো খেলাকে তারা করে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই মেনে নেওয়ার মধ্যে থেকে যায় অনিশ্চয়তার ভয়, জন্ম নেয় বিভিন্ন বিশ্বাস এবং সংস্কার। আদিম মানব সমাজ অনভিজ্ঞতায় বুঝে যায় অজানা অধরা কোন শক্তির প্রচ্ছন্ন মদত এতে আছে। এবার দরকার সেই অশুভ শক্তিকে সন্তুষ্ট করে রাখা, সেটাই আপস।

আদিম মানুষের বিশ্বাস থেকে জন্ম হওয়া সংস্কারে শুরু হয় পূজাবিধি, সেই বিধি অনুসারে সূর্য, জল, গাছ, আগুন, সাপ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প দেবতা স্বরূপ পূজা পেতে শুরু করে। তখন মানুষ স্বল্পজ্ঞান নিয়ে ভাবতে শেখে এসব দেবতাকে খুশি রাখতে হলে কোনও কিছু উৎসর্গ করা দরকার, তাই জঙ্গলের বিভিন্ন পশু-পাখি, ফল-মূল দেবতার জন্য উৎসর্গ করা হয়।

কালক্রমে পৃথিবীর বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিকাশ হতে থাকে। জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন ঘটে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং প্রব্রজনের ফলে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রাচীন দেবতাদের সঙ্গে মানুষও পূজো পেতে শুরু করে অর্থাৎ সমাজের রক্ষাকর্তা হিসাবে পরিচিত কোনও বলশালী বীরপুরুষ দেবতার স্থানে উন্নীত হন। যেমন- রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, মানুষের ভাবনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায় মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হতে থাকে কল্পনা এবং বাস্তব মিশ্রিত বিভিন্ন গল্প ও কাহিনি। বাস্তব অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত কাল্পনিক চরিত্রযুক্ত সেসব কাহিনি লোকের মুখে মুখে প্রচার হয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। পুরাণ-মিথ হিসেবে সেসব মানুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। পুরাণাশ্রিত দেবদেবীরা মানুষের কল্পলোকে রূপ পায়, শুরু হয় মূর্তি পুজো। তাদের অভিজ্ঞতায় দেবদেবীরা শুভ ও অশুভ রূপে চিহ্নিত হন। বিশ্বাস এবং অন্ধবিশ্বাস দুয়েরই সংমিশ্রণে প্রাচীন ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিকাঠামো তৈরি হতে থাকে। কালক্রমে সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের পুরাণ ভাবনা আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, বনের পশু-পাখিরাও মানুষের কাহিনিগুলোতে স্থান লাভ করে এবং কোন কোন দেবতার কল্পনায় বৈচিত্র্য ধরা পড়ে, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু কিংবা পাখি, অর্ধেক মানব-অর্ধেক মানবী রূপ পরিগ্রহ করেন দেবতারা, যেমন- গণেশ, হনুমান, নরসিংহ, শিবদুর্গা প্রভৃতি। তাছাড়া দেবদেবীর বাহন হিসেবেও পশু-পাখির পুজোর প্রচলন শুরু হয়ে যায়। ভয়-বিশ্বাস কিংবা আত্মরক্ষার খতিরে সৃষ্টি করা এসব প্রাচীন পরম্পরা আজও মানুষের ধর্মীয় ভাবনাকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে যে অস্বীকার করার জো নেই।

একথা সত্যি যে, সেই প্রাচীন ভাবধারার আদর্শেই প্রতোক সমাজ-জাতির ঐতিহ্য বহমান। অতীতের ভাবধারাই প্রত্যেক জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবে।

বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক জাতির ভাষা, ঐতিহ্য ও পরম্পরা অস্তিত্ব সংকটে। এই সংকটকে কাটিয়ে উঠতে দরকার প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ ঐতিহ্যর শিকড়কে রক্ষা করা। নিজের ভাষা-ঐতিহ্যের চর্চা ও সংরক্ষণ করে রাখা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। নিজের ঐতিহ্য পরম্পরাকে রক্ষা করতে গিয়ে জানতে হবে আমাদের প্রাচীন পুরাণকথা, লোককথা, গল্পগুলোকে। পিতামহদের মর্মগাঁথায় ভরা সেসব ইতিহাস জানলে আমরা নিজেদের চিনতে পারবো। এ প্রসঙ্গে কবিগুরুর গান মনে পড়ে যায়-

'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।।
কত জনম মরণেতে তোমারি ওই চরণেতে
আপনাকে যে দেব, তবু বাড়বে দেনা।'

ইতিহাস সাক্ষী, মানুষ নিজেকে বারবার জানতে চেয়ে শরণ নিয়েছে ঈশ্বরের চরণে। ঈশ্বরের দান এত মহৎ এবং বিশাল যে, কবিগুরুর কথা মতোই তাঁকে জানা ও তাঁর প্রতি বিস্ময় আমাদের আজও ঘুচেনি।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের নানা পথ দিয়ে আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক ইত্যাদি নানা ভাষাগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা এবং ধর্মীয়-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার মধ্যেও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তাই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমন্বয় এত বিশাল এবং উদার হয়ে উঠতে পেরেছে যে অন্য আর কোথাও সেটা লক্ষ করা যায় না। 'দিবে আর নিবে'র ভাবধারা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে আজও।

কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে যে, এত ধর্ম ও বর্ণের আবেশে নিজেদের রাঙিয়ে নিতে নিতে আমরা ভুলে বসে আছি সময়কে, নিজের অস্তিত্বকে। আজ তাই আমরা সময়ের এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যে নিজের অস্তিত্বকেই খুঁজে পাচ্ছি না। আর এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী আমরাই। কারণ আমরাই ভাষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যর চর্চা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। নিজেদের প্রাচীন পরম্পরা রক্ষা থেকে বিরত থেকে ছুটে চলেছি বিশ্বায়নের ঝলমলে আলোর পেছনে। প্রবীণ এবং নবীন দুই প্রজন্মই আজ সোনার হরিণের খুঁজে ব্যস্ত। ফলস্বরূপ, আজ প্রত্যেক জাতির ভাষা-ঐতিহ্য ও পরম্পরা সংকটের মুখে, তৈরি হচ্ছে ঘুনধরা সমাজ-ব্যবস্থা, মানবিক গুণ রহিত যান্ত্রিক মানুষ।

গত ২১ মে, ২০১২, সোমবার দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকায় তুষারকান্তি নাথের লেখা তথ্যবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সমীক্ষা 'ভাষা সংরক্ষণ-রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্ব' বের হয়েছিল। এখানে তার কিছু তুলে ধরছি — 'অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বহু উপভাষা বিহার, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে প্রায় বিপর্যস্ত এবং বহু মুণ্ডা উপভাষা-বিভাষা প্রায় বিলুপ্তির পথে। ... ইউনেস্কোর তথ্য মতে, অসমের আটটি ভাষা বিলুপ্তির পথে।' অতএব সময় থাকতেই সাবধান হওয়া জরুরি। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার গুরুদায়িত্ব আমাদের নিতেই হবে, অন্যথায় কালের গর্ভে আমাদের ঐতিহ্যও হারিয়ে যাবে।

আসামের প্রাচীন উপজাতি গোষ্ঠীর অন্যতম ডিমাছা জনগোষ্ঠীর ভাষা-ঐতিহ্যও আজ বিপন্ন। তাই বর্তমান ডিমাছা প্রজন্ম আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সংকটের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে।

ঐতিহাসিকদের মতে ভারতবর্ষে ডিমাছাদের আগমন প্রাগৈতিহাসিক কালেই ঘটেছিল। তাদের প্রব্রজন প্রসঙ্গে 'ডিমাছা সংস্কৃতির আভাস' গ্রন্থে তুষারকান্তি নাথ বলেছেন—

'খুব সম্ভব ডিমাছারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর্য-পূর্ব যুগে ছিলেন। আর্য-পূর্ব যুগের হরপ্পা সভ্যতা দ্রাবিড় জাতির কৃতিত্বের পরিচায়ক বলে পণ্ডিত মহলে মোটামুটি একটি ঐকমত্য রয়েছে। তবে এই দ্রাবিড় কারা এবং আধুনিককালের তামিলরা এদের উত্তরপুরুষ কিনা এ সম্পর্কেও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। মনে হয় ইন্দো-মঙ্গোলীয়রাও হরপ্পা সংস্কৃতির অংশীদার ছিলেন, হয়ত হরপ্পা সন্নিহিত ব্যাপক এলাকায় এদের (ডিমাছাদেরও)

বসতি ছিল।'[১] কিরাত-ডিমাছাদের পূর্বভারতের এক সুপ্রাচীন অধিবাসী হিসেবে ঐতিহাসিকরা সহমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, গঙ্গারিডিরাষ্ট্র ও সভ্যতায় ডিমাছারা ছিলেন অন্যতম অংশীদার।

সুন্দরবন প্রত্ন-গবেষণা কেন্দ্র মন্দিরতলায় একটি ক্যারনেলিয়ন ট্যাবলেট আবিষ্কার করেন, সেটা থেকেই ঐতিহাসিক গবেষকরা অনুমান করেন যে, ডিমাছারা গঙ্গারিডি সভ্যতার অংশীদার ছিলেন। সেই ট্যাবলেটে খোদাই করা আছে পক্ষীচক্ষুবিশিষ্ট একজোড়া মানব-মানবী। আর কিরাত জনগোষ্ঠী ডিমাছাদের সঙ্গে মিল এখানেই। ডিমাছাদের প্রাচীন কিংবদন্তি (সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক) অনুসারে ডিমাছাদের জন্ম পক্ষী থেকে অর্থাৎ তারা পক্ষী বংশজ। পুরাণ কাহিনি মতে সৃষ্টির পুণ্যলগ্নে 'ডিলাওব্রা-সাঙ্গীব্রাতে' পিতা বাংলারাজার (ভূমিকম্পের দেবতা) ঔরসে মাতা আরিখিডিমা (বিরাটকায় এক পাখি/golden eagle) সাতটি ডিম প্রসব করেন। সেই ডিম থেকেই ডিমাছাদের পূর্বপুরুষদের জন্ম হয়। বড়োদের লোকপুরাণেও প্রায় একই কাহিনি আমরা দেখি। এ প্রসঙ্গে তুষারকান্তি নাথ বলেছেন—

'ওই দুটো লোকপুরাণই যে আদিম চিন্তাপ্রসূত ও একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে উদ্ভুত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এই সংস্কৃতির ধারকরা অবৈদিক হওয়াই মান্য ও গ্রাহ্য। আর্যপূর্ব ধর্মীয় প্রবণতার এটি একটি লক্ষণ, যা গোষ্ঠীজীবন থেকে চলে এসেছে। পূর্বপুরুষ উপাসনা এবং এটির সঙ্গে 'টোটেম' বা কুলপ্রতীক সংক্রান্ত সংস্কার ও ভাবনাটুকুর বিমিশ্রণ ঘটে যাওয়া অর্ধপক্ষী-অর্ধমানব ও অর্ধপক্ষিণী-অর্ধমানবীর সমন্বয়ে গঠিত প্রতিরূপকে আদিপিতা-আদিমাতা হিসেবে তাদের সন্তুষ্টি কামনায় পুজো করা নিশ্চয় খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।'[২]

ডিমাছা জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সেই লোকপুরাণ অনুসারে পালন করে আসছে। ঐতিহ্য পরম্পরায় ডিম তাদের কাছে পবিত্র ও শুভাশুভ নির্ণয়ের অপরিহার্য অঙ্গ। এই বিশ্বাসের পেছনে তাদের আদি-পুরুষের ডিম থেকে জন্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেবাদিদেব শিব্রাই (শিব) ডিমাছাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। তিনিই আদিপিতা, সৃষ্টি ও সংহার তারই দ্বারা পরিচালিত। তাই ডিমাছারা তাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান, পুজোবিধির পূর্বে শিবের স্তুতি গেয়ে থাকেন। তাছাড়া অন্যান্য দেবতা যেমন— ওয়ারাজা, নাইখুরাজা গণযুণ-ব্রায়ুং, ডুরাজা — এরাও সমানভাবে পুজো পেয়ে থাকেন। ডিমাছাদের বিশ্বাস এঁরা সকলেই মঙ্গলকারী দেবতা।

ইন্দো-মঙ্গোলীয় ডিমাছারা মঙ্গলকারী দেবতাদের সঙ্গে অমঙ্গলকারী দেবতাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্যও পুজো দিয়ে থাকে। বিভিন্ন অপদেবতারা (সপ্তম সংখ্যক ডিম থেকে জন্ম নেওয়া) যাতে মানুষের অমঙ্গল করতে না পারে তাই বিধিমত তারাও পুজো পান। জঙ্গল-গুহা কিংবা পর্বতের গহ্বরে বাস করা অপদেবতাদের পুজোয় পশু-পাখি উৎসর্গের প্রথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আদিপুরাণ অনুসারে ছয়টি ডিম থেকেই দেবতাদের জন্ম আর সপ্তম সংখ্যক ডিম থেকে জন্ম নেয় বিভিন্ন অপদেবতারা। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে কোনও দেবীর জন্মকথা তাতে উল্লেখ নেই। একমাত্র আরিখিডিমাই তখন তাদের আদিমাতা। ডিমাছাদের ধর্মীয় ভাবনায় 'গামাডি' (দুর্গা/চণ্ডী) তান্ত্রিক শাস্ত্রপদ্ধতিতে পরবর্তীকালে এসেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ভাবনা প্রসূত ডিমাছাদের দেবী অপেক্ষা দেবের উল্লেখনীয় অবস্থানে তৎকালীন সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে হয়তো।

ডিমাছাদের সমস্ত পূজা-অনুষ্ঠান ডিমাছা পুরোহিত 'হোজাই/ জষ্ঠাই' এবং তাঁর সহযোগী 'বারোয়ারী' করে থাকেন। হোজাইর উত্তরাধিকারী বংশ পরম্পরায় হতেও পারে, নাও হতে পারে। এই কাজে উৎসাহী গ্রামের যে কোন ব্যক্তি হোজাই-এর কাছে প্রশিক্ষিত হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় সহযোগী হিসেবে কাজ করতে করতে 'বারোয়ারী'ই পূর্ণ প্রশিক্ষিত হয়ে পরবর্তীকালে হোজাই/জষ্ঠাই-এর কাজ করতে পারেন।

ডিমাছা সমাজে গ্রামের সীমা-চৌহদ্দি বন্ধনের পুজো প্রায়ই হতে দেখা যায়। যে কোন পুজো বা অনুষ্ঠানের পূর্বে অথবা নতুন বছর আগমনের সময় গ্রামে এই ধরনের বিধি পালিত হয়। এটাকে গেরবা (বেষ্টনী) বলা হয়।

সমতল কাছাড়ে বারোয়ারি কালী পুজো (মাঘ মাসের রটন্তী পুজো)-র সময় ডিমাছাদের গ্রামে 'নলাই গেরবা' (গ্রাম বেষ্টনী) করা হয়ে থাকে। রটন্তী পুজোর একদিন পূর্বে এই গেরবা অনুষ্ঠানটি করা হয়। বর্তমান কাছাড়ের ডিমাছারা হিন্দুশাস্ত্র মতে গ্রামের মঙ্গল কামনায় নগরকীর্তনও করে থাকে।

ডিমাছা সমাজে 'গেরবা' নানা ধরনের হয়ে থাকে।

১। ক্রংফাংনি গেরবা ঃ

বৈশাখী পূর্ণিমার আগে সোমবার অথবা শুক্রবার রাত্রিবেলা এই পুজো দেওয়া হয়। গ্রামের মূল প্রবেশপথে ডিম ভেঙে মন্ত্র পড়ে সীমাবন্ধন অর্থাৎ 'গেরবা' দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য আগামী বছর কোনও অমঙ্গল কিংবা আপদ বিপদ যাতে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। এতে গ্রামের সবাই মিলে 'ক্রংফ্রাং' মানে রক্ষাকর্তার উদ্দেশে প্রার্থনা জানায়। 'গেরবা' করার পূর্বে গ্রামবাসীরা নিজের গ্রামের চৌহদ্দির ভেতর চলে আসে। গেরবা হয়ে যাওয়ার পর বাইরের অন্য কেউ সেদিন আর গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না। পূর্বে নাকি কেউ এই নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে জরিমানা দিতে হতো। এই পুজোতে পশু-পাখি দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। উল্লেখ্য, এতে শুধু পুরুষরাই অংশ নেন। পুজোর প্রসাদ অর্থাৎ ভোগ ঘরের ভিতর প্রবেশ করানো মানা, কারণ এতে নাকি সব অমঙ্গল ঘরে চলে আসে। আমরা দেখেছি শনি পুজোতেও এই নিয়ম মানা হয়।

২। হাজা গেরবা ঃ

সাধারণত জুন মাসে এই পুজো হয় সোমবার অথবা শুক্রবার। এটি মূলত অপদেবতাদের উদ্দেশে করা হয়ে থাকে। গ্রামে যাতে কোনও আপদ-বিপদ, মহামারী অভাব অনটন না হয় এবং সবাই সুখ ও সমৃদ্ধিতে থাকতে পারে, তার জন্যই এই পুজোর ব্যবস্থা (তৎকালীন গ্রাম বাংলায়ও এই বিশ্বাস ও পুজোর প্রচলন ছিল, এর প্রমাণ আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে পেয়েছি)। ডিমাছাদের 'হাজাগেরবা' পুজোতে ডিম, মদ-মাংস, ফলমূল ইত্যাদি উপকরণ আবশ্যক।

এই পুজো পালন করা খুবই কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য, কারণ এতে একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় চারটি পুজোর আয়োজন করতে হয়। ব্যয়সাধ্য তথা গ্রামের সকলের মঙ্গলের জন্য তাই সর্বজনীন দান-দক্ষিণায় এই পুজো পালন করা হয়। উক্ত চারটি পুজো যথাক্রমে— (i) বৈরাগী, (ii) দাখিনচা, (iii) হাসং এবং (iv) সোগ।

(i) বৈরাগী পুজো ঃ ডিমাছাদের বিশ্বাস অনুযায়ী শিব/ শিব্রাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈরাগী (এই বৈরাগী শব্দ ব্যবহারে ডিমাছাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে মনে করি)। শিব বৈরাগী, কারণ শিব যোগীশ্রেষ্ঠ, পরমেশ্বর-মহেশ্বর, তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। 'তন্ত্রশাস্ত্র মতে প্রপঞ্চাতীত অবস্থায় যিনি 'শান্তং শিবম অদ্বৈতম', সৃষ্টি প্রপঞ্চে তিনিই শিবশক্তি।'

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ, পৃঃ-২৭৮)

প্রকৃতি ও পুরুষ সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে শিব, তাই তিনি পরমেশ্বর হয়েও বৈরাগী। তাই তন্ত্র মতে বিশ্বাসী ডিমাছারা বৈরাগী শিবের পুজো দেন। পুজোবিধিতে ধূপ, তৈল, সিঁদুর, ফল-মূল ছাড়াও হাঁস অথবা ছাগ বলি দেওয়া হয়। ডিমাছা হোজাই ডিমাছামন্ত্র সহযোগে পুজো কার্য করেন।

(ii) দাখিনচা ঃ এই পুজো মাঠে কিংবা গাছের নীচে নয়, গ্রামের পাশে কোনও ছোট নালা অথবা খালের উপর মাচা বেঁধে পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করা এবং গ্রামের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকা এর উদ্দেশ্য, এই পুজোতে 'দাখিনচা'-এর (অপদবতা অথবা কোনও এক বহিরাগত জাতি বিশেষ) উদ্দেশে মোরগ বলি দেওয়া হয়।

(iii) হাসং ঃ সপ্তম সংখ্যক ডিম থেকে জন্ম নেওয়া অপদেবতাদের রাজা হচ্ছেন 'হাসং'। হাসং রাজার অধীনে অন্যান্য অপদেবতারা গ্রামের অমঙ্গল যাতে করতে না পারে এ জন্য 'হাসং' পুজো। গাছের নীচে পুজো সারা

হয় এবং এতে মোরগ উৎসর্গ করা হয়।

(iv) সোগ ঃ ইনিও অপদেবতা গোষ্ঠীর একজন। গ্রামের মহামারী ও নানা ধরনের অমঙ্গল প্রতিহত করতে 'সোগ' পূজো পালন করা হয়। এই পুজোর বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে নাকি মোরগ কেটে নয়, মোরগকে মেরে মেরে উৎসর্গ করা হয়। সোগ অপদেবতা হয়তো ঘাড় মটকে খেতে ভালবাসেন।

উক্ত বিভিন্ন পুজোতে বাধা-নিষেধও অনেক। লক্ষণীয় যে, পুজোগুলো মঙ্গলকারী এবং অমঙ্গলকারী দেবতাদের উদ্দেশে করা হয় (দেবী পুজো নেই)। সুতরাং কোনও মহিলার পুজোতে ভাগ নেওয়া এবং প্রসাদ ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

৩। মাইসালাই পুজো ঃ-

কৃষিজীবী ডিমছারা জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি, বৃষ্টি আহ্বান এবং কৃষিকাজে যাতে কোন ধরনের অশুভ শক্তি না পড়ে সেজন্য এই পুজো দিয়ে থাকে। সাধারণত জুমচাষের আগে উক্ত পুজোটি করা হয়। বারোয়ারি পদ্ধতিতে অর্থাৎ গ্রামের সকলে মিলে চাল-ডাল-সব্জি, টাকা-পয়সা তুলে পুজোটি পালন করা হয়। এতে খোলা মাঠে 'ফাইনস্নিডি' (শস্যদেবী)র আরাধনা করা হয়। 'স্নি' শব্দের অর্থ সাত, সুতরাং এই পুজোতে বিধি অনুযায়ী সমস্ত উপাচারের বস্তু সাতটি সংখ্যার হতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে, ডিমাছাদের প্রত্যেকটি ধর্মীয় সাংস্কৃতিক বিধি নিয়মে পুরাণ কাহিনির প্রাচীন বিশ্বাসটিই অন্তর্নিহিত রয়েছে। সাত ডিমাছাদের কাছে তাই শুভ সূচক।

৪। বুসুনি গেরবা ঃ-

ডিমাছাদের কৃষি উৎসব 'বুসু'র পূর্বে এই 'বুসুনি গেরবা' অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। এই পুজোর উদ্দেশ্য বুসু উৎসব চলাকালীন কোনধরনের মহামারী কিংবা অমঙ্গল যাতে না হয়। এতে মাতা 'হেড়েমডি' এবং শিব্রাই-এর পুজো করা হয়। শিব্রাই-এর উদ্দেশে মদ ও মাংস সহযোগে 'মিডোগারবা' পুজো নিবেদন করা হয়। শিব্রাইর উদ্দেশে গ্রামের মোড়ল (সাইবুড়া) প্রার্থনা জানান—

"জিনি রাজি জিনি দিসি রাজি সিজাং দিসিসিজাং
এরাহা বাসাইন খাকা, বহর খাকা
... ...
হলার দাইনখা, বুরুনজ্জা দাইনখা
মিহবো দাইনখা, ডাওবো দাইনখা
রাজিসিজাং দিসিসিজাং জিনে জিমা লিংনে
লিংমা বহা নাওরাই ফাইনাং, সামপ্রাই ফাইনাং
... ...
অডেবানি খ্লাইহি হুদুজিরাও খাব্লিডিরাও,
মুদুডিরাও কুয়াদজি সিনি লামাহা জিয়াসানিহা
য়াসানিহা নিমিনে জিমা রিডাডু, লিংমা রিডাডু,
হুদুজামাইয়া, খাডুজামাইয়া, গবা জামাইয়া, গ্লোজামাইয়া
জিহা হহা খাওমা, লিংহা হহা থাওমা
... ...
নাওরাই সামপ্রাই হামহিডংমা, হামহি ঠাংমা
ব্রাই শিব্রাই এবোহা

জানে জামাইয়া হংন হংমাইয়া
নিংঠানে ডিমু রিলাডু গাইনমু রিলাডু
রাজি সিজাং দিসি সিজাং।”

অর্থাৎ বুসু উৎসবে অতিথিরা আসবেন, আমরা গ্রামবাসীরা মিলে ব্রাইশিব্রাই-এর কাছে প্রার্থনা করছি, আমাদের খাওয়া দাওয়া এবং আনন্দে কোন অমঙ্গল যেন না হয়। অপদেবতারাও যাতে অমঙ্গল না করতে পারে, তাই তাদের জন্যও খাদ্য-পানীয় উৎসর্গ করছি। অতিথিরা যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে যান ইত্যাদি। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতও হয়ে থাকে।

বিয়ে, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, কৃষি উৎসবে এবং জন্ম-মৃত্যু সমন্ধীয় নানা কাজে তথা গ্রামের মঙ্গল কামনায় ডিমাছারা শিব্রাই, হেড়েমডি, গামাডি সহ বিভিন্ন দেবতা ও অপদেবতার পুজো দিয়ে থাকেন। এতে গ্রামে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকবে এটাই তাদের বিশ্বাস।

অনার্য বংশোদ্ভূত ডিমাছারা প্রধানত তান্ত্রিক মতেই পুজো বিধান করে থাকে। শিব-শক্তিই হচ্ছেন প্রধান এবং তন্ত্রশাস্ত্র মতে সেই শক্তিই ঈশ্বরী অর্থাৎ 'গামাডি' (দুর্গা/চন্ডী) রূপে ডিমাছা সমাজে পুজো পেয়ে আসছেন। শিব-শক্তি (গামাডি) অবিনশ্বর এবং এক, তাই ডিমাছাদের গানে আছে—

'ব্রাই শিবারাই আমাই গামাডি
নিসি সাংমাই বানিসে হাবোস্যাও
নিসি বোয়াই বানিসে এবো ডিবিসাও।'

অর্থাৎ হে শিব্রাই বাবা, মাতা গামাডি, তোমরাই সৃষ্টি করেছ এই পৃথিবী এবং সংস্কৃতির বীজও তোমারাই বপন করেছো।

বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বায়নের প্রভাবে আক্রান্ত। তাই হারিয়ে যেতে বসেছে ডিমাছাদের প্রাচীন সংস্কারগুলো। নগাঁও, ডিফু, ধনশ্রীর দিকে ডিমাছা সংস্কৃতি অসমিয়া সংস্কৃতি বলয়ে ঢোকে পড়ায় সে সব অঞ্চলে প্রাচীন ডিমাছা সংস্কৃতি বর্তমানে অবক্ষয়ের মুখে। তবে, কাছাড়ের ডিমাছারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন পুজো-পার্বণকে আপন করে নিলেও নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে সমভাবে বজায় রেখে চলেছেন। সমতল কিংবা পার্বত্য উভয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের ডিমাছা গ্রামবাসীরা 'মাডাই হবা' অর্থাৎ দেবপুজো ডিমাছাদের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারেই পালন করে থাকেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। কারণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা অনুন্নত। সুতরাং লোকে কুসংস্কারই বলুক অথবা সংস্কার, রোগীকে সারিয়ে তোলার ব্যাপার যে সব অঞ্চলে ডিমাছা গ্রামবাসীদের একমাত্র ভরসা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। অনেক কষ্টে ব্যয়বহন করে তারা 'মাডাই হবা' করে থাকেন। তাছাড়া প্রাকৃতিক উপায়ে বের করা ওষুধপত্র তারা ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় মন্ত্রপূত তাবিচ বা মাদুলিও রোগীকে দেওয়া হয়। এসবই ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১। তুষারকান্তি নাথ, ডিমাছা সংস্কৃতির আভাস, হাফলং, ২০০৬, পৃ. ২১।
২। তুষারকান্তি নাথ, ডিমাছা সংস্কৃতির আভাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

বরাক উপত্যকার দুর্গাপূজায় 'নৌকাটানা' অনুষ্ঠান

তুষারকান্তি নাথ

মার্কণ্ডেয় চণ্ডিকা দেবীর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখানে চণ্ডী ও দুর্গাকে এক করে দেখা হলেও এই দেবী যে মূলত প্রাক্-আর্যভাষী দ্রাবিড়, কিরাত-মঙ্গোলীয় এবং মাতৃতান্ত্রিক চরিত্রের অস্ট্রিকভাষীদের আরাধ্যা দেবী তা একালের সমাজবিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত। 'চণ্ডী' শব্দটিই অনু-আর্য ভাষা সঞ্জাত। আর্যেতর সমাজের উপাস্য মাতৃকাদেবীর প্রভাব রয়েছে এর মূলে। তাঁর মূল পূজাবিধিই লৌকিক স্তরের। তাঁর মূল পরিচয় তিনি লোকদেবী। তাঁর উৎস পুরাণে নয়, লৌকিক সংস্কৃতিতে।

পূর্বভারতে বাঙালির জাতীয় উৎসবের প্রধান উৎস এই মাতৃকাদেবী। দুর্গাপূজা বাঙালির প্রধান উৎসব রূপে চিহ্নিত ও জাঁকজমকভাবে তাঁর পূজা করা হলেও তিনি বৈদিক দেবী নন। রামচন্দ্র কর্তৃক অকালবোধন ও শক্তিসঞ্চয় দ্বারা রাবণবধ প্রসঙ্গ বাল্মীকি রচিত রামায়ণে বিন্দুমাত্রও নেই। পরবর্তীকালে রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণে দুর্গাদেবীকে 'শাকম্ভরী' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই দেবীকে যে মূলত শস্যাদি সংশ্লিষ্ট (শস্যজননী/শস্যদেবী/ শস্যদায়িনী) রূপে কল্পনা করা হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বাঙালির সভ্যতা-সংস্কৃতি মূলত কৃষিকেন্দ্রিক। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতাও যে মূলত বাণিজ্যিক ও কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতা— এটাও আজ সর্বজনস্বীকৃত। প্রাগার্য হরপ্পা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যেমন, পূর্বভারতের সুপ্রাচীন বঙ্গ-সভ্যতার অব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলেও তেমনি দেবীমূর্তির 'শাকম্ভরী' লক্ষণযুক্ত ভাস্কর্য প্রমাণ রয়েছে। হাজার হাজার বছরের ব্যবধানেও দেবীদুর্গা এখনও শাকম্ভরী এবং তাঁর পূজাবিধিতে আরণ্যক জীবনচর্যা ও কৃষিভিত্তিক লৌকিক অন্-আর্য উৎস ধরা পড়ে। বাঙালির লক্ষ্মী-ভাবনাতেও ঠিক তেমনি ঘটেছে। উভয় দেবীর আরাধনায় সংগুপ্ত আছে কৃষিনির্ভর বাঙালির শস্যকামনা। বৈদিক লক্ষ্মী শস্যদায়িনী নন। বরাক উপত্যকাতেও দুর্গাপূজার সঙ্গে লোকজীবনের একাত্মতা অনুভব করা যায়। এখানকার লোকমানসে শিবপত্নী পার্বতী বা দুর্গা শ্রমজীবী-কৃষিজীবী-নৌজীবী মানুষের আপনজন। সুজলা-সুফলা বরাক উপত্যকায় দুর্গাপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'নৌকাটানা'-র স্ত্রী-আচারের মধ্যে আমাদের সংস্কারগত কিছু তাৎপর্য ও ঐতিহ্যের প্রত্নস্মৃতি অন্তর্লীন হয়ে আছে।

শস্যদায়িনী দেবীরূপে দুর্গা ও লক্ষ্মী যে লোকমানসে অনেকক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন, এর একটি অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ হল বরাক উপত্যকায় উভয় দেবীর পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৌকাটানার স্ত্রী-আচার। উল্লেখ্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণে (উইন্টারনিজের মতে এর রচনাকাল খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের পরে নয়) মহিষমর্দিনী 'শ্রী' নামে অভিহিত হয়েছেন। তিনি 'মহালক্ষ্মী' নামেও পরিচিত। এতএব লক্ষ্মী দুর্গা থেকে অভিন্ন। এসব সূত্রে উভয়েই অরণ্যদেবী থেকে শস্যদায়িনী এবং সম্ভবত এধরনের ধারণা থেকেই চণ্ডীপূজকেরা লক্ষ্মীকে দুর্গার আত্মজা রূপে কল্পনা করে নিয়েছেন। নানা তথ্যসূত্র ধরে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বঙ্গের ভৌগোলিক সীমানায় পাল আমলে দুর্গা-পরিবারে লক্ষ্মীর প্রবেশ ঘটে। নৌকাটানা প্রসঙ্গে প্রত্ন- ইতিহাসবিদ তথা লোকসংস্কৃতিবিদ রাজমোহন নাথ লিখেছেন— 'শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নবমীর রাত্রে ও দশমীর দিনে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় নৌকাটানার যে

স্ত্রী-আচার প্রচলিত আছে, তাহাতে ধামালি নৃত্য সহকারে বারমাসীগুলি এখনও গীত হয়।' [১]এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, যে কোনও জাতি-উপজাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো সব থেকে বেশি সক্রিয় ও সংরক্ষিত থাকে নারীদের নিজস্ব আচার-সংস্কার-বিশ্বাস ও প্রথার মধ্যে। নৌকাটানার ক্ষেত্রেও তা-ই। বরাক উপত্যকায় দুর্গোৎসবে কলার খোল দিয়ে তৈরি করা হয় একটি নৌকা। নৌকার ওপর ফুল-দূর্বা,-ধান-চাল, পান-সুপুরি-নারকেল-কলা-হরিদ্রা ইত্যাদি কৃষিজ দ্রব্য রেখে এটিকে একটি সুসজ্জিত বাণিজ্য তরীর রূপ দেওয়া হয়। এই বাণিজ্য-তরীটির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কিছু স্ত্রী-আচার। এটি সাজানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মহিলাদের। দুর্গাপ্রতিমার পাশে রাখা তরীটির চারদিকে মহিলারা গানে গানে আলপনা দেন। দশমী তিথিতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পর নৌকাটির মস্তকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে মহিলারা উলুধ্বনি সহকারে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। এরপর নতুন রঙিন গামছা দিয়ে বেঁধে দেবী-মণ্ডপের বাইরে নৌকাটি টেনে আনা হয়। মহিলারাই এই নৌকাটানার প্রধান উদ্যোগী, তবে পুরুষদের অংশগ্রহণে কোনও বাধা নেই। নৌকাটিকে কেন্দ্র করে মহিলা পুরুষ একত্রে 'ধামাইল' নৃত্য সহকারে বারমাসী গান গেয়ে থাকেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ চলার পর নৌকাটিকে টেনে ধানের ভাঁড়ারে তুলে রাখেন। শারদ-পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার দিনে ভাঁড়ার থেকে নামিয়ে আবারও অনুরূপ নৃত্যগীত সহকারে নৌকাটানা আচারটি পালিত হয়। নৌকাটিতে রক্ষিত ফলমূলগুলো 'মহাপ্রসাদ' হিসেবে গ্রহণ করার পর নৌকাটি পুকুর বা জলাশয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বরাক উপত্যকার সোনাই-রুকণি আববাহিকার বহু গ্রামে পারিবারিক ও বারোয়ারিভাবে পালিত দুর্গোৎসবের দশমী তিথিতে ও লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে পরম্পরাগতভাবে এই নৌকাটানার আচার-অনুষ্ঠানটি এখনও পরম শ্রদ্ধা ও উল্লাস-উচ্ছ্বাসে ভরা। উপত্যকার অন্যত্রও নৌকাটানার আচার পালিত হয়।

দুর্গাপ্রতিমার পাশে নৌকার প্রতীক রাখা এবং এটিকে আবার ধানের ভাঁড়ারে তুলে রাখা, যেখানে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান- প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই যে আচার-অনুষ্ঠান, তাতে সুদূর অতীতের নদীমাতৃক-জীবন-সংস্কৃতির প্রত্নস্মৃতি উদ্ভাসিত হতে দেখি। আবার সে তো শস্যদায়িনী রূপে চণ্ডী ও লক্ষ্মীকে অভিন্ন করে দেখারই ফলশ্রুতি। অন্যভাবে দেখলে কৃষিজ পণ্যে পরিপূর্ণ নৌকাটি প্রাচীন কাছাড় তথা বরাক উপত্যকার বাণিজ্যিক ও কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্যোতক। হেমন্তের শালিধান ঘরে ওঠার আগে বাণিজ্য-প্রস্তুতি এবং নদীমাতৃক জীবনের অনুষঙ্গবাহী আচার-অনুষ্ঠানের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও ওই নৌকার প্রতীক। চর্যাপদ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালির নৌ-বাণিজ্যের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা নিশ্চয় অসঙ্গত হবে না যে, চর্যাপদে বিধৃত নৌ-প্রতিবেশ পরিমাণে হলেও নদীমাতৃক বরাক উপত্যকার প্রতিচ্ছবি। বরাক উপত্যকা যে সুপ্রাচীনকালেই নৌ-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল, এর নানাবিধ ইঙ্গিত রয়েছে এখানে প্রাপ্ত পুথি এবং প্রচলিত লোকগান, সারিগান, বারমাসীগান ও নানা লোকাচারের মধ্যে। একটা অন্তর্লীন ইতিহাস রয়ে গেছে নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। এছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক টলেমির (খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক) ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থে 'Kattigara' (কাটিগড়া) বন্দরের উল্লেখ, শ্রীচন্দ্রের তাম্রলিপিতে (খ্রিস্টিয় দশম শতক) 'ইন্দ্রেশ্বরনৌবন্ধ' অর্থাৎ ইন্দ্রেশ্বর বন্দরের উল্লেখ এবং ভাঙ্গা ও সংলগ্ন অঞ্চলের (আনাইর হাওর) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও জনশ্রুতি এ অঞ্চলে সমৃদ্ধ বন্দরের অস্তিত্বকেই প্রতিপন্ন করে। বস্তুত ইন্দ্রেশ্বর, কাটিগড়া, ভাঙ্গা (আনাইর হাওর) বন্দরের বিকাশ নানা কারণে সম্ভব হয়েছিল— বরাক-কুশিয়ারা-সুরমা-সোনাই-রুকণির নাব্যতা এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের উপযোগিতা, অবস্থানগত সুবিধা, দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের প্রধান নদী ও সামুদ্রিক বন্দরসমূহের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ।

বরাক উপত্যকায় প্রাপ্ত মঙ্গলকাব্যের পুথিগুলোতে নৌ-বাণিজ্যের প্রতিচ্ছবি রয়েছে। লোকসংস্কৃতিবিদ তথা প্রত্ন-পুথি গবেষক ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য দুর্গোৎসবের সঙ্গে নৌকাটানার যোগসূত্র প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন— 'এ অঞ্চলের মনসামঙ্গলে দুর্গাকে পরোক্ষে নৌকার রক্ষয়িত্রী দেবী রূপে বর্ণনা করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দেবী দুর্গা চাঁদ সওদাগরের নৌকার হাল ধরে অলক্ষ্যে বসেছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মনসা চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা

ডোবাতে পারেননি।'[২] এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, আদি-অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দেবী 'চণ্ডী' শুধু অরণ্য-শস্য-কৃষির সঙ্গে নয়, জলের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। চণ্ডীর সঙ্গে জল ও জলযানের আরেকটি অন্তর্লীন সম্পর্ক আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকার মস্তককে বলা হয় 'চণ্ডী'। তাতে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে নৌজীবীরা পুজোও দেন। বরাক উপত্যকায়ও নৌকাটানার আগে মহিলারা শ্রদ্ধা সহকারে প্রতীকী নৌকাটির মস্তকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে দেন, তা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। বঙ্গের পূর্বতম প্রান্তের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী কিরাত-মঙ্গোলীয় ডিমাছাদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও লোকপুরাণ অনুসারে 'গামাডি' (দুর্গা/ পার্বতী) এবং 'রণচণ্ডী'-ও তো জলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বলা হয়েছে— 'দুর্গাসি দুর্গভবসাগর-নৌরসঙ্গা' (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪/১১) অর্থাৎ আপনি অসঙ্গা, দূরতিক্রম্য ভবসাগরপারের নৌকাস্বরূপিণী। এ থেকেও বরাক উপত্যকার দুর্গাপূজায় নৌকাটানার যোগসূত্র অনেকখানি প্রতিভাত হয়।

তথ্যসূত্র :

১. রাজমোহন নাথ, 'শ্রীহট্টগীতিকা (শান্তির বারমাসী)', শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৪, শ্রীহট্ট, পৃ. ৩৯-৪০।

২. অমলেন্দু ভট্টাচার্য (সম্পা.), বরাক উপত্যকার বারমাসী গান, কাছাড় বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর, ১৩৯১, পৃ. x (ভূমিকা)।

• পরিশিষ্ট •

লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় রাজমোহন নাথ

অমলেন্দু ভট্টাচার্য

আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় রাজমোহন নাথ (খ্রি. ১৮৯৯-১৯৬৫) একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বিদ্যাচর্চার এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর অবদানের স্বরূপ নির্ণয় করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। উনিশ শতকের শেষলগ্নে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের গবেষণা সূত্রেই বরাক-সুরমা উপত্যকায় লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের সূচনা হয়। ভারতীয় লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে যে দুজন ইউরোপীয় রাজকর্মচারী আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিক মহলের সামনে তুলে ধরেন তাঁদের একজন হলেন উইলিয়াম ক্রুক। পরবর্তী সময়ে ক্রুক লন্ডন ফোকলোর সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। ক্রুক তাঁর গবেষণার তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে জেলা শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তখন শ্রীহট্টের জেলাশাসক ছিলেন এ. পোর্টিয়স। আর শ্রীহট্ট-কাছাড়ের স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টার ছিলেন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য। ক্রুক-এর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ভার জেলাশাসক পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের উপর অর্পণ করেন। এ সম্পর্কে পদ্মনাথ লিখেছেন 'সুপ্রসিদ্ধ, ডাঃ (পশ্চাৎ স্যার জর্জ) গ্রীয়ারসন তখন সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষাতত্ত্ব সঙ্কলনে (Linguistic Survey of India) এবং ইউ পি প্রদেশের ক্রুকস্ নামক একজন সিভিলিয়ান ভারতের প্রচলিত লোকাচার (Folklore of India) সম্বন্ধে প্রতি জেলার তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। শ্রীহট্টে তদ্বিষয়ক তথ্য সঙ্কলন ভার উপর অর্পণ করেন। . . . ফোকলোর বা প্রচলিত লোকাচার বিষয়ে তিনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন- কিন্তু সেই কাজে আমাকে সহায়তা করিবার জন্য একজন ক্লার্ক নিযুক্ত করিয়া দেন। তাহার বেতন তিনি নিজ পকেট হইতে দিয়াছিলেন।'[১] ওই নিবন্ধের পাদটীকা অংশে তিনি আরও লিখেছেন যে, 'এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহার্থ আমাকে অনেক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী, শিক্ষক ও মৌলবীর নিকট প্রশ্ন পাঠাইয়া উত্তর আনাইতে হইয়াছিল। আমার অভিভাবক কল্প মৎপূর্ব্ববর্তী ডেপুটী ইন্সপেক্টার রায়সাহেব নবকিশোর সেন মহাশয়ও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে স্বদেশের তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে আমার 'হাতেখড়ি' হইয়াছিল, — পরিণাম শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।'[২] এই তথ্য সংগ্রহের সূত্রেই পদ্মনাথ লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হন এবং এভাবেই ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধানের প্রবণতা ধীরে ধীরে জন্মলাভ করে। সেই ধারাবাহিকতা আজও বহমান। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীভূমি', ১৩৩২ বঙ্গাব্দে 'শিক্ষাসেবক', ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে 'বিজয়িনী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকাগুলোতে পর্যাপ্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়েই লোকসংস্কৃতি চর্চা করা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুরুসদয় দত্ত এই সময়েই এ অঞ্চলের লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও সঙ্কলন করেছেন।[৩] কিন্তু লক্ষণীয় দিক হল এসব পত্র-পত্রিকায় প্রবাদ, লোকসংগীত, ব্রত বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে। এই পর্বে বিশ্লেষণ নয়, প্রাধান্য পেয়েছে সংগ্রহ।

এই প্রেক্ষাপটে রাজমোহন নাথের লোকসংস্কৃতি চর্চাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চার দুটো ধারা। তিনি বারমাসী গান নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ পদ্ধতিতে একটি পূর্ণাঙ্গ গীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। বারমাসী গান বিষয়ক তাঁর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয়েছিল শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। 'শ্রীহট্ট গীতিকা' (শান্তির বারমাসী) এবং 'বারমাসী গীতিকা' (নিমাইর বারমাসী) প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৪ এবং ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ সংখ্যায়। 'সোনাধনের গীত' (১৯৪৭)-এর প্রকাশক ছিল শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ। এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদানগুলো হল।

(ক) বারমাসী গানের আলোচনায় তিনি এ জাতীয় গানের রসগত বিশ্লেষণই শুধু করেননি, এসব গানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচারেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'এই গীতিকাগুলি মেয়ে মহলেই বিশেষ আদর পাইয়াছে, — যুবক মহলেও তাহাদের স্থান কম নয়। শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নবমীর রাত্রে ও দশমীর দিনে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় নৌকাটানার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত আছে, তাহাতে ধামালি নৃত্য সহকারে এই বারমাসীগুলি এখনও গীত হয়। তাছাড়া অন্য যে কোন উৎসব উপলক্ষ্যেও বারমাসীর যথেষ্ট আদর আছে।'[৪] কোন গান যখন আচার সংশ্লিষ্ট হয় তখন সেগুলোর উদ্ভবের তাৎপর্যে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এভাবেই তিনি ভিন্নতর অনুমান প্রকল্প গড়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছেন।

(খ) 'সোনাধনের গীত' তৎকালীন আসামের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাজমোহন নাথ 'মুখবন্ধ' অংশে বলেছেন- ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হইবার পর আধুনিক শিক্ষিত সুধী সমাজ অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির সহজ সরল ভাষায় রচিত গ্রাম্যগীতির প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট জেলায়ও গ্রাম্য কবি কর্তৃক রচিত অসংখ্য গীত প্রচলিত ছিল। সামাজিক সম্মেলনে বা অবসরকালীন চিত্ত বিনোদনের জন্য এইসব গীত হইত, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই শুনিয়া আনন্দ পাইতেন। ... শ্রীহট্টবাসীর মাতৃভাষা বাঙলা; কিন্তু কথ্য ভাষা ও দেশজ শব্দ মার্জিত বাঙলা হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক। লেখ্য ভাষায় কাব্য রচনা স্বতঃসিদ্ধ কথা, কিন্তু কথ্য ভাষায় দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়া নিরক্ষর গ্রাম্য কবিও যে কাব্য রচনা করিতে পারে ন— ইহা উপভোগ্য বস্তু।'[৫]

তাঁর সংগৃহীত উপাদান নিয়ে পরবর্তী গবেষকদের মনে যাতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দের সম্ভাবনা না থাকে এজন্য সংগ্রহের পদ্ধতির কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর অনুসৃত এই পদ্ধতির সঙ্গে গানের আসর থেকে সরাসরি সংগ্রহের মধ্যে যে কিছু তফাৎ হতে পারে এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সচেতন। এ সম্পর্কিত তাঁর পর্যবেক্ষণ এরূপ 'জৈন্তার প্রাচীন রাজবাটির সন্নিকটস্থ সৎ-জাঙ্গাল-আটি নিবাসী কানাই খলিফার নিকট হইতে আমি ১৯৪২ ইংরাজীতে এই গীতটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।... ঘরের এক কোণে বসিয়া কানাই মিয়া আপন মনে গীতটি গাহিয়া যাইতে আমি অপর কোণে বসিয়া লিখিয়াছি। অবশ্য গীতের আসরে বহু লোকের সম্মুখে এবং ঘরে বসিয়া একজন লোকের সম্মুখে গীত গাওয়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা অসম্ভব নহে; বিশেষতঃ এইরূপ গায়ক স্বভাবতঃ কবিত্ব-গুণ সম্পন্ন; আসরে দাঁড়াইয়া গীত গাহিবার সময় সদা সর্বদাই নূতন নূতন পদ রচনা করিতে সমর্থ।'[৬]

গায়কের বিস্তৃত পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন; তিনি যখন গীতিকাটি সংগ্রহ করেন, 'তখন কানাই মিয়ার বয়স ছিল সত্তর বৎসর। কানাই মিয়া যৌবনে গাজীর গানের খলিফা ছিল, এবং গ্রাম্য সম্মেলনে সোনাধনের গীতটি গাহিতে তাহার তিন রাত্রি লাগিত। কানাই মিয়া নিরক্ষর; সে তাহার ওস্তাদের নিকট হইতে মুখে মুখে এই গীতটি শিখিয়াছিল। কানাই মিয়ার বিশ্বাস এই গীতের আদি রচয়িতা শ্রীধর বাণিয়া। শ্রীহট্টের অন্য এক গ্রাম্য গীতিতে শ্রীধর বাণিয়ার ভণিতা পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন শ্রীধর বাণিয়া বঙ্গদেশের লোক। কানাই মিয়া আমাকে বলিয়াছে — শ্রীধর বাণিয়াকে সে বাল্যকালে জৈন্তায় দেখিয়াছে, জৈন্তার রাজধানীর একটি পাড়ায় তাঁহার বাড়ী ছিল।'[৭]

এই পরিচিতি সূত্রে শ্রীধর বাণিয়ার উল্লেখ অন্য একটি সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়েছে। উল্লেখ্য যে অধিকাংশ বারমাসী গানেই রচয়িতা হিসেবে শ্রীধর বাণিয়ার নাম পাওয়া যায়। লোকসংগীতে, বিশেষত কাহিনিমূলক লোকসংগীতে গায়কের নামই অনেক সময় রচয়িতার নাম হিসেবে গৃহীত হয়। এক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে। রাজমোহন

নাথ এই গ্রন্থি মোচনে সহায়তা করেছেন।

(গ) যে কোন সংগ্রহের ন্যূনতম বিকৃতি সেই উপাদানটির প্রামাণিকতা নষ্ট করে। এ সম্পর্কে রাজমোহন নাথ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'আমি কানাই মিয়ার ভাব, ভাষা ও ছন্দের কোন পরিবর্তন করি নাই। প্রসঙ্গত তিনি একই নামের এবং একই বিষয়বস্তু সম্বলিত উপাদানের উল্লেখ করে সেগুলো যে প্রামাণিক নয় সে সম্পর্কেও গবেষকদের সতর্ক করে দিয়েছেন, 'জৈন্তা পরগণার ঢুবি পাঠশালার শিক্ষক মুন্সী মহম্মদ আবদুল আজিজ কয়েক বৎসর পূর্বে সোনাধনের গীতোক্ত কাহিনী নিজের ভাষায় কবি-পাঁচালীর ছন্দে রচনা করিয়া সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।'

এভাবেই প্রযুক্তিবিদ রাজমোহন নাথ তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মননের সাহায্যে এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিচর্চায় রেখে গেছেন তাঁর অনন্য অবদান।

উল্লেখপঞ্জি :

১. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, 'আমার দেখা মানুষ মিঃ এ পোর্টিয়স সি আই ই', 'শিক্ষাসেবক', চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, শিলচর, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ. ১-৪।

২. ঐ, পাদটীকা অংশ, পৃ. ৪।

৩. গুরুসদয় দত্ত তাঁর লোকসঙ্গীত সংগ্রহের ফাইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলেন। পরে তা গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিকের সম্পাদনায় 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।

৪. রাজমোহন নাথ, 'শ্রীহট্রগীতিকা (শান্তির বারমাসী)', 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রীহট্ট, শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ. ৩৯-৪০।

৫. রাজমোহন নাথ, 'সোনাধনের গীত', শ্রীহট্ট, ১৯৪৭, মুখবন্ধ/০।

৬. ঐ, পৃ. √ .

৭. ঐ, পৃ. √ .

৮. ঐ, পৃ. √ .

৯. ঐ, পৃ. √ .

লোকসংস্কৃতি এবং ইতিহাস : প্রসঙ্গ সুজিৎ চৌধুরী

সঞ্জীব দেবলস্কর

লোকসংস্কৃতি অনুধ্যানের ক্ষেত্রটি এক অসীম সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পাঠ সম্প্রসারিত করা সম্ভব। ঐতিহাসিক সুজিৎ চৌধুরী তাঁর নিজস্ব অনুধ্যানের ক্ষেত্র-ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করেছেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব ভূমির প্রান্তিক অঞ্চলে সমাজ গঠনের সূত্রসংকেতগুলোর অনুসন্ধানে তিনি প্রাক্-কৃষিভিত্তিক সমাজের বিবর্তিত rites এবং rituals সংস্কৃতায়ন-পরবর্তী স্তরে এর মধ্যে প্রাচীন, প্রাক্-ইতিহাস পর্বের সামাজিক অবস্থার সুপ্ত নির্যাস অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের অন্ধকারতম অধ্যায়ে একটু সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর 'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার' (১৯৯১) গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে একটি দিকনির্দেশকারী গ্রন্থই। ভূমির সঙ্গে যে mother cult এবং fertility-cult জড়িত, এ সূত্র ধরে লিখিত ইতিহাসের পূর্ববর্তী সামাজিকপর্বে যে পৌঁছানো সম্ভব, এবং সেসঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে মধ্যপ্রাচ্য, এশীয়-ইউরোপ, এমনকী মিশর, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন cult-এর সঙ্গে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের লৌকিক পরম্পরারও একটা সাযুজ্য আবিষ্কার সম্ভব তাও তিনি দেখতে সক্ষম হয়েছেন।

বরাক উপত্যকা অর্থাৎ শ্রীহট্ট-কাছাড় নিয়ে প্রাচীন, মধ্য এবং সাম্প্রতিক কাল ধরে যে আবহমান বাংলার একটা সাংস্কৃতিক মানচিত্রের অবয়ব গড়ে উঠেছে — এতে প্রাক্-পৌরাণিক ঐতিহ্যের যে সম্প্রসারণও ঘটেছে - এ প্রক্রিয়ার স্বরূপ অন্বেষণে লোকসংস্কৃতি থেকে এ ঐতিহাসিক তাঁর প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিয়েছেন।

'মাতৃপ্রাধান্য'তে তিনি যে ফার্টিলিটি কাল্টের বিশ্লেষণ করেছেন, এতে সংশ্লিষ্ট লোক-উৎসব, লোকাচার, ব্রতকথা এবং উদ্ভিদ-শস্য ও প্রাণের প্রতীক দেবতাদের কথাও উঠে এসেছে। সুজিৎ চৌধুরী যে সাবিত্রী-সত্যবান মিথকে পাঠের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এতে পৌরাণিক মিথের সঙ্গে লৌকিক মিথেরও সংস্থান রয়েছে। সুরমা-বরাকে যে মেয়েলি ব্রত, বিশেষ করে সাবিত্রী ব্রত পালনের রীতি- এর মধ্যে মহাভারতীয় কাহিনির উপর ভিত্তি করেই কিছু স্ত্রী-আচার গড়ে উঠেছে। এখানে ব্রত সমাপনান্তে বিবাহিতা ব্রতীর জোয়াল কাঁধে হালের বলদের ঘাড়ের বাঁধন খুলে দেওয়ার যে প্রথাটা নিয়মিত পালিত হয়ে আসছে, এ জন্য হালের বলদ সহ চাষীকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেই আনা হয়—এর পেছনেও একটা পৌরাণিক অনুষঙ্গ রয়েছে। মহাভারতে ছিল পুনর্জীবিত স্বামীকে স্বর্গ থেকে নিয়ে আসার পথে মর্ত্য ভূমিতে নেমে সাবিত্রী হালের বলদগুলোকে মুক্ত করে দিয়ে আসছিলেন। সুজিৎবাবু এ কর্মটিকে লাঙ্গলভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রাক্-লাঙ্গল মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থার প্রতি একটি প্রত্যাহ্বান হিসেবেই বিশ্লেষণ করেছেন। কারণ এ লাঙ্গলভিত্তিক চাষের আত্মপ্রকাশই নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রচলিত একটি rite কীভাবে সমাজ ইতিহাসের একটা সূত্র হয়ে উঠতে পারে- এটা সুজিৎ চৌধুরীর লোকসংস্কৃতি চর্চার মূল কথা।

ওই একই সন্দর্ভে কার্তিকেয়-মিথ পর্যালোচনায়ও সুজিৎবাবু শ্রীহট্ট-কাছাড়ে গর্ভসংক্রান্তি, কার্তিকপূজায় নারীদের মাটির সরায় adonis garden-এর অনুকল্পে ধান্যক্ষেত্র বানিয়ে এতে উষার প্রতীকী মূর্তি স্থাপনের বিষয়টি

উত্থাপন করেছেন। উষার প্রতি কার্তিকেয়র চরম বিশ্বাসঘাতকতা, স্বীয় ক্ষমতাবলে যথেচ্ছ যৌনাচার, আবার যথাসময়ে আচমকা মাতৃবৎসল হয়ে ওঠা (মা খেতে পাবে না এ আশঙ্কায় উষাকে ঘরে না আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া) — এ সমস্ত বিষয়ই যে নারীসমাজের প্রতি চরম অবমাননা, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হল নারীদের কার্তিক পূজা। পূজা সমাপনান্তে দেবতাকে কোন প্রীতিকামনায় প্রণাম নয়, সন্তানের কোন অমঙ্গল না করার অগ্রিম নজরানা হিসেবে কেবলমাত্র বিবাহিতা নারীরাই একটি শুদ্ধ প্রণাম করে নেন। তবে কুমারী মেয়েদের কার্তিককে প্রণামের রীতি নেই, বিশ্বাস, তা করলে মেয়ের বিবাহ হবে না। বন্ধ্যানারীদের আবার কার্তিককে বন্দি করে রেখে দেবার প্রথাও রয়েছে, সন্তানসম্ভবা হলে তখনই তাঁকে বন্ধনমুক্ত করা হয়। ইনি কোন benevolent deity নন, malignant deity।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওজাপালি, দেওধানী নৃত্য এবং এর পরম্পরা, সুরমা-বরাক উপত্যকায় মনসাপূজাকে কেন্দ্র করে ভাসানগান, ডরাই বিষহরি, গুরমা পুরোহিততন্ত্র- এ সমস্ত লৌকিক পূজা অর্চনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আচার আচরণ সমস্ত কিছুই এক এক অনাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক পর্বের গ্রন্থিমোচনের সূত্রসন্ধানে প্রয়োগ করেন সুজিৎ চৌধুরী তাঁর 'বৃহন্নলা' পাঠে। তাঁর 'পরশুরাম' কাহিনির বিশ্লেষণেও লৌকিক উপাদানের সংশ্লেষও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে কথা ইতিহাসে নেই, পুরাণকাহিনিতে যার ইঙ্গিতমাত্র আছে, সুজিৎ চৌধুরীর লোকসাহিত্যের অনুধ্যায়ী দৃষ্টি সেই ইঙ্গিতমাত্রকেই অবলম্বন করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার প্রয়াস। তিনি অবশ্য তাঁর এ পাঠের তাত্ত্বিক কাঠামোটি গড়ে তুলেছেন জেম্স ফ্রেজার এর 'গোল্ডেন বাও', আর দামোদর ধর্মনন্দদাস কোসাম্বীর 'মিথ অ্যান্ড রিয়েলিটি' গ্রন্থে অনুসৃত কাঠামোর অনুকল্পেই। তবে আলোচনার মুখ্য কেন্দ্রভূমি হিসেবে একটি প্রান্তিক অঞ্চলকে গ্রহণ করে সুজিৎবাবু সর্বভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ দিয়েছেন, এটা যেমন তাঁর সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার মৌলিকত্ব প্রমাণ করেছে, তেমনি লোকসংস্কৃতির বহুস্তরীয় সম্ভাবনায় দিকগুলোও উন্মোচিত করেছে।

দুই.

'শ্রীহট্ট কাছাড়ের ইতিহাস'-কার সুজিৎ চৌধুরীর গভীরে এক লোকজ চেতনার প্রকাশ একেবারে সুস্পষ্ট। আসলে সমাজবিজ্ঞানের কঠিন বাস্তবতায় বিচরণ করলেও সুজিৎ চৌধুরীর মনের ভেতরে এক গভীর সংবেদনশীল শিল্পীসত্তা। তিনি বাংলা সাহিত্যের সব ক'টি ক্ষেত্রে কমবেশি বিচরণ করতে পেরেছেন প্রাক্-যৌবনেই এবং পরিণত বয়সে দেশবিদেশের সাহিত্যকৃতির সংস্পর্শে এসেও তিনি বাংলার লৌকিক এবং লোকায়ত জীবনের প্রতি তীব্র ভালবাসাবোধে উদ্দীপ্ত হন, সন্ধান করেন লৌকিক সাহিত্য, জীবনচর্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত কথকতা, গৌণধর্মের তত্ত্বকথা, বাউলদর্শন, লোকজীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া কিংবদন্তী এবং লোকায়ত মিথ। ফ্রেজার এবং কোসাম্বীর তত্ত্বের সংস্পর্শে এসে এ আগ্রহ তাঁকে সুনির্দিষ্ট সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি রূপায়নে সহায়তা করে।

তিনি শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানে সিদ্ধেশ্বর-কপিলাশ্রমকে কেন্দ্র করে কপিলমুণি-সংশ্লিষ্ট জনশ্রুতির উপর অনুসন্ধান করেন। কিংবদন্তীর আলোকে এ ইতিহাস অনুসন্ধানে তিনি খ্রিস্টিয় সহস্রাব্দের প্রথম পর্বে পৌঁছে যেতে সক্ষম হন এবং পঞ্চম শতকে 'আগন্তুক উচ্চবর্ণের মানুষের প্রয়াসে শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত হিন্দুসমাজ গড়ে উঠে', এর সম্ভাবনাসূত্র আবিষ্কার করেন, এ সঙ্গে এ অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ও বিবর্তন সম্বন্ধে একটি গ্রহণযোগ্য সম্ভাবনার ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, এ অঞ্চলের আদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত হিন্দুসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আসে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী থেকে।

ওই একই পর্যায়ে যে দ্বিতীয় কাজটি তিনি করেন তাও ছিল এক কিংবদন্তীর অনুসন্ধান- ভুবনতীর্থ বিষয়ক। এ অনুসন্ধান এ অঞ্চলের ইতিহাসে একটি মাইলফলক স্বরূপ। বরাক উপত্যকার প্রাচীন ইতিহাসের জনপরিচিতি, কিরাত-অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বিচরণভূমি হিসেবে অঞ্চলটিকে সনাক্তকরণ, পর্বতশীর্ষে ভোট-বার্মীদের জ্ঞাতি টিপরা জনগোষ্ঠীর সংশ্রব, ভুবনতীর্থকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণ, শৈবধর্মাচারের প্রবর্তন এবং ক্রমে এর সংস্কৃতায়ন

প্রক্রিয়া— এ সমস্ত বিষয়টিকে একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস-পাঠকৃতিতে নিয়ে আসার পেছনে সুজিৎবাবুর লোকসংস্কৃতি অন্বেষা যে এক নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে, তা অনস্বীকার্য। শ্রীহট্ট-কাছাড়ের ইতিহাসের প্রস্তাবনায় তিনি যে কথাগুলো বলেছেন এরই মধ্যে ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান চর্চায় লোকসংস্কৃতি বা লোকযানের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়। কোসাম্বীর তত্ত্বের সমর্থনেই তিনি বলেন- কোসাম্বী বলেছেন যে ইতিহাসের অন্য ধরনের প্রমাণ যেখানে অনুপস্থিত, সে ক্ষেত্রে ধর্মাচার ও লৌকিক তীর্থস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনশ্রুতিকে ইতিহাসের জীবিত উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। সুরমা-বরাক উপত্যকায় একাধিক তীর্থস্থান এ ধরনের লোকশ্রুতি নিয়ে বিদ্যমান এবং আমাদের ধারণা এগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ইতিহাসের একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগটির উপর কিয়ৎ পরিমাণে আলোকপাত করা সম্ভব। (শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস, অখন্ড সংস্করণ, মহাজাতি প্রকাশন, কলিকাতা- ২০০৩, পৃ.১৮)।

তিন.

ইতিহাস এবং লোকসংস্কৃতির এ আন্তঃসম্পর্কের কথা মনে রেখে সুজিৎ চৌধুরী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের নামকরণই করেছেন Folklore and History : A study of the Hindu Folkcults of the Barak Valley of Northeast India (1996)। অবশ্য এ গ্রন্থের প্রধান নিবন্ধগুলোর মূল বাংলা পাঠ তাঁর 'মাতৃপ্রাধান্য'তে স্থান পেয়েছে। এখানে সংযোজিত হয়েছে নতুন কটি অধ্যায়, যার মধ্যে বাদসা-উপাসনা, পরশুরাম কথা, রণচণ্ডী এবং নির্মাতা দেবী কথা। অতি সম্প্রতি বর্তমান লেখকের একটি ইংরেজি নিবন্ধের কয়েকটি পঙক্তি এখানে উদ্ধার করলেই সমস্ত বিষয়টির একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া সম্ভব।

Sujit Choudhury traversed from folklore to literature, social-science to prose narratives...the notable feature of his writings is that in most of them his historian-entity is prominently manifested. If we start with folklore study, it is indeed the making of the historian.

(Historians and Historiography of Northeast India, Ed. B. Bhattacharjee, Institute of Northeast India Studies, Kolkata 2012).

এ উদ্ধৃতিকে আরও একটু টেনে নিই। সুজিৎ চৌধুরীর উপত্যকা পরিক্রমণ নিয়ে ওখানে বলা হয়েছে—

With a view to developing a 'better understanding of the people and society' Choudhury travelled extensively in the rural Barak and collected data on folk religious rites and rituals, along with different lore or tell-tale connected with such rituals and with the help of these he undertook a serious project to have a glimpse of the early historical social structure eccompassing a geographical area covering the entire Surma-Barak or Sylhet-Cachar region. This is the first time that the folklore of Sylhet-Cachar have been studied in the same line that the western social anthropologist James Frazer had followed. Choudhury combined with Frazers' method the perceptions of D.D Kosambi. (p. 262)

এখানে বাদসা ও মনসা উপাসনা নিয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। এ বাদসা হলেন বরাক উপত্যকার এক লৌকিক উপ-দেবতা, একাধারে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই উপাস্য। তাঁর স্থান আবার একেবারে কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণেই। এ উপাসনার এ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম লোকায়ত সাধনার সমন্বয়ী ধারার একটা পরিচিতি লাভ যেমন সম্ভব, তেমনি চার-পাঁচ শো বছর পূর্বে বিপদসঙ্কুল এ অরণ্যভূমিতে কৃষিসংস্কৃতি সম্প্রসারণের ইতিহাসের সূত্র আবিষ্কারও সম্ভব। আবার, ডিমাসাদের আরাধ্য দেবী রণচন্ডীর সম্ভাব্য আদি রূপের একটা ধারণা গড়ে নিতেও

লোকশ্রুতি ও লোকপরম্পরার যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তা এ অঞ্চলে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার স্বরূপ সন্ধানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তবে 'নিমাধাই' থেকে নিমাতার (নৃমাতা) রূপান্তরের যে সম্ভাবনা তিনি দেখিয়েছেন, এটা কতটুকু ইতিহাস সমর্থিত এতে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। বড়খলার এ নিমাতামন্দির কালের বিচারে নিতান্তই অর্বাচীন (অষ্টাদশ শতকের), এবং প্রতিষ্ঠানিক হিন্দু ধর্মাচারে অভ্যস্থ উজির পরিবার-প্রতিষ্ঠিত এ দেবীর রূপকল্প, ধ্যানমন্ত্র, পূজা পদ্ধতি সমস্তকিছুই বঙ্গীয় শক্তিঐতিহ্য অনুসারী। এখানে লৌকিক যে উপাদান সংযোজিত হয়েছে তা কেবলমাত্র সংস্কৃত 'নৃমাতা'র 'নিমাতা'য় রূপান্তর মাত্র। এটা স্পষ্টতই স্থানীয় বাক্রীতির প্রভাব।

এ অঞ্চলে লোকদেবী ডরাই বিষহরি, গুরমা অর্থাৎ নপুংসক পুরোহিততন্ত্র নিয়েও সুজিৎ চৌধুরীর বিশ্লেষণ হয়ে উঠেছে বহুমাত্রিক। বিশেষকরে Eunuch Priesthood and Deity Darai আর 'বৃহন্নলা' কথাকে মিলিয়ে পড়লে মহাভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাকৃতায়নের আরও কিছু নিদর্শন আমাদের এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সর্বভারতীয় সামাজিক পরম্পরার সম্পর্ক আরও স্পষ্ট করবে।

চার.

সুজিৎ চৌধুরীর 'স্বর্ণ গোধিকার সন্ধানে' আমাদের লোকসংস্কৃতিচর্চায় এক অভিনব প্রয়াস। এখানে তিনি খেন, তিব্বত-বর্মী, আস্ট্রো-মঙ্গোলীয় এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন Animal motif গুলোর উপর অনুসন্ধান করেন। হিমালয়ের পাদদেশবর্তী অঞ্চলে সরীসৃপের দেবত্বের প্রতীকে উত্তরণের এ প্রক্রিয়া মঙ্গোলীয় এবং ইন্দো-চৈনিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই সম্পৃক্ত এবং আসাম-অরুণাচল প্রদেশ ও নদীমাতৃক বঙ্গদেশে একই প্রকারভেদেই দৃষ্টি হয়। ওই একই প্রক্রিয়ায় বঙ্গদেশে গঙ্গার বাহন হিসেবে কুমির থেকে মকর-এর উদ্ভব। মধ্যযুগীয় 'চন্ডীমঙ্গল'-এ দেবীর গোধিকায় রূপান্তরের বিষয় নিয়ে একদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমতলবাসীর সংযোগ এবং ধর্মাচারের সঙ্করায়ণ এবং অপরদিকে চিন সহ দক্ষিণ-পশ্চিম এশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গীয় সমভূমির সুপ্রাচীন জনসংমিশ্রণ এবং ধর্মাচারের মিশ্রণের এক পরম্পরার যোগসূত্র আবিষ্কার যে সম্ভব এটাও সুজিৎবাবুর লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের বিশেষ ফলশ্রুতি। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দিয়েই এ প্রসঙ্গে আলোচনায় সমাপ্তি টানছি—

Choudhury found a common pattern in all these legends i.e., the transformation of animal figures into deities, which, according to him, suggest the migration, acculturation and admixture of different ethnic groups prior to the era of documentary history. (Historians and Historiography of Northeast India, p. 267)

পাঁচ.

ঐতিহাসিক সুজিৎ চৌধুরী ছিলেন কথাসাহিত্যের এক নিবিষ্ট পাঠক। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ নিয়ে তাঁর বিশেষ পাঠও রয়েছে। তাছাড়া বাংলার লোকজীবনের অন্যতম কথাকার তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ও তাঁর মননের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বিশেষ করে বিভূতিভূষণ এবং তারাশঙ্করের লোকায়ত চেতনা নিয়ে বিশ্লেষণ আমাদের দৃষ্টিপাতের দাবি রাখে। তিনি বলেন, 'বাংলার দুজন সেরা কথাসাহিত্যিক যখন গ্রামজীবনকে অবলম্বন করে কাহিনি রচনা করেন তখন ধরে নেওয়া যায় গ্রামজীবনের লোকায়ত প্রবাহটিকে তারা অনুধাবন করেছেন।' নিপুণ দক্ষতায় তিনি এদের লোকায়ত ধারণার দুটো স্বতন্ত্র স্বরূপ অনুধাবন করেছেন। 'ইছামতী' উপন্যাসে সুজিৎবাবু অবশ্য লোকায়ত চেতনার কোন প্রভাব লক্ষ্য করেননি। যা কিছু আছে তা ওই নারীচরিত্রদের জীবনচর্যায় এবং কথোপকথনেই দেখা গেছে। নারীদের যে সব সেকেলে বাভঙ্গির নিদর্শন এখানে রয়েছে এর উৎস অবশ্য

তৎকালীন কথকতা, যাত্রা, পালাগান, ঝুমুর এসবই। পুরুষদের নজর এড়িয়ে যেসব স্ত্রীআচার, ব্রত, স্নানমেলা, যা এ উপন্যাসে ছড়িয়ে ছিল, তা অবশ্য নিঃশেষ হবার পথেই। সময়টা উনবিংশ শতক। সুজিৎ চৌধুরী লক্ষ্য করেছেন ওই পালাবদলের মুহূর্তে 'গ্রামীণ বর্ণহিন্দু সমাজে লোকায়ত ধ্যানধারণার কার্যকর প্রভাব মূলত বজায় ছিল অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে। পুরুষসমাজে এর প্রভাব ছিল নগণ্য।' 'ইছামতী'তে তিনি বর্ণহিন্দু সমাজের সঙ্গে লোকায়তের কার্যকর বিচ্ছেদের প্রতিফলনই আবিষ্কার করেন।

আবার মোটামুটি অর্বাচীনকালের প্রেক্ষাপটে রচিত 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে বর্ণিত জনজীবন লোকায়ত জীবনের একেবারে কাছাকাছি। সময়ের প্রভাব এখানে সেরকম নেই। এখানে ধৃত কাহারদের জীবনপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে লোকায়ত বিশ্বাসই। কাহারদের লোকপুরাণ 'ব্রাহ্মণ্য উপাদানে মিশ্রণ বর্ণহিন্দু সমাজের প্রভাব', এ সমস্ত ক্রমে প্রতীয়মান হয়েছে। দুটো ক্ষেত্রেই সুজিৎ চৌধুরীর অভীষ্ট হল সমাজবিবর্তন। উপন্যাসে লোকায়ত চেতনার অবলুপ্তির ধারাটি অনুসরণ করে তিনি এ বিবর্তনের স্বরূপটি উদ্ধার করার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে আমরা দেখি সুজিৎ চৌধুরীর পাঠ হল কথাসাহিত্য, তাঁর অবলম্বন লোকসংস্কৃতি, উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক বিবর্তন। সাহিত্য বিচারে এর অবস্থান কোথায় আমরা জানি না, তবে লোকসংস্কৃতি পাঠে এ অনুশীলন অবশ্যই অভিনবত্বের দাবি রাখে (দ্রষ্টব্য: 'লোকায়তের রূপভেদ: হাঁসুলিবাঁকের উপকথা ও ইছামতী', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতায় 'লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য' বিষয়ক আলোচনায় প্রদত্ত বক্তৃতা, লেখকের 'সমাজ ও সাহিত্য ছিন্ন চিন্তা, ভিন্ন মত', করিমগঞ্জ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, গ্রন্থে সংকলিত)।

লোকসংস্কৃতিবিদ্যা ও পাণ্ডুলিপিবিদ্যা — বিনিময়!

অর্জুনদেব সেনশর্মা

কবি যখন তাত্ত্বিক হন, তখন তাঁর তত্ত্ব অনেকসময়েই কেবল তাঁর সৃষ্টির জন্যই প্রযোজ্য — এরকম একটি ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত থাকলেও, মনে রাখতে হবে ভূয়োদর্শী স্রষ্টার তত্ত্ব বহুভাবেই সাহিত্যবিচারের ধারাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন মনে করেন — কবিতাবিচারের একটি মূল সূত্র হল — বিশ্বমানবের উপর কবিহৃদয়ের অধিকার কতখানি, তখন বুঝি বা মুহূর্তের জন্য আমাদের মনে হতে থাকে, আদৌ লোকসাহিত্য বলে পৃথক কোন বর্গ নির্মাণ যুক্তিসংগত কিনা। যদিও লোকসাহিত্য এই বর্গটির বিলক্ষণলক্ষণই হল রচয়িতার ব্যক্তিপরিচয়হীনতা— মনে রাখা কি জরুরি নয় যে, ব্যক্তিপরিচ্ছেদের বিগলন না হলে কোন স্রষ্টাই মহৎ স্রষ্টা হতে পারেন না। হয়ত সেই কারণেই লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য বর্গটির বদলে অনেক আলোচক যৌথসংস্কৃতি ও যৌথসাহিত্য এবং ব্যক্তি সৃষ্টি ও ব্যক্তিক সাহিত্য এই বিভাগের পক্ষপাতী। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাও বলে রাখা সংগত যে অনেকে মৌখিক সাহিত্য এবং লিখিত সাহিত্য এই ভেদকেই সংগত বলে মনে করেন। যদিও এই স্বল্পপরিসরে সুদীর্ঘ আলোচনা অসম্ভব নয়, তবু মনে রাখতেই হবে, অজস্র বিপরীত উদাহরণের সাপেক্ষে কোন বিভাজনই যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তা সমালোচককে শেষাবধি স্বীকার করে নিতে হয়। প্রতিটি টেক্সট্‌ই 'অভিনব' এবং প্রত্যেকটি 'টেক্সট্'ই যে তার নিজস্ব সমালোচনাপদ্ধতি দাবি করে তা বিশিষ্ট সমালোচকরা মানবেনই।

বর্গগুলির binary-র বিবিধ অসম্পূর্ণতার জন্যই আজকের সমালোচনাবিদ্যায় লোকসাহিত্য এবং লিখিত বয়ানের (বিশেষ ক্ষেত্রে 'পুথি') পারম্পরিকতা আলোচনার যোগ্য। এই আলোচনায় আমরা মৌখিক/লিখিত এই দ্বিবিভাজনটিকে স্বীকার করবার সঙ্গেই আরেকটি দ্বিবিভাজনকেও মান্যতা দিতে বাধ্য। জনপ্রিয় এবং শিষ্ট এই দ্বিবিভাজনটিও এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এক যুগে যেটি জনপ্রিয় সাহিত্যের অন্তর্গত সেই সময়ে সেটি মৌখিক সাহিত্যের আওতায় থেকে গেছে, পরবর্তী যুগে ঐ সাহিত্যকৃতিগুলির জনপ্রিয়তার স্মৃতি যত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, ততই সেটি শিষ্ট সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং শুধু তাই-ই নয় — শিষ্টসাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে সেইটি লেখ্যরূপ ধারণ করেছে এবং ব্যক্তি স্রষ্টার স্বাক্ষর তাতে সংযুক্ত হয়েছে। যদি মধ্যযুগের ক্ষেত্রেই বাংলাসাহিত্য থেকে একটি উদাহরণ নির্বাচন করতে হয় তবে আমরা চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক অংশের ডাইনির কথা বলতে পারি। আচার্য সুনীতিকুমার ODBL-এ ভাষাতাত্ত্বিক কারণে নিশ্চয় করেছিলেন যে, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিধৃত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণতা পেয়েছিল, কারণ, ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা নামগুলি ত্রয়োদশ শতকের পূর্বের বাংলাভাষার স্মৃতি বহন করছে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়াও এই ধারণার সপক্ষে অন্য প্রমাণও আছে। রাজা হরিবর্মদেবের সভাপণ্ডিত সিদ্ধলগ্রামনিবাসী ভবদেব ভট্ট অন্তত দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই স্মৃতিগ্রন্থ 'কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' রচনা করেছিলেন। ঐ গ্রন্থে তিনি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতানুষ্ঠান পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন, শুধু তাই-ই নয়, ঐ ব্রতানুষ্ঠানে তিনি 'আখেটক গীতি' গাইবার কথাও উল্লেখ করেছেন। অথচ এ ত' আমাদের জানা কথা, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের কোন আখেটিক চণ্ডীমঙ্গল আমাদের হস্তগোচর হয়নি। এমনকী ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনও তাঁর

'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে' মঙ্গলচণ্ডীর অষ্টদিবসীয় ব্রতানুষ্ঠানে অষ্টবাসরীয় 'আখেটক গীতি'র উল্লেখ করলেও কোন কবির নাম উল্লেখ করেন নি। বোঝাই যায় — অন্ত্য পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনি — ব্যক্তি কবিপরিচিতি সহ আত্মপ্রকাশ করলেও — তার পূর্বের স্তরে — সেটি মৌখিক গীতিকা-ব্রত সাহিত্যরূপে যৌথ রচয়িতাদের মুখে মুখে বাহিত হয়েছে। এও সহজেই অনুমেয় যে, ব্যক্তি গায়েন থেকে ব্যক্তিতে, গ্রাম্য সভা থেকে সভান্তরে- কাহিনিবৃত্তের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনও হ'ত। অথচ মৌখিক সাহিত্যের এই স্তরটি যদিও ইতোমধ্যেই সেটি শিষ্ট সমাজে গৃহীত হয়ে গেছে (কারণ — স্মার্তদের বিধানে তার স্বীকৃতি এসে গেছে) — তবুও সেইটি আর পাওয়ার উপায় নেই। কারণ তা কালানুক্রমিক বিবর্তনে যৌথরূপ হারিয়ে লেখ্য রূপে ব্যক্তিলেখককে আশ্রয় করেছে। তাহলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের, আরও নিশ্চিত করে বলতে গেলে যাঁরা প্রত্নপ্রতিমা (Archetype) নিয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা কোথায় 'Oral form' এর সন্ধান করবেন। তাঁদের এই কৌতূহল কিছুটা হ'লেও নিবৃত্ত হতে পারে, যে যুগ থেকে লেখ্যরূপ পাওয়া যাচ্ছে, সেই যুগ থেকে যতদূর সম্ভব প্রাপ্ত পুথির পর্যালোচনা করে। কারণ মনে রাখতেই হবে মুদ্রণ-পূর্বযুগের প্রত্যেক কবির প্রতিটি টেক্সট্ই শুধু নয়, প্রতিটি টেক্সট্ এর প্রতিটি পৃথক পৃথিও সমান 'অভিনব'। আঞ্চলিক সংস্কৃতির উপাদানের বিন্যাসে, ভাষাবৈচিত্র্যে, উচ্চারণের বিন্যাসে -— প্রাপ্ত পুথিগুলির প্রতি তুলনায় আমরা মৌখিক স্তরের ঐ সাহিত্যের 'একটি নয়' যে অজস্র রূপ সমান্তরালভাবে প্রবাহিত ছিল- সেই তথ্যই যে সুনিশ্চিত হয়, তা নয় সেই অনেকগুলি রূপের বিগত ছাঁচের বিশ্লেষণযোগ্যতাও তৈরি হয়ে ওঠে। এই গেল মৌখিক সাহিত্য বিচারের পুথির প্রয়োজনীয়তার একটিমাত্র দিক।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিনিবেশের বিষয় হল — মৌখিক সাহিত্যেরই যদি লিখিত বয়ান থাকে, তার কালানুক্রমিক বিন্যাস ও পর্যালোচনা। মৌখিক সাহিত্যের কোন পর্যালোচকেরই পক্ষে তাঁর পূর্বকালীন মৌখিক সাহিত্য পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকী গতশতাব্দীরই অন্ত্যমধ্যভাগে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত যখন 'নবচর্যাপদ' সন্ধান ও সম্পাদনা করবার জন্য রেকর্ড যন্ত্র ব্যবহার করেন — তখনও তিনি তাঁর সমকালীনই বজ্রযানগীতির তিব্বতী রূপের সন্ধান পান। তার আগেরও নয়, পরেরও নয়। এখন ঐ নবসংগৃহীত চর্যাপদগুলির যদি একটি পূর্বসংগৃহীত পৃথি বা লিখিত বয়ান পাওয়া যেত তবে কমবেশি হাজার বছরে বৌদ্ধ সাধনসংগীতগুলির কী পরিবর্তন হয়েছে — তা স্পষ্ট আলোচনা করা যেত। সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় তার ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত, তা যিনি পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নন- তিনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একথা বলা যায় মৈমনসিংহগীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পাদনার ক্ষেত্রে। যে সময়ে ঐ গীতিকাগুলি সংগৃহীত ও 'সম্পাদিত' (!) হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে — মনে রাখতেই হবে, গীতিকাগুলি ঐ সময়েরই — তার আগের ও নয়, পরের ও নয়। গীতিকাগুলির কোন পূর্বসংকলন পেলে এবং বর্তমানে তা পুনঃ সংগৃহীত হলে ঐ লিখিত বয়ানগুলির প্রতিতুলনা করে আমরা গীতিকাসাহিত্যের সচল বিন্যাসটি লক্ষ করতে পারতাম বা পারব। সময়ের অন্তর্ঘাতে গীতিকাসাহিত্যও যে স্থির বসে নেই — লোকসাহিত্যতাত্ত্বিকদের তা ভাববার সময় এসেছে। তৃতীয় দিকটি হল লোকসাহিত্যের আঞ্চলিক রূপান্তরের দিকটি। মৌখিক জনপ্রিয় সাহিত্যের ধারা অঞ্চলনির্ভর। সাহিত্য যত ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে ততই সে অঞ্চলের পরিচয় ছাড়তে চায়। সাহিত্যের এ এক বিচিত্র কূটাভাস (Paradox)। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান- এই ক্ষেত্রটি নয়, তবু যেটুকু মনে রাখার তা হ'ল অঞ্চলনির্ভর মৌখিক জনপ্রিয় সাহিত্যের ধারা অজস্র উপাঞ্চলে রূপান্তর পরিগ্রহ করতে পারে। সুনিশ্চিত যে বিপ্রদাস ও তন্ত্রবিভূতির মনসাকাব্য এক নয়। এবার উপাঞ্চলিক ঐসব জনপ্রিয় মৌখিক সাহিত্যের রূপগুলি যদি সংরক্ষিত থাকত, তবে তা সংস্কৃতি আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারত যে, যদি ক্ষুদ্রতর অঞ্চল থেকে অঞ্চলে পরিবর্তমান মৌখিক সাহিত্যের লিখিত রূপ আমরা পেতাম বা পেতে থাকি তবে তা আদৌ আর মৌখিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত থাকবে কি না? হয়ত' থাকবে না —- কিন্তু যতক্ষণ তার রচয়িতার পরিচয় যৌথ, ব্যক্তিগত নয় — ততক্ষণ পর্যন্ত ত' সে 'লোকসাহিত্যে'র আওতাভুক্ত — এইটিই ত' 'মান্যমত'।

প্রতিবেদন - ১

অরুণ চন্দ স্মৃতি সম্মান নিয়ে অভিভূত প্রবাদপ্রতিম রাজনীতিক

বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরুণকুমার চন্দ। সুরমা-বরাক উপত্যকার দুই দিকপাল ব্যক্তিত্বকে এক মঞ্চে এনে দু'বছর থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান করছে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। প্রবর্তন করা হয়েছে অরুণকুমার চন্দ স্মৃতি সম্মান ও বিপিনচন্দ্র পাল স্মারক বক্তৃতা। এবার এই সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতীশ ভট্টাচার্য তুমুল করতালির মধ্যে তার হাতে মানপত্র, স্মারক শাল এবং অন্যান্য উপহারের সঙ্গে প্রদান করেন দশ হাজার টাকার ড্রাফটও। তার পাশে দাঁড়িয়ে তখন স্ত্রী রেণু চট্টোপাধ্যায়। দর্শকাসনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য, বিধায়ক আতাউর রহমান মাঝারভূইয়া, জেলা পরিষদের সভাপতি দিব্যজ্যোতি বড়ুয়া, জেলাশাসক হরেন্দ্রকুমার দেবমহন্ত, অতিরিক্ত জেলাশাসক দেবাশিষ চক্রবর্তী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বাদল দে প্রমুখ। ভারতীয় রাজনীতির প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রকাশিত চারটি বইয়ের আবরণ উন্মোচন করেন। সেগুলি হল মোজাম্মিল আলি লস্করের 'আসামে বিদেশি সমস্যা কল্পকথা এবং তথ্য' ও সঞ্জীব দেবলস্করের 'অশনিসংকেত : ভাষিক সংখ্যালঘুর সামনে প্রত্যাহ্বান: প্রেক্ষিত বরাক উপত্যকা'। সঙ্গে দুই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ ক্রমে 'মিথ অ্যান্ড রিয়ালিটি : দ্য ফরেনার্স প্রবলেম ইন আসাম' এবং 'পর্টেন্ডস অব ডিজেস্টার : চ্যালেঞ্জেস বিফোর দ্য লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিজ ইন আসাম- এ কেস অব দ্য ভ্যালি অব বরাক'। সম্মেলনের ভাষা আকাদেমি প্রকাশিত আকাদেমি পত্রিকার বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন রেণু চট্টোপাধ্যায়।

নীতীশবাবু এদিন সভাপতির ভাষণে বলেন পৃথকতাবাদের আন্দোলনে বিশ্বাসী নয় বলেই বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদের দাবি করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক তরুণকুমার দাস। শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী।

শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমকালের শিল্পীরা। মানপত্র পাঠ করেন সম্মেলনের জেলা সম্পাদক দীপক সেনগুপ্ত। আকাশবাণীর ঘোষক মনোজ দেব পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

'গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থা' নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তব্যের শুরুতেই সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, অরুণকুমার চন্দ স্মৃতি সম্মানে সম্মানিত হওয়ায় তিনি সত্যিকার অর্থে অভিভূত। এই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শিলচরের মানুষ, বরাকের মানুষ মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বারবার শহিদত্ব বরণ করেছেন বলে তিনি একে পুণ্যতীর্থ বলে অভিহিত করেন। ১৯৬১ সালে এগারো তরুণ-তরুণীর আত্মবলিদানের পর তাঁর পিতা প্রয়াত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বেসরকারি তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে এখানে এসেছিলেন উল্লেখ করেন সেকথাও। তিনি জানান, বেসরকারি কমিশন রিপোর্ট করেছিল, মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে শহিদ হয়েছেন এগারোজন তরুণ-তরুণী। 'শিলচর রেলস্টেশনের নাম ভাষাশহিদ স্টেশন করতে আপত্তি কোথায় বুঝতে পারি না' — এই মন্তব্য করে তিনি নাম পরিবর্তনের দাবির প্রতি তাঁর সমর্থন জানান। শ্রদ্ধা জানান বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি ভাষাশহিদ সুদেষ্ণা সিনহার প্রতিও। নির্ধারিত বক্তব্যের আগে সোমনাথবাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরুণকুমার চন্দের স্মৃতিচারণ করেন।

প্রসঙ্গত, অরুণকুমার চন্দ স্মৃতিসম্মানের সঙ্গে প্রাপ্ত ১০ হাজার টাকার ড্রাফটটি সোমনাথবাবু তাঁর পিতা-মাতার নামে তৈরি ট্রাস্টকে প্রদানের কথা অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন। ওই ট্রাস্ট আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির বিকাশে কাজ করে চলেছে।

তিনি জানান, জ্যোতি বসু সেবা কেন্দ্রও ওই ট্রাস্টের অন্তর্গত। তাঁর নামে সেবাকেন্দ্র চালু মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য বলেই প্রাক্তন সিপিএম নেতা মন্তব্য করেন।

(দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ, ১২ মার্চ ২০১২)

প্রতিবেদন - ২

বরাকবঙ্গের ধামাইল উৎসব ও কর্মশালা

বিশ্ব দরবারে বাঙালির নিজস্ব লোকসংস্কৃতি 'ধামাইল'কে তুলে ধরা এবং তার প্রচার-প্রসারে হাত দিল বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলনের কাছাড় জেলা সমিতির উদ্যোগে শনিবার (১৭ মার্চ ২০১২) শুরু হয়েছে দু'দিনের ধামাইল উৎসব ও কর্মশালা। স্থানীয় শিশুউদ্যানে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এর উদ্বোধন করেন কাছাড়ের জেলাশাসক হরেন্দ্রকুমার দেবমহন্ত।

বাঙালি জীবনে আবহমান কাল থেকে চলে আসছে ধামাইল নৃত্য। এই নৃত্য বিশেষ করে বরাক উপত্যকার বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রতীক। সেই কথা শুনিয়ে বীজ বক্তব্যে লোকসাহিত্যের গবেষক ড. অমলেন্দু ভট্টাচার্য বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন ধামাইল নাচের ইতিহাস। ধামাইল নৃত্যের উৎপত্তি ও ধারা নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বিভিন্ন লোকসাহিত্য গবেষকদের নানা উদ্ধৃতি পড়ে শোনান তিনি। বলেন, সম্ভবত ধামালি শব্দ থেকে ধামাইল শব্দের উৎপত্তি। রঙ্গ, কৌতুক ও উল্লাসের ইঙ্গিত বহন করে ধামাইল। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গানে ধামাইল সীমাবদ্ধ নয়। জন্ম থেকে বিয়ে, অন্য অনুষ্ঠানে ধামাইল নাচের ভাবনা থেকে যায়। বরাক উপত্যকায় তো বিধবা বিবাহ, প্রথম রেলগাড়ি আসা, স্বদেশী চেতনা, মহাত্মা গান্ধীর ট্রেনে চেপে বদরপুরে আসা প্রভৃতি ঘটনা নিয়ে ধামাইল রয়েছে, বলেন ড. ভট্টাচার্য।

তাঁর কথায়, প্রত্যেক লোকসঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ধামাইল এর ব্যতিক্রম নয়। ধামাইলের জনপ্রিয়তা বাড়লেও নিজস্ব ঢঙ কমছে। এরজন্য ধামাইলে নিহিত বিশুদ্ধ লোকায়তকে সংরক্ষণ করেই তার প্রচার-প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করেন অমলেন্দু ভট্টাচার্য। কারণ ধামাইলের সঙ্গে এখানকার বাঙালিদের সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বলেন তিনি।

কর্মশালা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ড. ভট্টাচার্য বলেন, ধামাইলের আদিরূপ এবং বর্তমানে এর কোনও পরিবর্তন আসছে কি না তা খোঁজা হবে এখানে। তবে ধামাইলের প্রচার-প্রসারে এই কর্মশালা যে যথেষ্ট নয়, আয়োজকদের সেকথা শুনিয়ে দেন অমলেন্দুবাবু। কর্মশালার যাবতীয় রিপোর্ট দলিল হিসেবে পুস্তকাকারে বের করা হবে, জানান অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী। তিনি এও জানান, সম্মেলনের আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এ ধরনের কর্মশালা করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এ অঞ্চলের তিন প্রবীণ ধামাইল শিল্পীকে সম্মান জানানো হবে।

সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতীশ ভট্টাচার্য বলেন, সুরমা-বরাক উপত্যকার নিজস্ব লোকনৃত্য হল ধামাইল। বাঙালিরা অনুকরণপ্রিয়, তাই আত্মপরিচয় ভুলে যায়। একথা শুনিয়ে তিনি বলেন, ধামাইলের উপর কর্মশালা একদিকে যেমন আত্মপরিচয় অবলুপ্তির আশঙ্কা কাটাবে তেমনি চেতনা ও নতুন পথ দেখাবে। এ ধরনের কর্মসূচিতে রাজ্য সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতাও চান নীতীশবাবু।

প্রধান অতিথি জেলাশাসক হরেন্দ্রকুমার দেবমহন্ত বলেন, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছেন মহিলারা। এখানেও তাদের এগিয়ে আসা দরকার। অসমিয়াদের বিহু ও বাঙালিদের ধামাইল, দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলে শোনান তিনি। কর্মশালার সাফল্য কামনা করেন জেলাশাসক।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সম্মেলনের কাছাড় জেলা সম্পাদক দীপক সেনগুপ্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রদীপ আচার্য। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, প্রসূনকান্তি দেব, বিভাসরঞ্জন চৌধুরী, সুদর্শন ভট্টাচার্য, সঞ্জীব দেবলস্কর, গৌতমপ্রসাদ দত্ত, তুষারকান্তি নাথ, পবিত্রভূষণ দেব, মকব্বির আলি বড়ভুইয়া, দীনেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস, সর্বশিক্ষার ডিইউসি গৌতম দাস, রোটারি ক্লাবের সভাপতি চিরঞ্জিত ঘোষ, বেণুলাল বর্মণ প্রমুখ।

(দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ, ১৮ মার্চ ২০১২)

আকাদেমি পত্রিকা
গত চারটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি

প্রথম সংখ্যা।। ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক: অপূর্বানন্দ মজুমদার

১. শুভেচ্ছাবাণী : প্রভাস সেন মজুমদার।। ২. মুখবন্ধ নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, বিজয়কুমার ধর।। ৩. সম্পাদকীয়।। ৪. গবেষণার কথা : অসীমকুমার দত্ত।। ৫. বরাক উপত্যকার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার প্রাসঙ্গিকতা : জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য।। ৬. বরাক উপত্যকায় আর্যব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সূচনা : কয়েকটি অনালোচিত ও লোকায়ত তথ্যসূচি : অমলেন্দু ভট্টাচার্য।। ৭. ভাটেরা তাম্রশাসন সাহিত্য বিচার ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন : হরিপদ চক্রবর্তী।। ৮. সুলতানী আমলের একটি অনালোচিত লিপি : সুজিৎ চৌধুরী।। ৯. কাছাড়ে চা-শিল্পের আদিপর্ব : অপ্রকাশিত কয়েকটি সরকারি পত্র দেবব্রত দত্ত।। ১০. বরাকের উপন্যাস ও অশ্রুমালিনী : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ১১. মননের প্রাকৃতায়ন : তপোধীর ভট্টাচার্য।। ১২. ইতিহাসের মৌন মুখর মুহূর্তগুলি কথা বলুক আজ অনুরূপা বিশ্বাস।। ১৩. বরাক উপত্যকা ভিত্তিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, নিবন্ধ ও থিসিসসমূহের একটি প্রাথমিক ও অসম্পূর্ণ তালিকা : প্রশান্তরঞ্জন আচার্য।। ১৪. ইতিহাস অনুসন্ধান বর্ষের সমাপ্তি উপলক্ষে গবেষণা পরিষদ আহ্বায়কের লিখিত প্রতিবেদন : অপূর্বানন্দ মজুমদার।।

দ্বিতীয় সংখ্যা।। ১৪১১ বঙ্গাব্দ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক: জন্মজিৎ রায়

১. মুখবন্ধ : শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, তরুণ দাস।। ২. সম্পাদকের নিবেদন।। ৩. কাছাড়ের কয়েকটি অপ্রধান ভাষা : সুধাংশুশেখর তুঙ্গ।। ৪. করিমগঞ্জে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা : ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ৫. সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম : তাম্রলিপির আলোকে সুজিৎ চৌধুরী।। ৬. মনসামঙ্গল কাব্যের এক অনালোচিত কবি রাধামাধব দত্ত অমলেন্দু ভট্টাচার্য।। ৭. সুরমা-বরাক উপত্যকার স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত : আনন্দমোহন মোহন্ত।। ৮. অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি : শতবর্ষ পূর্বের চিঠিপত্রের আলোকে : জন্মজিৎ রায়।। ৯. শ্রীহট্ট-কাছাড়ে লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিতে ঐক্যভাবনা : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১০. বরাক উপত্যকার কৃষি অর্থনীতি : নিরঞ্জন রায়।। ১১. আসামের বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক চিত্র : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা : পরিতোষচন্দ্র দত্ত।

তৃতীয় সংখ্যা।। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।। সম্পাদক: জন্মজিৎ রায়

১. সম্পাদকীয়।। ২. Bipin Chandra Paul : The Fiery Orator and His struggle for Swaraj : হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়।। ৩. Bipin Chandra Paul : A Chronicle of Life and Events : ভূপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য।। ৪. Bipin Chandra Paul : A Bibliography : বিজয় দেব।। ৫. কর্মে ও মননে বিপিনচন্দ্র ও গান্ধী সন্দীপ দাস।। ৬. বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও

বিপিনচন্দ্র পাল : মায়া ভট্টাচার্য।। ৭. বিপিনচন্দ্র পাল রাজনীতির মঞ্চে এক আপোষহীন ব্যক্তিত্ব : মনোলীনা নন্দী রায়।। ৮. Speech on Congress Resolution for the Repeal of Assam Act (1887) : বিপিনচন্দ্র পাল।। ৯. প্রাণতুল্যেযু : বিপিনচন্দ্র পাল।। ১০. পিতাপুত্রে : বিপিনচন্দ্র পাল।। ১১. ত্যাজ্যপুত্র : বিপিনচন্দ্র পাল।।

চতুর্থ সংখ্যা।। ২০১০-২০১১।। সম্পাদক: সঞ্জীব দেবলস্কর

১. মুখবন্ধ : নীতীশ ভট্টাচার্য।। ২. প্রাক্-কথন : তরুণ দাস।। ৩. সম্পাদকীয়।। ৪. দু'টি রবীন্দ্র কবিতার জন্মকথা : উষারঞ্জন ভট্টাচার্য।। ৫. মরমিয়াবাদে রবীন্দ্রনাথ ও হাছন রাজা : আবুল হোসেন মজুমদার।। ৬. চৈতন্যদেব, বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও রবীন্দ্রনাথ : জন্মজিৎ রায়।। ৭. বরাক উপত্যকায় রবীন্দ্র নির্মাণ : সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রকাব্য : আনন্দমোহন মোহন্ত।। ৮. আমাদের রবীন্দ্রনাথ : লোকসাহিত্যের চারণক্ষেত্রে কবিগুরু : তুষারকান্তি নাথ।। ৯. রবীন্দ্র-আলোকে সুজিৎ চৌধুরীর ইতিহাস-চেতনা : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১০. উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঠাকুর পরিবার : প্রাক্ রবীন্দ্র থেকে রবীন্দ্রোত্তর পর্ব : ইতিহাসের সূত্রসংকেত : বিবেকানন্দ মোহন্ত।। ১১. শিলচর শহরে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা দেবাশিস দাস।। ১২. ঢাকাদক্ষিণে সপ্ততিতম রবীন্দ্রজয়ন্তী, ১৯৩১ : বাণীপ্রসন্ন মিশ্র।। ১৩. শিলচরে রবীন্দ্র অনুষ্ঠান : সংক্ষিপ্ত সমীক্ষণ : মনুজেন্দ্র শ্যাম।। ১৪. করিমগঞ্জে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর প্রতিবেদন : অরিজিৎ চৌধুরী।। ১৫. গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী : প্রতিবেদন-১ : দীপংকর চন্দ।। ১৬. গ্রামকাছাড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ : প্রতিবেদন-২ : সঞ্জীব দেবলস্কর।। ১৭. আকাদেমি পত্রিকা — গত তিনটি সংখ্যার সম্পূর্ণ সূচি।। ১৮. চিত্র।। ১৯. প্রসঙ্গ ভাষা আকাদেমি।

মুকুন্দদাস ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

বৌ নাচ ঃ মুকুন্দদাস ভট্টাচার্যের বই থেকে গৃহীত

মণিধন সিংহ-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

লাইহারাওবা নৃত্য

সুদীপ্তা খেরসা-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

ডিমাছানৃত্য

কামালুদ্দীন আহমদ-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

গাজিরগানের শিল্পী

শিবতপন বসু ও দীপেন্দু দাস-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

ওঝানৃত্য

আশিসরঞ্জন নাথ-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

নকশি পাখা

ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ চলছে

ঘাইল-ছিয়া

তুষারকান্তি নাথ ও অমলেন্দু ভট্টাচার্য-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

বিজয়া দশমীতে 'নৌকাটানা' অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র ঃ সূর্যতপ নাথ

প্রতিবেদন-১ দ্রষ্টব্য

বিপিনচন্দ্র পাল স্মারক বক্তৃতা প্রদান করছেন লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবেদন-২ দ্রষ্টব্য

ধামাইল উৎসব ও কর্মশালা

আলোকচিত্র ঃ প্রদীপ আচার্য

লেখক পরিচিতি

ড° জন্মজিৎ রায় : কবি-গবেষক এ লেখকের চর্চার ক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত। ইতিহাস থেকে ভাষাতত্ত্ব, বাংলা বানান সমস্যা থেকে সাহিত্যতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব থেকে কবিতা, সর্বত্রই তাঁর বিচরণ। প্রকাশিত গ্রন্থ — অন্দর থেকে বারান্দা (১৯৭২) মগ্ন ভগ্ন কণ্ঠস্বর (১৯৯৪), সময়ের হৃদপিণ্ড (২০১০), সার্ধশতকের বরাক উপত্যকার সাহিত্য ও সমাজ, জীবনানন্দের কাব্যপাঠের ভূমিকা ও ব্যাখ্যাসূত্র (২০০৪), Theory of Avatara and Divinity of Chaitanya (2002)।

আবুল হোসেন মজুমদার : গবেষক-প্রাবন্ধিক। সমাজ-ধর্ম-বৈষ্ণবতত্ত্ব-সুফিতত্ত্ব এবং ইসলামীয় দর্শনে বিশেষ পারদর্শী এ লেখকের ইংরেজি ও বাংলা মূল্যবান অসংখ্য নিবন্ধ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রশংসিত। বরাক উপত্যকার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং সমাজ তাঁর অধ্যয়নের বিশেষ ক্ষেত্র।

ড° সুবীর কর : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ও লেখক। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ঐতিহাসিক। তাছাড়াও বরাক উপত্যকায় সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস পুনরুদ্ধারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। লোকসংস্কৃতি, পুথিসাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী এবং রবীন্দ্র ও নজরুল গবেষণায় তাঁর বিশেষ অবদান। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'জঙ্গিয়ার গীত', 'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস', '1857 in North-East Reconstruction from Folk and Oral Sources' অন্যতম।

ড° কামালুদ্দীন আহমদ : করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বরাক উপত্যকার বর্ষীয়ান ইতিহাস গবেষক, লোকসংস্কৃতিবিদ এবং প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক, গল্পকার, কবি এ লেখক একজন সমাজকর্মী এবং ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সহযোদ্ধা। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হল 'সংস্কৃতির রঙ-রূপ',। তিনি ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত সেমিনার কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে মূল্যবান বক্তৃতা, গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। আসামে বাঙালিদের ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী এ লেখক আসামে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ঐক্যভাবনার সূত্র অন্বেষণে ব্রতী।

মুকুন্দদাস ভট্টাচার্য : প্রবন্ধকার, নৃত্যশিল্পী, লোকনৃত্য-নাট্যবিশেষজ্ঞ। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শেষ থেকে ষাটের দশকের শেষদিক পর্যন্ত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করে লোকনৃত্য-নাট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন ও লুপ্তপ্রায় বহু নৃত্যকলা উদ্ধার করেন। লখনউ ভাতখণ্ডে হিন্দুস্তানি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের লোকনৃত্য বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রদর্শন কলা বিভাগের অবৈতনিক নির্দেশক, আসাম সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। বেশ ক'টি গ্রন্থ রচয়িতা। 'বরাক উপত্যকার লোকনৃত্য: গ্রামীণ নৃত্যকলা' (১৯৯৫) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। ২০০৭ সালের ৬ আগস্ট তিনি প্রয়াত হন।

ড° শিবতপন বসু : বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ পদে কাজ করে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। পিতার সরকারি চাকরির সূত্রে শৈশবের দিনগুলো কেটেছে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে। কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের গ্রামে। লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে নিরলস পদচারণা করে চলেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধাদির নিয়মিত রচয়িতা। তাঁর সুপরিচিত গ্রন্থ: 'তিস্তা-বরাকের লৌকিক দেবতা' (১৯৯৬), 'বরাক উপত্যকার মুসলিম সমাজ' (১৯৯৮), 'বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবদান' (১৯৯৯), 'বরাক উপত্যকার মাটি ও মানুষ' (২০০০), 'লোক ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে বরাক উপত্যকার বাঙালি সমাজ' (২০০৬) ইত্যাদি।

ড° দীপেন্দু দাস : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, নিবন্ধকার এবং গল্পকার। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম 'বৃত্তের বাইরে'। দেশবিদেশের বিভিন্ন গ্রন্থে, গবেষণাধর্মী পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধ প্রকাশিত। ইংলন্ডে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে লালন বিষয়ক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। তাছাড়া ইউনিভার্সিটি অব হংকং-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে (সঞ্জীব দেবলস্করের সঙ্গে একযোগে) এশীয় মহাদেশে বাংলা সংগীতের উপর একটি মূল্যবান গবেষণাপত্র উপস্থাপনও করেন তিনি।

সঞ্জীব দেবলস্কর : প্রাবন্ধিক-গবেষক। ইতিহাস, সমাজ, ভাষা, সংগীত, লোকসংস্কৃতি ও শিক্ষা তাঁর অধিতব্য বিষয়। প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী করে লিখব (১৯৯৯), যতীন্দ্রমোহন এবং গ্রাম কাছাড়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি (২০০২), আজকের শ্রোতার বাংলা গান (২০০৬), বরাক উপত্যকার ইতিহাস ও সমাজ (২০১১), Portends of Disaster: Challenges before the Linguistic Minorities in Assam (2011); সম্পাদিত গ্রন্থ, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ রচিত 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' (২০০৬), প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর স্মৃতিগ্রন্থ স্মরণে ও শ্রদ্ধায় (২০০৭), তাছাড়া আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক।

প্রিয়ব্রত নাথ : শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত আছেন। লোকাচারের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। এই তরুণ গবেষকের লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ অভিযাত্রী ফেরী, দিগন্তিকা, রক্তিমদিগন্ত, স্বপ্ন, প্রতিধ্বনি ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রভাসচন্দ্র নাথ : লোকসংস্কৃতি চর্চায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। শৈশব থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত তাঁর জীবন। একজন শিক্ষিত বেকার। শৈশবেই লেখালেখি শুরু। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধাদি নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাঁর বহু পাণ্ডুলিপি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়। উল্লেখযোগ্য বই: 'বরাক উপত্যকার বাংলা লোকসাহিত্য' (১৯৯৩), পুথি সম্পাদনা 'শ্রী বাবাহর ঠাকুরের পুস্তকং' (২০০২)।

সর্বজিৎ দাস : নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু এবং এতদ সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে নানা পত্র-পত্রিকায়। 'সন্তরণ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। রচিত গ্রন্থ 'বরাক উপত্যকার ব্রতকথায় নারী পরিসর' (২০১১)। পূর্বোত্তর ভারতের ব্রত বিষয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

আশিসরঞ্জন নাথ : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সরকারি কর্মচারী। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। গবেষণাধর্মী পত্রিকা 'প্রবাহ'-র সম্পাদক। লোকঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির বিষয় নিয়ে প্রকাশিত 'প্রবাহ'-র বেশ ক'টি সংখ্যা বিদগ্ধ মহলের নজর কেড়েছে। রচিত গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ উনিশে মে বাংলা ভাষা ও অন্যান্য' (২০০৭)।

ড° অনামিকা চক্রবর্তী : শিলচর গুরুচরণ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক। সৃজনশীল সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাতি আছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা, আগরতলা ও শিলচরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংকলনগ্রন্থে।

মহবুবুল বারী : লোকসংস্কৃতির সংগ্রাহক, বিশ্লেষক, গবেষক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের স্নাতক। শিলচর মহকুমা পরিষদে জনসংযোগ আধিকারিক এবং পরে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরে পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচয়িতা। কাছাড়ের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন নানা পত্রিকায়। ১৯৯৪ সালে বরাক উপত্যকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম শিলচর মহকুমা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী 'লোকসংস্কৃতি উৎসব'-এ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

ড° মণিধন সিংহ : প্রাবন্ধিক-গবেষক। হাইলাকান্দি এস এস কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক। মণিপুরি লোকঐতিহ্য ও বিষয়ক রচয়িতা। মণিপুরি সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত।

ড° সুদীপ্তা খেরসা : কাবুগঞ্জ জনতা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক। ডিমাছা তাঁর মাতৃভাষা। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে এম.এ. করেছেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লোকপুরাণ ও লোককথার নিরিখে ডিমাছার সমাজ ও সংস্কৃতি অন্বেষণ' বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। বাংলা ও ডিমাছা ভাষার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আকাশবাণী শিলচর ও দূরদর্শন কেন্দ্র শিলচর-এর ডিমাছা সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেও তিনি পরিচিত।

তুষারকান্তি নাথ : প্রাবন্ধিক-গবেষক। সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধের রচয়িতা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'গঙ্গারিডি ঐতিহ্যের অনুসন্ধান' (২০০৩), 'উনিশে মে চেতনার নির্ঝর' (২০০৪), 'ডিমাছা সংস্কৃতির আভাস' (২০০৬), কবিতা সংকলন 'ইচ্ছের কুঁড়ি' (১৯৮৯)। আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির গবেষণা পত্রিকা 'জাতিঙ্গা'র সম্পাদক।

ড° অমলেন্দু ভট্টাচার্য : শিলচর গুরুচরণ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। বরাক তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম লোকসংস্কৃতি গবেষক, ইতিহাস গবেষক এবং পুরনো মৌলিক গ্রন্থের সংগ্রাহক এবং সম্পাদক। বরাক উপত্যকার ইতিহাসে অপরিহার্য গ্রন্থ 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি ও ঋণাদান বিধি', 'উপেন্দ্রচন্দ্র গুহের কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' সম্পাদনা (সঞ্জীব দেবলস্করের সঙ্গে একযোগে) ও পুনঃপ্রকাশ। হেড়ম্ব রাজসভার কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি রচিত 'শ্রীনারদি রসামৃত' পুথি সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর অন্যতম কর্ম।

অর্জুনদেব সেনশর্মা : শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। লোকায়ত ধর্ম-সংস্কৃতি ও মধ্যযুগীয় পুথি-সাহিত্য তাঁর অধ্যয়নের ক্ষেত্র।